শ্রীসমরেশ বসু

বন্ধুবরেষু

অনেক সন্ধ্যায় অনেক সুখ-দুঃখের কথা ভেবে

কথারম্ভ

হয়তো কারো মনে আছে— 'প্রিয়প্রসঙ্গ' নামে আমার একটি বই ছিল। আজ যখন এই বইয়ের নামকরণ প্রয়োজন হল, তখন আমার স্ত্রী সেই আমার প্রথম বইটির সূত্র ধরে এর নাম রাখলেন 'উত্তরপ্রসঙ্গ'। সব দিক দিয়ে এই নামটি আমার মনে ধরল। আমার স্ত্রী এবং কবি তারাপদ রায়ই প্রিয়প্রসঙ্গের কথা এখনো মনে রেখেছেন। এটা শুধুই প্রীতি— আর কিছু নয়।

এই বইটি আসলে আমার নানা প্রবন্ধের সংকলন। 'উপন্যাসে মৃত্যু' নামে প্রবন্ধটি ছাড়া আর কোনো প্রবন্ধই পূর্বে কোনো গ্রন্থে স্থান পায়নি। 'উপন্যাসে মৃত্যু' আমার প্রথম বই 'প্রিয়প্রসঙ্গ' থেকে নিয়েছি। আমি একসময়ে কেমন লিখতাম, কোন্ ধরনের লেখা লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত রচনা লেখা ছেড়ে রীতিমতো প্রবন্ধপ্রয়াসী হলাম, 'উপন্যাসে মৃত্যু' তার সাক্ষী। নানা প্রবন্ধের মধ্যে যোগসূত্র একটাই— তা হল সাহিত্যরস উপভোগ।

শ্রীমতী চন্দনা ভট্টাচার্য তাঁর সযত্ন রক্ষিত ফাইল এই বইয়ের জন্য দান করেছেন। তিনি কতকগুলি প্রেস কপিও নির্মাণ করে দিয়েছেন। অধ্যাপিকা ঈশিতা চট্টোপাধ্যায় অনেক ঘুরে অবশেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে একটি হারানো লেখা উদ্ধার করেছেন। এঁরা নিজ নিজ আনন্দে এ কাজ করেছেন এটাই আমার আনন্দ। দে'জ পাবলিশিং-এর কাছে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ। আমার মতো ঘরকুনো, স্বভাবভীত মানুষের পক্ষে এই বই প্রকাশ করা অসম্ভব হ'ত, যদি না এই প্রকাশালয় সব ঝক্কি নিজেরা বহন করতেন। শ্রীমান্ সুবীর ভট্টাচার্যকে আমার আলাদা করে ধন্যবাদ জানানোর যথেষ্ট কারণ আছে।

সূচিপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র— একটি টলায়মান বিগ্রহ ?

রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ্ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে না। তার দাবিদারও সে নয়। কিন্তু ছাব্বিশ বছরের যুবক বঙ্কিম, যিনি সরকারী চাকুরিয়া পরিবারের ছেলে, কয়েক বছর হল বি. এ. উপাধি পেয়েছেন, তখনো যাঁর আইন পরীক্ষা দেওয়া বাকি, তাঁকে সেই অবস্থায় বুঝে নিতে বইটি কিছু কিছু সাহায্য করে। তিনি যে চাকুরিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৌরবান্বিত স্বার্থরক্ষক বলে পরে নিজেকে মনে করবেন, তিনি যে কর্ণওয়ালিসের সৃষ্ট পোষ্য সম্প্রদায় বাঙালি জমিদারবর্গের প্রতি চিরকাল কটাক্ষপরায়ণ থাকবেন— এই বইয়ে তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল। বইটির চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি অন্য কিছুর জন্য নয়, জমিদার শ্রেণী সম্বন্ধে লেখকের মনোভাবের সাক্ষ্য— 'ইট্‌ ইজ এ নটোরিয়াস ফ্যাক্ট্‌ দ্যাট মেনি এমিনেন্ট জেমিন্দার ফ্যামিলিজ ইন বেঙ্গল' ও 'দেয়ার রাইজ্ টু সাম্ ইগ্‌নোবল ওরিজিন।' এই 'ইগ্‌নোবল ওরিজিন' বা উৎসগত নীচতার স্বরূপ ব্যাখ্যায় যুবক ঔপন্যাসিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে ততটা দৃষ্টি দেন নি, যতটা দিয়েছিলেন পারিবারিক কেচ্ছা কথায়। তাহলেও ভবিষ্যতে যিনি প্রুধোঁর পাঠক হবেন, সাম্য লিখবেন, তিনি 'সম্পত্তি মানেই চুরি' এই সুপরিজ্ঞাত তত্ত্বের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে-সব অভিজ্ঞতার সিঁড়ি ভেঙে তাদের প্রথম পরিচয় এখানে মেলে। জমিদারী পরিচালনা শিখতে শিখতেই যে জমিদার-পুত্রেরা প্রজাপীড়ন, তঞ্চকতা, জালিয়াতিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে সে কথাও এ পরিচ্ছেদে আছে। 'সাম্য' গ্রন্থের লেখক কী ভেবে 'সাম্যে'র প্রচার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়— কিন্তু একটা ব্যাপারের দিকে এই সূত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করি— রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ্-এর বঙ্গানুবাদের সময় লেখক চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভিক বাক্যটি বাদ দিয়েছিলেন। 'ম্যানেজমেন্ট অফ জেমিন্দারি' এই বাক্যাংশটিকেও শ্রেণীপরিচয়হীন করে দিয়েছিলেন— 'বিষয়কর্ম সম্পাদন' এই বাক্যাংশ বসিয়ে। ততদিনে তাহলে শুরু হয়ে গেছে আপোষ ?

মফস্বলের ভূস্বত্বভোগী শ্রেণীর সঙ্গে যুবক বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তাদের জীবনের আড়ষ্টতা, সংকীর্ণতা, পাশ্চাত্য-বিমুখতা —এককথায় গতিহারা বদ্ধতাকে তিনি ভালই চিনতেন। নবাগত পশ্চিমী ভাবনার অবিকৃত নাগরিক জীবনের ফাঁপা অন্তঃসারশূন্যতাকে তখনো তাঁর তলিয়ে বোঝা হয়ে ওঠেনি। তিনি তখন খুব ব্যস্ত মফস্বল জীবনের সঙ্গে তিনি কোন্ অনন্বয়ের দ্বারা পীড়িত তার ছবি আঁকতে। প্রসঙ্গত আবার এই উপন্যাসটির মধ্যে ঢোকা যাক। রুচির মান বদলাতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে ছিল শূন্যতা। এই উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মথুর ঘোষের বাড়ির ভিতর মহলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বেশ জলাও করে বঙ্কিম দেখিয়েছেন রুচিহীন মফস্বল-বড়মানুষের অন্তঃপুরে কেমন স্থূলতা ও কদর্যতার আধিপত্য ছিল। সে বর্ণনায় কোনো অনুপুঙ্খই বাদ যায়নি। মেটে উঠান, উঠানের চারকোণে স্তূপীকৃত আবর্জনা, ঝুল এবং ধোঁয়ার কালিমা, পাকশালার ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধির প্রতি অন্ধের ঔদাসীন্য, বিবর্ণ পানের পিক-লাঞ্ছিত দেওয়াল —রুচি ধর্ষণের ছবি আঁকতে বঙ্কিম কোনো রাখ ঢাক্ করেন নি। শয়নগৃহ বর্ণনায় কারো কারো মনে পড়ে যাবে এই লেখকের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের চুয়াল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষ বর্ণনা। বিষবৃক্ষে'র 'স্তিমিত প্রদীপে' নামক অধ্যায়ের শয়নকক্ষ শিক্ষিত পরিণত রুচির প্রতীকে পূর্ণ। মথুর ঘোষের অন্দরমহলে গৃহকর্তার শয়নকক্ষে কাঞ্চনদীপ্তির অভাব নেই—কিন্তু রুচি-শৈথিল্য সেখানে নানা হাস্যকর অসঙ্গতির স্রষ্টা। ঝুলন্ত বেখাপ্পা মশারি, বার্নিশ উঠে যাওয়া আলমারি, দেশী প্যাটরা—এই হল ঘরের দারুময় উপকরণ। দেওয়ালে ঝুলছে একদিকে একটা বড়ো মাপের ভয়ঙ্করী কালীর ছবি (গ্রীম্ কালী)। আরেক দিকে ঝুলছে দশভুজা দুর্গার একটি ছবি। কিন্তু ছাব্বিশ বছরে যুবক বঙ্কিম দুর্গার উপভোগ্য বিশেষণ দিয়েছিলেন— 'ক্র্যাব লাইক্ ফর্ম অফ্ দুর্গা' —দশটি দাড়া সম্বলিত কাঁকড়া সাইজের দুর্গা! হায়, যুবক তখন জানত না, বারো বছরও কাটবে না, সপ্তমী পূজার সকালে এই দুর্গার মধ্যে তিনি খুঁজবেন তাঁর স্বাদেশিকতার পুরুষার্থ! সে সাবলিমেশন-এর সময় তখন আসেনি। মথুর ঘোষের ঐ শোবার ঘরেরই আরেক দেওয়ালে ঝুলছে কুমারী মাতা মেরির ছবি। ঘরের বাসিন্দারা কেউ জানতো না সে ছবির মানে কি, সে ছবির শিল্পগত দামই বা কী। আমাদের কিম্ভূতকিমাকার রুচিবিকারের প্রতিটি নিদর্শন এখানে উপস্থিত। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদনের অন্দরমহলের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একশ বছর পরে যে রুচিহীনতা-অধ্যুষিত গৃহস্থালীর বর্ণনা

দিয়েছিলেন তার কথা এখানে আমাদের মনে পড়তে পারে। শতাব্দী পূর্বের মকস্বলী টাকাওয়ালা মানুষের জীবনযাত্রা ও এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কলকাতিয়া বেনিয়ান মুৎসুদ্দি মধুসূদনের জীবনযাত্রার মধ্যে যে রুচিগত হেরফের থাকার কথা নয়—এই নিঃসম্পৃক্ত বর্ণনা দুটিতে সে কথা ধরা পড়ে।

দশটি বছর কাটল না। কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠের পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্ত নবজাত বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার বিড়ম্বিত প্যাটার্ন বঙ্কিমের জানা হয়ে গেল। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বঙ্কিম নিজেও তো দুপুরুষে সেই জীবনই ভোগ করছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছেলে। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, মথুর ঘোষের অন্দরমহলে জীবনার্থের যে শূন্যতার দ্বারা তিনি পীড়িত হলেন, পাশ্চাত্ত্য প্যাটার্নের নতুন বাঙালিদের জীবনার্থের অন্যতর অসঙ্গতিতে তিনি তার থেকে অনেক বেশি ব্যথিত হলেন। আলোচনার প্রাথমিক সুবিধার জন্য আমরা হাতে নিচ্ছি বঙ্কিমের লেখা 'দি কনফেশনস্ অফ্ এ ইয়ং বেঙ্গল'। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিম লিখেছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি সম্পাদিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন'-এর জন্য। প্রবন্ধটা লিখে ফেলেই কিন্তু বঙ্কিম বুঝেছিলেন, এটি একটি এ্যাভারেজ ব্যাপার হয়নি। প্রবন্ধটির পোলিটিক্যাল, সোশ্যাল ও ইকনমিক ওভারটোনে এমন কিছু ছিল যা শাসক শ্রেণীকে মোটেই খুশি করবে না। এর প্রবঞ্চক ভাষা-ভঙ্গিমার আড়ালে লুকোচুরি খেলেছে ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ। এর হাস্যের শুভ্র দীপ্তির মধ্যে আছে ব্যথিত বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস। এ আর কোনো মতেই মথুর ঘোষের অন্দর-মহল বর্ণনায় ব্যঙ্গ-প্রগল্‌ভ সাহেবিয়ানাদুরন্ত যুবক নয়। এ এখন রোগ ডায়গ্‌নোসিস্-এর পথে পা ফেলতে চাইছে। কিন্তু বাপকো বেটা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে একটা জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটই থেকে যাবে। যে মুহূর্তে লেখাটি 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে'র উদ্দেশে ডাকে দিলেন, সে মুহূর্তেই লেখাটির সামাজিক-রাজনৈতিক ওভারটোনের দিকটি তাঁকে ভাবিত করে তুলল। ইংরাজি প্রবন্ধ—ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল ও লাটসাহেবের প্রধান সচিব চার্লস বার্নার্ড দুজনেই তো পড়ে ফেলবে! সুতরাং সম্পাদকের কাছে চিঠি গেল (৫।১।১৮৭৩) এই অনুরোধ বহন করে—

'প্রে ডোনট ইনসার্ট' দ্যাট বিট অফ কনফেশন এনি হোয়্যার। ক্যাম্পবেলঅ্যাণ্ড বার্নার্ডনো এনাফ্ অফ মি টু বি এব্‌ল্ টু আইডেনটিফাই হিস্ পেনিটেন্ট অ্যাট ওয়ান্স। নট্ দ্যাট্ সে উড্ হ্যাং মি ইফ দে ডিড্,

ব্যাট ইট উড্ নট বি এ্যাট অল এগ্রিএব্‌ল্'। কিন্তু ততক্ষণে লেখাটি ছাপার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

কেন এ দ্বিধা, কেন এ সংকোচ—যদি 'আতঙ্ক' শব্দটিই ব্যবহার না করি। প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যাবে। বাইরের দিকের বিচারে দেখা যাচ্ছিল ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণী দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছিল সাহেবিয়ানায়। এই প্রবন্ধে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। আমাদের বাসস্থান, তার আসবাব সামগ্রী, আমাদের আহার-বিহার সব কিছুই সাহেবিয়ানায় অভিভূত। শুধু কলকাতা নয়, উপকণ্ঠ নয়, সুদূর রাজসাহীতেও পৌঁছে গেছে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান,—ছোটলাট সেখানকার একটি জমায়েতে'ডগ-কার্ট''-এর যে প্রসঙ্গ তোলেন তা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গ অপেক্ষা রাজসাহীবাসীর কাছে অধিকতর গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। 'ইহাই বিভীষিকা' —এ কথা বঙ্কিম বলেন নি, বলেছিলেন বিবেকানন্দ, কিন্তু বঙ্কিমের বক্তব্যেরও মোদ্দা কথা ছিল এটাই। বাঙালি সমাজের এক্‌স্‌টার্নাল ফিচারের যে পরিবর্তন ইংরাজি শিক্ষার ফলে ঘটেছে, বঙ্কিমের আক্রমণটা, যদিও তা আচ্ছাদিত, যদিও তা ছদ্মবেশী, তারই প্রতিমুখে পরিচালিত হয়েছে। এই রূপান্তর-সমৃদ্ধ এক্‌স্‌টার্নাল ফিচার যে মেটিরিয়েল প্রসপেরিটিকে অঙ্গীকার করে তা এক ভ্রান্ত মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইংরাজি সভ্যতা আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে মাটিতে টেনে নামিয়ে সে জায়গায় যে দুই বাস্তু-দেবতাকে অভিষিক্ত করেছে, তা হল স্বাচ্ছন্দ্য আর তার অনুজ—সম্ভ্রান্ততা। এই বিশ্লেষণের পথেই বঙ্কিম দেখালেন, সে-সম্ভ্রান্ততার সাধনা শেষ পর্যন্ত এক আপাত রেস্‌পেক্‌টেবিলিটির প্রয়াস, তখন সেই ইংরেজের উপনিবেশে যে এ ব্যাপারটা আরো হাস্যকর হয়ে উঠবে এ তো কথাই বটে! 'চরিত্রের স্বাধীনতা' বা ইন্‌ডিপেন্‌ডেনস অফ ক্যারেকটার এবং জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নচর্চা অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চর্চা ও জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের চর্চাকে বঙ্কিম ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—'ফাইন ফ্রেজেস'। তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন এসব 'বৈদেশিক হল্লা'র ভারতীয় তাৎপর্য। এবং সে বিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিম যা বলেছিলেন তা প্রায় নাকের বদলে নরুণ পাবার মতো ব্যঙ্গোক্তি। জয়েণ্ট ফ্যামিলির খেয়োখেয়ির পরিবর্তে নিয়ে এলাম ভিলেজ মিউনিসিপ্যালিটির দলাদলি। এই প্রবন্ধেই বঙ্কিম যুবক বাংলার উদ্দেশ্যে অন্তরের অভিযোগ আনলেন—দেশীয় জনতার নিচ্ছিদ্র কপর্দকহীনতা সম্বন্ধে অন্তরের অভিযোগ। কৈবর্ত ও হাসিম শেখের কী মঙ্গল হইয়াছে? এ কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

এই কনফেশনস্ লেখা হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হৃদয়হীন বিচ্ছিন্নতার (হার্টলেস আইসোলেশনের) অভিযোগ আনেন। তৎকালীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যাভিমানের সমুদয় প্রচেষ্টাকে বঙ্কিম মূলে স্থূলে আঘাত করলেন এই বলে, তুলনামূলক সম্পন্নতার সূর্যকিরণে স্নাত হয়েই মাত্র এই স্বাতন্ত্র্যাভিমান লোক চক্ষে দৃষ্টিগোচর— নতুবা এর দেখা মেলে না। বঙ্কিম ব্যঙ্গনিপুণ কণ্ঠে বললেন আমরা সাম্য সৌভ্রাত্রের বুলি কপচাই বটে, কিন্তু সে পরিমাণ ফরাসীয় ভাবনাদীপিত নই— ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। ইংরাজি মতে সমাজ ঢেলে সাজাতে চাইছি। আমরা সম্ভ্রান্ত হবার সাধনায় মশগুল। সম্ভ্রান্ত কে? না, 'হি অলওয়েজ কেপ্ট এ গিগ্। ইট্ ইজ দি ব্যালান্স হুইচ ফিক্সেস্ এ ম্যান্'স প্লেস ইন সোসাইটি।'

এ পর্যন্ত বঙ্কিম ঠিকই বললেন। কিন্তু সাহেবিয়ানা হিন্দুয়ানির এ্যান্টিথেটিক্যাল— এই ভ্রান্ত বদ্ধ ধারণার ফলে তিনি পৌঁছে গেলেন, বা যেতে চেষ্টা করলেন এমন এক সিন্থেসিসে যাকে কল্স্ সিনথেসিস্ বা বিচিত্র আপোষ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ দুই অনুচ্ছেদ একটু বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এই শেষ দুই অনুচ্ছেদের প্রথমটি সেই বঙ্কিমের লেখা যিনি ছ'বছর বাদে 'সাম্য' লিখবেন। 'সাম্য' প্রবন্ধের যে অংশে বঙ্কিম ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বে পরিচালিত হিন্দু-সমাজের এম্পিরিক্যাল ধারণাকে আঘাত হেনেছিলেন তার সূত্রপাত এই অনুচ্ছেদে। এই নেতৃত্ব পরিচালিত হিন্দুয়ানির ধ্বংসই যে কাম্য একথাও তর্কের ছলে এই অনুচ্ছেদে তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু শেষতম অনুচ্ছেদে দেখা গেল 'নিউ কোড্ অফ্ মর‍্যালিটি'র তল্লাস করতে গিয়ে তাঁর গোলমেলে থীসিস এ্যান্টিথীসিস অদ্ভুত কল প্রসব করেছে। 'সাম্য' পর্যন্ত বঙ্কিম যতটা এগিয়েছিলেন, 'সাম্যে'র পর ততটাই পেছিয়ে এলেন— এই দুয়েরই জটপাকানো আভাস রয়েছে এই প্রবন্ধে। কেন এ স্ববিরোধ ?

একটা কথা ঠিক যুগটাই স্ববিরোধে আকীর্ণ। ডিরোজিয়ানরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ফৌজদারী বালাখানায় যে বক্তৃতার কামান দাগা শুরু করলেন তা শেষ পর্যন্ত মিইয়ে গেল। রাধাকান্ত দেব বাঙালি জমিদারদের স্বার্থরক্ষক, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়েও তাঁরই সঙ্গে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্ল্যাটফর্মেই যখন সমবেত হলেন— সে সোসাইটির শ্রেণী-স্বার্থপরায়ণতা মোটেই অপ্রকট থাকেনি। ডিরোজিয়ানদের সচেতনতা এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের আত্মরক্ষাপরায়ণতা দুইই ছিল একই সীমাবদ্ধতার দ্বারা

পীড়িত। বৃহত্তর জনমণ্ডলী সম্বন্ধে দুই পক্ষই ছিল উদাসীন। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের ব্যাপারে শেষোক্ত সম্প্রদায় প্রচ্ছন্নে অপ্রচ্ছন্নে আগুয়ান ছিলেন। অপৌত্তলিক ও নাস্তিক ডিরোজিয়োর উত্তর শিষ্যরা জনসংযোগবিহীন ছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত হিন্দু জাতীয়তাবাদের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সেই স্ববিরোধের সহস্রবিধ চোরাবালির মধ্যে স্ববিরোধের আর এক মূর্ত বিগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রই বরং 'পিপ্‌ল' কথাটি ভাবতে শুরু করেছিলেন। তিনি 'পিপ্‌ল' কথাটির একটি সংজ্ঞার্থ দেবার চেষ্টাও করেছেন। পিপ্‌ল বলতে তিনি বুঝেছেন ইংরাজি-না-জানা গ্রাম মফস্বলের দোকানদার কারিগর সম্প্রদায়, গ্রাম্য জমিদার, মফস্বলী আইনজীবী— ইংরাজি শিক্ষিত ও কৃষক জনতার মাঝখানে বিশাল জনমণ্ডলী, ইংরাজির সঙ্গে যাদের কাজকারবার নেই বললেই হয়। তিনিই সচেতনভাবে এই মধ্যমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর বাইরের কৃষক-জনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তিনি এমন কথাও বলতে পেরেছিলেন, জমিদার যে সম্পত্তি একা ভোগ করছে, চাষী তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। জমিদারশ্রেণীর জন্যই যে ছয়কোটি বাঙালি কৃষক বিদ্রোহে ফেটে পড়ছে না এমন আভাসও তিনি দিয়েছিলেন। ইংরেজের সমস্ত আইন যে জমিদারের স্বার্থরক্ষার আইন স্পষ্টভাষায় সে কথা তিনি বলে গিয়েছেন। ইংরেজ সরকার আর জমিদার শ্রেণী যে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক এ কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। অর্থাৎ সরকারের শ্রেণীচরিত্র বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। শাসক শক্তি কতখানি বিচ্ছিন্ন সত্যিকার জনতা থেকে তা তিনি জানতেন। মুচিরাম তার দৃঢ় প্রমাণ। যে শাসক শক্তির তিনি চাকর সে শক্তি তাঁকে দিয়ে কী কাজ করিয়ে নিচ্ছে তা তিনি ভালই জানতেন। আঠারো শ বাহাত্তর সালের আটাশে ডিসেম্বর দিনাঙ্কে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি ব্যক্ত করেছেন এই ভাষায়—

> আই হ্যাভবিন ডুইং রাইট লয়্যাল্‌ সারভিস টু দি স্টেট বাই ট্রাইং টু ফিল্‌ ইট্‌স কফার্‌স, সো ভাট ইট মে রিবিল্‌ড্‌ দি জাগুর ব্যারাক্‌স্‌ ইনডাল্‌জ ইন আদার ম্যাগনিফিসেন্ট প্যাস্টাইম্‌স্‌ টু দি এফিডিকেশন অফ দি ট্যাক্‌স্‌ পেইং পাবলিক। হোয়াট দি ডেভিল্‌ ডু নিগার্স ওয়ান্ট দেয়ার মানি ফর? দে হ্যাড বেটার পে ইন দেয়ার অল এ্যাট্‌ দি গভর্নমেন্ট ট্রেজারিস, এ্যাণ্ড গভর্নমেন্ট উইল ডু দেম্‌ এ্যান্‌ ইমেন্‌স্‌ ডিল অফ্‌ গুড বাই ইরেকটিং আন্‌-ইনহ্যাবিটেবল্‌ ব্যারাক্‌স এ্যাণ্ড বাই এ্যাবোলেশিং ট্রেজারি ইন জাজিবার।

সুতরাং পিপ্‌ল্ বা জনগণ সম্বন্ধে তাঁর চেতনা উত্তর-ডিরোজিয়ানদের চেয়ে বেশি গভীর ছিল। অপিচ, ইংরেজদের ভারতাগ্রহ দু একটি উজ্জল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে যে ভাঁড়ামির পর্যায়ে পড়ে—তা যে অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতার মনুমেন্টের প্রদর্শনী তাও তিনি ভাল বুঝেছিলেন। মোটকথা শাসক শ্রেণী যে সর্বাংশে শাসিতের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতো বেদনাবহ অভিজ্ঞতা সে যুগে বোধহয় কারো ছিল না। শাসক সায়েবদের চোখে যে আমরা 'নিগার', 'আনন্দমঠ' প্রথম সংস্করণে সে কথা তিনি ব্যক্তকরার আগে এই চিঠিতে সক্ষোভ ব্যঙ্গে বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে জানিয়েছেন!

এই চিঠি, ঐ কন্‌ফেশনস্‌ তিনি যখন লিখছেন সেই সময়টাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সব থেকে সম্মুখদৃষ্টিসম্পন্ন গতিশীল সময়। এই সময়ে তিনি পুরোপুরি বিজ্ঞান দৃষ্টির অধিকারী নির্মোহ মানুষ। এই বিজ্ঞান দৃষ্টির বলেই তিনি তখন বলেছেন চরম দুঃসাহসিক কথা—'যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।' অতীব তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'জৈবনিক'। এই প্রবন্ধে প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিবাদে স্পষ্টই বোঝা যায় বঙ্কিমের পক্ষপাত ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে। প্রাচীন দার্শনিকেরা ভারতীয় বলে মান্য হবেন না, ইংরেজরা রাজা বলে অভ্রান্ত অভিধা পাবেন না। এ কথাতেই মনে হয় বঙ্কিমের সায়—'প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা।' এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানকে তিনি মাতা বলে অভিহিত করেছেন। বিজ্ঞানের উক্তি বলে এই প্রবন্ধে যা কথিত তা একজন সর্বতোভাবুক আধুনিক উক্তি—'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না, সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য।' এ বঙ্কিম তখন বিশ্বগ্রাহী কৌতূহলের সঙ্গে জগৎ-জীবন সমাজ-ব্যক্তির সকল সম্পর্ক বুঝে নিতে উৎসুক। এই বঙ্কিমই এই সব প্রবন্ধ লিখতে লিখতে পৌঁছে যাচ্ছেন 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপনার অনুষ্ঠানপত্র রচনায়। এই পথে চলতে চলতে তিনি লিখবেন 'সাম্য'। তখনও পর্যন্ত তাঁর মধ্যে পশ্চাদ্‌পসরণের তিলমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

প্রকৃতিও তাকে আকর্ষণ করছে, বিজ্ঞানও তাঁকে আকর্ষণ করছে—দুইই তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে এক অনিবার্য অবিচ্ছেদ্য সিদ্ধান্তে। ব্যাপারটি বিশ্লেষণ

সাপেক্ষ। প্রকৃতির প্রতি তাঁর আশৈশব আকর্ষণের ইতিহাস তাঁর জীবনীকারেরা উল্লেখ করেছেন। গভীর রাত্রে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন নদীর রূপ দেখতে। গাছপালা, প্রান্তর নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত এ সবই আমারই ভালবাসার সামগ্রী— সুন্দরকে ভালবাসলে সুন্দরের সঙ্গে প্রাণসংযোগ ঘটে। তখন তদাত্মবোধ জাগে। সুতরাং বঙ্কিমের দেশাত্ম-বোধের জাগরণের মূলে একদিকে রয়েছে সুন্দরকে ভালবাসার আবেগ। সে সুন্দর তখনকার মানবজীবনে ছিল না— কিন্তু নৈসর্গিক উপলব্ধিতে তার দেখা মিলত— উপভোগ্য প্রাকৃতিকসৌন্দর্যের সঙ্গে সমষ্টিগত আবেগাত্মক ভালবাসার অন্বয়রচনা বন্দেমাতরম্ গানের মূলকথা। যখন এই সব বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত কনফেশনস এসব লেখা হচ্ছে প্রায় সেই সময়েই বন্দেমাতরম্ গান পৃথকভাবে লেখা হয়। আবার 'বিজ্ঞান রহস্য' লিখতে লিখতেও তিনি একই জায়গায় গিয়ে পৌছলেন। ধনবাদের বাহন হিসাবে বিজ্ঞান ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে। সে বিজ্ঞান সে ধনবাদ দুইই ভারতীয়ের অনায়ত্ত। তাই বিজ্ঞান আলোচনা করতে করতে বঙ্কিম যখন 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা'র অনুষ্ঠান পত্র রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর প্রধান কথা হয়ে ওঠে—

> 'যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথি-শালা মাত্র।'

চুঁচুড়ার বাসায় ছুটন্ত গঙ্গার বুকে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে একদা এই ব্যক্তি প্রবল অনন্বয়ের বোধে পীড়িত হয়েছিলেন। গঙ্গার বুকে জেলের গলায় গান শুনে তাঁর বিচ্ছিন্নতার বেদনা কেটে গেল—

> 'এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যাজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল— এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।'

স্বদেশ অতিথিশালার মতো প্রতীয়মান— এ দুঃসহ যন্ত্রণা উদ্ধৃত তুজায়গাতেই প্রধান কথা। অতিথিশালাকে স্বগৃহে রূপান্তরিত করতে হবে। বঙ্কিম ধীরে ধীরে তাঁর দেশাত্মবোধের গোড়াপত্তন করছিলেন।

এ পর্যন্ত যে বঙ্কিমকে দেখছি সে বঙ্কিম স্ব-শ্রেণীর প্রকৃত অভিজ্ঞানের জন্য ব্যাকুল বঙ্কিম। সেই শ্রেণীর সংকট তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে ভাষায় তার;

নাম পরাধীনতা। তার নাম দেশাত্মবোধহীনতা। তারই উল্টোপিঠ জাতির বৃহত্তর অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধ। ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর ভাবনাময় সত্তার দুটি বাহু! এক বাহু য়ুরোপের স্বাধীন জাতিসমূহের, বিশেষ ইংরেজদের সমকক্ষতার বাসনা, তাদের নানা সিদ্ধান্তকে বিচার ও চ্যালেঞ্জ। আরেক বাহু— কোটি কোটি দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনকে স্বীকার। 'সাম্য' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তাই বঙ্কিম লিখেছিলেন— এ বই শিক্ষিত ভদ্রলোক না পড়লে ক্ষতি নেই, অশিক্ষিত জনসাধারণে পড়লে বরং কিছু লাভ আছে। কথাটির গূঢ়ার্থ লক্ষণীয়। এই দুই বাহু অচিরে এক হয়ে সূচীমুখ প্রহরণ হয়ে ওঠার কথা। তা কতটা সম্ভব হল, কতটা হল না— কেন হল না, তার মূলে বঙ্কিমের কোন্ স্ববিরোধ সক্রিয়, তার পরিমাপের পূর্বে ব্যক্তি বঙ্কিমের নিজস্ব স্ববিরোধগুলির ঠিকানা জেনে নেওয়া দরকার। তবেই বোঝা যাবে বঙ্কিমের শক্তি ও দুর্বলতাকে আজ আমরা কোন্ নিরিখে বিচার করবো।

দুই

উপলব্ধির সঙ্গে দৃশ্যমান বাস্তবতার অসঙ্গতি, আদর্শের সঙ্গে আচরণের অসঙ্গতি, তত্ত্বের সঙ্গে রূপায়ণের অসঙ্গতি ব্যক্তি বঙ্কিমের প্রধান অসঙ্গতি। একটা ছোট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি প্রাথমিক স্পষ্টতা পায়। ব্রজেশ্বর পিতার নির্দেশ অবশ্যমান্য জেনে লংঘন করেনি। বঙ্কিম এই ঘটনাকে উঁচুদরের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন— সকলেরই মনে থাকার কথা সে অংশটি—

> ব্রজ নীরব— বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে— হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না— এখন যত বড় মূর্খ ছেলে তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।'

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় পিতৃবাক্য লংঘন করা অকর্তব্য— এরকম কথাই লেখকের মন্তব্যের নির্গলিতার্থ। কিন্তু ব্যক্তি বঙ্কিম নিজে কি একথা মানতেন? তাহলে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে দাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে একথা লিখেছিলেন কেন— অধর্মাচরণ অপেক্ষা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্তব্য।' আঠারো শ' চুয়াত্তর সালে যিনি এ চিঠি লিখলেন, আঠারো শ' চুরাশি সালে 'দেবী চৌধুরাণী' লিখতে গিয়ে তার উল্টো কথা কেন? আরো দেখাই, কৃতদার বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে, বয়সের বেশী পার্থক্য থাকলে মেয়েদের দিক থেকে সে বিবাহ কেমন হয় অন্তত দুবার তিনি তা দেখিয়েছেন— লবঙ্গলতায় ও শৈবলিনীতে।

কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই ব্যক্তি জীবনে এ চিঠি বেরিয়েছে— জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে তিনি লিখছেন—

'অনিলার একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে। পাত্র ধনী ব্যক্তি, সব ভাল কিন্তু বয়স ৩৬। তোমার মত কি না। অনিলার বিবাহে ব্যয় করা তোমার বা আমার ক্ষমতা নাই, অতএব যাহাতে অল্প ব্যয় হয় তাহাই খুঁজিতে হয়। কুতদার পাত্রে ব্যয় হইবে না।'

যা তিনি লিখছেন আর যা তিনি নিজ জীবনে আচরণ করছেন তার মধ্যে এ জাতীয় বৈপরীত্যের উদাহরণ আরো আছে। তিনি সাহেবী খানা সাহেবী কেতায় পছন্দ করতেন, চিঠিপত্রে, তাঁর সম্বন্ধে লিখিত স্মৃতিকথায় এমনই মনে হয়। অন্তত তাঁর একটি অকিঞ্চিৎকর রচনা পড়ে মনে হয় তিনি এ ব্যাপারে বেশ তুরস্ত ছিলেন। কোন্ স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে জানি না, এই শারীরিক শ্রমবিহীন মানুষটি মাথার কাজ করতে হয় বলে দুবেলা দুটো মুর্গ খেতেন, তার সঙ্গে দুবেলা চারটে ডিম, পেগ চড়ানোর ব্যাপারেও এই ভাবী ঋষি সংখ্যা ঠিক রাখতে সবদিন পারতেন না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে কোথাও এমন ধরনের সাহেবী মোগলাই খানার প্রদর্শনী নেই। আমার একটা বরাবরের ধারণা লেখকদের লেখার ভিতরে উল্লেখিত খাদ্যসামগ্রী তাঁদের খাদ্যরুচির নিদর্শন। তা হলে বঙ্কিমের প্রিয় খাদ্য সরু চালের সাদা ভাত, ডুমুরের ডালনা, রুই মাছের ঝোল, সুগোল লুচি, সতেল ইলিশ মাছের ঝাল। কই মাছ খেতে গিয়ে কাঁটা চামচ বিসর্জনের গল্প তো আমরা জানি। খাদ্যের বেলায় দেখা যাচ্ছে এ্যাংগ্লিসাইজড্ হবার বাসনা অথচ পক্ষপাত বাঙালি খানার দিকে— এমন কি জল ছিটিয়ে মাটিতে আসন পেতে বাঙালি মতে মাটিতে বসাটি পর্যন্ত। শেষ অবধি শরীর শুদ্ধ করার জন্য বছর দুয়েক নাকি হবিষ্যিও করেছিলেন।

আবার অন্যদিকেও একই উদাহরণ। সন্ন্যাসীদের দিয়ে তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসেএকের পর এক নানা কাণ্ড ঘটিয়েছেন— এসবের শেষ সীমায় 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী দলের বিদ্রোহী সন্তান দলে রূপান্তরিত হওয়া। তাঁদের পরিবারের সন্ন্যাসীপ্রভাবের কথাও আমাদের জানা। কিন্তু সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ এ্যাটিচুডটা কি? 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি বলেছেন— দম্পতিপ্রীতি ও অপত্যপ্রীতির বিরোধিতার জন্ত সন্ন্যাসধর্মাবলম্বীদের আচরণ মহৎ পাপাচরণ। এই বোধের বশবর্তী হয়ে তিনি বলেছেন, যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নন। তিনি যে চাকরির বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক...প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে পরে আলোচনা করছি— নিজের বৈঠকখানার সান্ধ্য আসরে সেই চাকুরিস্থলের

গন্ধ হতেই দিতেন না। ছিলেন বংশধারানুসারে নিবেদিত বৈষ্ণব— অথচ জাতির জন্য স্থির করে দিয়ে গেলেন একটা মাদার-ইমেজ। প্রবল স্বাতন্ত্র্যাভিমান, রূপের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার সবই ছিল— অথচ পাশের বাড়ির বারান্দায় ছোট মেয়েটির স্মিত মুখখানি দেখার জন্য ছেলেমানুষের মতো ব্যাকুল— তাকে তিনি সই বলেন। যিনি গোটা দেশের দুর্দশায় কাতর, তিনি রেগে গেলে এমন কথাও লিখতে পারতেন কাঁটালপাড়ায় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কিছু স্থাপনেই তাঁর আগ্রহ নেই কেননা সেখানকার কয়েক ব্যক্তি বৈষয়িক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এবং বিস্ময়ের কথা এ উক্তি কার ? যিনি নতুন করে গীতার নিরাসক্তির ভাষ্য লিখেছেন, তাঁর।

এইবার তাঁর সর্বপ্রধান অসঙ্গতির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি। তিনি আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তাদের একজন— অরবিন্দ কথিত ঋষি— মুক্তিমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অথচ প্রতি পদক্ষেপে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন— রাজনীতি তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যে-অর্থেই হোক জাতীয়তা-বাদের স্রষ্টা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে মুখে তালা দিয়ে থাকবেন— এ এক অবাক কাণ্ডই বটে। 'নন্ পোলিটিক্যাল পেট্রিয়টিং ফিলিং'— নানা ছলে, নানাভাবে একথাটি তিনি গছাতে চেয়েছেন। বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে' লেখবার জন্য অনুরুদ্ধ হলে তিনি সাফ বলে দিয়েছিলেন কোনো রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তিনি কলম ধরবেন না। এবং এরকম বলার কারণ, সায়েবদের বিরক্তি উৎপাদন করতে তিনি চাইতেন না। শম্ভুবাবুকে তিনি দুবার এই ভয়ের কথা জানিয়েছেন— এবং সে সূত্রে তিনি যা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য—

> 'আই ও'ন্ট টেক আপ পলিটিক্স, বিকজ্ দেন আই উড্ বি শিওর টু রাউজ্ দি ইনডিগ্‌নেশন অফ এ্যাংগ্লো স্যাক্সোনিয়া এগেন্‌স্ট মুখার্জি— (শম্ভুবাবু সম্পাদিত পত্রিকা) ছাট ইজ হোয়াই বঙ্গদর্শন হ্যাজ্ সো লিট্‌ল্ অফ পলিটিক্স ইন্ ইট্'।

লক্ষণীয় এই ভয়েই তিনি কনফেশন্‌স্ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হোক শেষ পর্যন্ত এটা চাইছিলেন না। ঝাঁসির রানীকে নিয়ে উপন্যাস লেখার সংকল্পও তাঁকে পরিহার করতে হয় এই কারণে যে, এক তো 'আনন্দমঠ' লেখার জন্যই সাহেবরা চটেছে, ফের আবার ঝাঁসির রানীকে বিষয় হিশাবে ধরলে আর রক্ষে থাকবে না। ইংরেজদের ব্রহ্মদেশ দখলের বিষয়ে কৃষ্ণপর্বটক পণ্ডিত

মন্তব্য করতে বললে বঙ্কিমবাবুরা যখন বলেন যে ঘটনার পূর্ণতথ্য তাঁরা জানেন না, আর যেটুকু জানেন সেটাও বলতে সাহস করেন না, তখনও সেই একই ভয়। ইংরেজ ওপরওয়ালাকে চটিও না— ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ চাকুরে আত্মীয়বর্গকে বরাবর তিনি এ উপদেশ তিনি দিয়ে গেছেন। সায়েবদের রোষদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষায় জন্ম 'আনন্দমঠ' লাঞ্ছনা তাঁকে স্বহস্তে করতে হল— এও এক তাজ্জব ব্যাপারই বটে। ভয়? কিসের ভয়—চাকরির ভয়, ডিমোশনের ভয়। হয়তো চোখের সামনে জলজল্ করছিল অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের কেরিয়ার বিনষ্টির চাঞ্চকর ইতিহাস, রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের আলোড়ক স্মৃতিকথা প্রকাশের ফলে লেখকের প্রায় পেনশন্ হারানোর সঙ্কট! এ ভয়ের কারণ দুটো— একটা হল, সম্ভবত তিনি নার্ভাস প্রকৃতির লোক। তাঁর যে মাথার ব্যামো তারও প্রধান লক্ষণ উত্তেজনাপরায়নতা। ডায়াবিটিস এই হাই-পারটেন্‌শন বাড়িয়ে তুলছে। তবু এ কারণটিকে আমি গৌণ কারণ বলছি। দ্বিতীয় কারণটিই মুখ্য। তিনি খাঁটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ভূসম্পত্তিনির্ভর জমিদার এলিট শ্রেণীর তিনি কেউ নন। স্বাধীন আইনব্যবসায়ী নন; চাকরি গেলে বা পেনশন বন্ধ হলে তাঁর দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না বললেই হয়। সেই সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র পড়ে যা মনে হয়, একরাশ কুপোষ্যের পাল্লায় পড়ে আর্থিক দিক থেকে তাঁকে জেরবার হতে হয়েছে। চিঠিপত্র থেকে এমন ধারণাও হয়, এর ঠেলায় মাঝে মাঝে তাঁর একেবারে হাতখালি অবস্থাও আসতো। এ ব্যক্তি একান্তভাবেই চাকুরিসর্বস্ব বাঙালি ভদ্রলোক।

কিন্তু আর পাঁচটা বাঙালি ডেপুটির ভয় এত উচ্চারিত ছিল না। তাঁর ভয়ের ব্যাপারটা এমন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন পেল কেন? তার কারণ অন্যেরা মাত্র চাকর। একমাত্র তিনিই সবৈব দাসত্বের যন্ত্রণায় মুখর হতে চেয়েছেন। সেই মুখরতায় নিজেই আতঙ্কিত হয়েছেন। অন্য সরকারী উচ্চপদস্থ চাকুরিয়ারা সেকালে যেখানে ছিল ভক্ত— তিনি সেখানে ছিলেন ভীত। অন্যেরা উপলব্ধ ছিলেন কি না বোঝা যায় না— তিনি সত্যটা বুঝতে পেরেছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন। ভয়টাই ঠিক প্রমাণ করে তাঁর ব্যাখ্যায় লক্ষ্যভেদটা যথাযথ হতে চলেছে। আমি আগের একটা প্রবন্ধে বলেছি তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধের এক সবথেকে বুঝদার অথচ অসহায় ভদ্রলোক। তাঁর ভয়টা তাঁর চিন্তার সঙ্কটের প্রমাণ নয়— তাঁর চাকুরির সঙ্কটের নিদর্শন।

পরাধীনতার যন্ত্রণা কত তীব্র, কত তীক্ষ্ণ ছিল এ বিষয়ে তাঁর অসহায়তা-বোধ, তাঁর মর্মস্পর্শী বিবরণ রেখে গেছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশবাবু পলাশীর

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু গোলাগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, লাক্ষাবাগের অবশিষ্ট একমাত্র আমগাছের একটা ছোট কাঠের টুকরোও এনেছিলেন। শ্রীশবাবু বঙ্কিমবাবুকে সেগুলি দেখাতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন— 'দেখে আর করব কি? কেবল কাঁদা বই তো নয়।' এ সেই উপায়ান্তর বিহীন অসহায় ভদ্রলোকের অন্তরের ছবি। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের আলোচনা-অন্তে বঙ্কিম বলেছিলেন— 'যে বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।' কাঁদার বিষয়টি তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। তিনি যখন বলেন, 'এই ছয়কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব', তখন তিনি বাঙালির জন্য যে চোখের জলের ব্যবস্থা করলেন, সেটাই বাঙালির ইতিহাসে, তথা এদেশের ইতিহাসে নতুন। 'গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।' এ লজ্জাও বাঙালির ইতিহাসে নতুন। অবশ্য, পরাধীনতার কালগণনাতেও তাঁর স্ববিরোধ আছে। যিনি আকবর শাসিত ভারতবর্ষকে 'স্বাধীন' বলে মানতেন তিনিই আবার বঙ্গের পরাধীনতার কাল গুনছেন বারোশ তিন সাল থেকে। এ ত্রুটিকে অবশ্য মারাত্মক বিবেচনা করি না— বিশেষ যখন দেখি একজন পয়লা সারির আধুনিক কবি, যিনি বামপন্থী মহলে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার আসনে আসীন তিনি একথা বলেন যে মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের বিকাশ হয়নি বাঙালিরা পরাধীন ছিল বলে। [দ্রষ্টব্য— শ্রীঅরুণ মিত্র : বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা : শিলাদিত্য : ১৫-৩০ এপ্রিল ১৯৮৩ সংখ্যা।] কিন্তু সে যাই হোক, পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণাকে তিনি স্বদেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন— এবং এটাও ঠিক অবগত ছিলেন যে, তাঁর এ প্রয়াস ইংরেজরা অনবহিত ছিল না। তাঁর ডিমোশন এ বিষয়ে একটা প্রমাণ।

তিন

স্ববিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েও 'আনন্দমঠ'-এর আগে পর্যন্ত বঙ্কিম যা বললেন সেগুলিকে মোদ্দা কথায় সংক্ষিপ্ত করে আনলে দাঁড়ায় এই :

(ক) ইংরেজ শাসনে দেশের মঙ্গল হয়নি। একাধিক কারণ দেখিয়ে

একাধিকবার তিনি একথা বলেছেন। ইংরেজের আনা শিক্ষায় মঙ্গল হয়েছে বটে।

(খ) ইংরেজ শাসন দেশের জমিদার শ্রেণীর স্রষ্টা— এই জমিদার শ্রেণী শোষক ও পীড়ক।

(গ) ইংরেজরা সাম্রাজ্য রচনার ও রক্ষার ব্যয়ভার ভারতীয় প্রজার পকেট কেটে ও ট্যাক কেটে সংগ্রহ করে।

(ঘ) ইংরেজের ভারতীয় বিচারশালা বেশ্যালয়।

আর 'আনন্দমঠ'-এ তিনি যা বললেন তার মোড়কের অর্থ যাই হোক তার ভিতরের অর্থটি কিছুকালের মধ্যেই বিস্ফোরক হয়ে উঠল। সে অর্থটি এই যে, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে একটা শক্ত সুগঠিত দল দরকার, সেই দলের সদস্যদের গৃহ-জীবন পরিহার করতে হবে, দলটি সামরিক শৃঙ্খলায় পোক্ত হবে, মধ্যবিত্ত পরিবারে দলটির মিলিট্যাণ্ট সিম্প্যাথাইজাররা ছড়িয়ে থাকবে, অস্ত্রলুঠ করতে হবে, অর্থও লুঠ করতে হবে, অর্থ ও অস্ত্র একসঙ্গে পেলে অস্ত্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, দলের নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠিন হবে, বন্দেমাতরম্ হবে দলের মূল মন্ত্র, দেশমাতৃকার মুক্তির যুদ্ধে এই মন্ত্র সহায় হবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত কথা এবং পরিকল্পনা ইংরাজিতে লেখেন নি— লিখেছিলেন সবজনবোধ্য বাংলায়। 'সাম্য' প্রবন্ধের বিজ্ঞাপনেও তিনি যেমন বলেছিলেন, এই সব ভাবনা চিন্তা প্রকাশের কালে তিনি তেমনই ভেবেছিলেন যে, বাঙালি জন-সাধারণের মধ্যে এই সব বোধ ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা কেন একথা ভুলে যাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরেজ সরকারের আদেশে নিষিদ্ধ বাক্য বলে দণ্ডিত হয়েছে? বন্দেমাতরম্ যে শাসকশ্রেণীর কাছে আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল শব্দটির অনুষঙ্গে ধৃত 'আনন্দমঠে'র সন্তান দলের গেরিলাবাহিনীর অসমসাহসিক কার্যকলাপ। সন্তানদলের কার্যক্রমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তারই রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের অগ্নিযুগের বিপ্লবী অথবা সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী দলের কার্যকলাপে। একথা ঠিক যে, গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে এবং ইতস্তত অপ্রাসঙ্গিক 'মুসলমান' ও 'নেড়ে' প্রসঙ্গের অবতারণায় বঙ্কিমচন্দ্র এক বিসদৃশ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি সবই সেই অসহায় ভদ্রলোকটির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সন্ধানের চেষ্টা। নইলে একটা প্রশ্ন আমরা করতেই পারি যে, ইংরেজ এসে এদেশকে অরাজকতার হাত থেকে উদ্ধার করেছে, গ্রন্থের কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞাপনে ধৃত এই বাক্যটির কোনো

যোগই যখন নেই, তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই গ্রন্থে যা রইল তা একটি টাইম বম্বের মতো, যথাসময়ে তার বিস্ফোরণ অনিবার্য। তাঁর কাজ ছিল শুধু বোমাটিকে রক্ষা করা। ইংরেজ এসে এদেশকে অরাজকতার হাত থেকে উদ্ধার করেছে— এই উক্তিটি আসলে একটি মোড়ক। বর্তমান লেখক কম্যুনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার কাগজের মোড়কে নিষিদ্ধ হ্যাণ্ডবিল বহন করতেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার এইটাই ছিল সহজ রাস্তা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর বিজ্ঞাপনের ওই মন্তব্য কতকটা ইংরেজ সরকারের চোখে ধূলি নিক্ষেপের সেই জাতীয় প্রয়াস। তিনি যে বন্দেমাতরম্ গানটি রচনাকালে কোনো পার্শ্ববর্তীকে বলেছিলেন যে, বেঁচে থাকলে তাঁরা বুঝতে পারবেন কী বস্তু তিনি দিয়ে গেলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, গানটির রচনাকালেই 'আনন্দমঠে'র দেশভক্ত গেরিলাবাহিনীর পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল।

চার

কিন্তু তাহলে এই ভদ্রলোকটি তাঁর জীবনের প্রান্তসীমায় এসে যত রাজ্যের তাৎপর্যহীন ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠলেন কেন ? তিনি কেন বুঝতে পারলেন শোভাবাজার শ্রাদ্ধবাড়ি উপলক্ষ্যে হেস্টিং সাহেবের মতো ফোকোটিয়া ইনটেলেক্‌চুয়ালের সঙ্গে বৃথা তর্কে মেতে উঠলে বঙ্কিমের মতো ক্ষুরধার মনীষাকে শুধু অকারণ সময় ব্যয় করতে হয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ পত্রালাপে কী বোঝাতে চাইলেন— গণ্ডাদরে বিকিয়ে যায় এমন সব সাহেব ইণ্ডোলজিস্টদের ভ্রমাত্মক ভারতবিচারের মূঢ়তা ? তার থেকে কি 'সাম্য' লেখকের পক্ষে অনেক বেশি সমীচীন ছিল না গ্রামবাংলার ইংরেজ ছত্রছায়ার সুরক্ষিত বাঙালি জমিদারদের প্রজাপীড়নের মুখোশটা আরো খুলে দেওয়া ? 'মা যাহা হইয়াছেন' তার যথার্থ রূপকার হতে তার ইচ্ছে করল না ? 'আনন্দমঠে'র স্রষ্টার মনে পড়ল না দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার পালা তাঁর বই পড়েই শুরু হয়ে যাবে ? কেন ভুলে গেলেন তিনি, দেশমাতৃকার দুর্দশামোচনের জন্য সংগ্রাম গৌরবান্বিত হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশের হাতে সে অংশের তিনিই স্রষ্টা ? তাঁর মনে হল না, তিনি এমনই ব্যক্তি যাঁর বই স্টেজে তুলতে গেলে সরকারি অনুমতি নিয়ে মহা ঝঞ্ঝাট বেধে যাবে ?

অথচ এ কথাও তো অস্বীকার করার নয় যে ইংরেজের কলোনির কেরানি

রক্তে যে-গঞ্জনা তারই মাঝখানে দাঁড়িয়েও তিনি পুরোদস্তুর বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের স্বপ্নে ভরপুর। একথা তিনি সম্পূর্ণ না হলেও বৃহত্তর অংশে বুঝেছিলেন যে, সমাজ-বিপ্লবের আবেগ ভবিষ্যমুখী না হলে তা বৃথা। তিনি অতীতের সঙ্গে গাঁটছড়াটি ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েও পিছিয়ে গেলেন— এটা তাঁরই যুক্তিবাদী মননে দীক্ষিত উত্তরপুরুষদের ক্ষোভ। ধনবান ভূস্বামীদের হাত থেকে সামাজিক নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসুক— এটা যাঁর সারাজীবনের অভিপ্রায়, যিনি ধনবাদের অঙ্গাঙ্গী আত্মীয় বিজ্ঞানচর্চাকে বারবার স্বাগতম্ জানিয়েছেন— তিনি তো ভারতীয় সমাজে ইতিহাসের কার্যকারণে যত অসম্পূর্ণই হোক নবোদিত বুর্জোয়া ভাবনারই প্রতিনিধি। তিনি তো গুরুবাদ মানতেন না, মালা জপ করেননি, শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে বুজরুকি বলেই গণনা করেছেন। তবে তিনি কেন সন্ন্যাসীদের মধ্যযুগীয় অলৌকিকতার প্রসঙ্গে আগ্রহী হতেন? জট পাকানো মানুষ সন্দেহ নেই— তবে তার মধ্য থেকেও বোঝা যায়, অতীত আঁকড়ে ধরা ফিউডালবাদের সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক গড়তে চাননি। নতুন সমাজ গঠনের দিকেই তাঁর নজর। বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—ধর্মশাস্ত্রে যা আছে সেটাই হিন্দু ধর্ম নয়। তিনি যে হিন্দু ধর্মের কথা বলেছেন ('যে হিন্দু ধর্ম আমি গ্রহণ করি') তা তাঁর মতাদর্শ অনুসারে মনুষ্যত্বের সমার্থক। সে মনুষ্যত্বের শেষকথা দেশপ্রীতি।

পাঁচ

আহার্য প্রস্তুত। প্রিয়তমা কন্যা 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকছেন। তিনি সাড়া দিচ্ছেন না। গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে কন্যাকণ্ঠে 'বাবা' ডাকের শ্রবণসুখ অনুভব করছেন। পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটির হাসিমুখখানি দেখার জন্য সমাগত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে কয়েক মুহূর্তের ছুটি নিচ্ছেন। তুমুল সাহিত্য সংস্কৃতি আড্ডার মাঝখানে সাড়ে নটা বাজলেই স্ত্রীর নির্দেশবার্তা দ্বারপ্রান্তে হাজির— ব্যস্— সেদিনের মতো আড্ডার সমাপ্তি। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবারকে স্বলিখিত দীনবন্ধু জীবনীর গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ— দীনবন্ধুর বালিকা কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্না— এ এক অন্য বঙ্কিমচন্দ্র। 'এ জীবন লইয়া কী করিতে হয়', এই প্রশ্নে সতত চঞ্চল, চিরতার্কিক বঙ্কিমমানসের অন্তরালে এ এক স্নেহ বিমথিত বঙ্কিমচন্দ্র। এ প্রবন্ধ তার পরিমাপের জায়গা নয়॥

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চাদপসরণ

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল চরিত্রপাত্রের পুরুষার্থ-সংকট। একদা যে লেখক পূর্ন মনুষ্যত্বের দুর্ব্যাখ্যায় সংজ্ঞার্থ খুঁজতে গিয়ে গ্যেটেকে[১] আদর্শ বলে ধরেছিলেন সে লেখক যে ভারতীয় ঔপনিবেশিক খণ্ডিত জীবন-চর্চায় ব্যক্তির নানা উদ্‌ভ্রান্ততা সত্ত্বেও তার ট্র্যাজিক মহিমাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন এটা স্বাভাবিক। দেশকালের প্রতিঘাতে ও তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার জন্য সে চেষ্টা এমন কি মেঘনাদ বধের রাবণের ডাইমেনশনও পেল না। এই প্রয়াস ও ব্যর্থতার স্বরূপ বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য। এই প্রযাসের মূল প্রেরণায় বাঙালি মধ্যবিত্তের সদ্যোজাত আত্মসম্বিতের টান। এই ব্যর্থতার শিকড় রয়েছে সেই মধ্যবিত্তেরই পায়ের নিচের ফাটলধরা মৃত্তিকার অসংলগ্নতায়। এই প্রসঙ্গে প্রথম আলোচ্য তাঁর ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলি— সেখানে বর্তমান লেখক মনে করেন তাঁর উৎকণ্ঠার সমধিক শিল্পময় প্রকাশ। দ্বিতীয় আলোচ্য তার পারিবারিক উপন্যাসগুলি— যেখানে তাঁর পশ্চাদপসণ সব থেকে প্রকট। তৃতীয় আলোচ্য তাঁর সমুদয় উপন্যাসের নারী চরিত্র— যা তাঁর সবল ও দুর্বল উপন্যাসগুলিকে সমানভাবে মেরুদণ্ডী রেখেছে।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলি নূতনতর নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আমরা এখন বুঝতে পারছি ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলিই ছিল তাঁর 'Forte'. তিনি 'রাজমোহনস্‌ ওয়াইফ' ইংরাজিতে লিখে যাত্রারম্ভ করেছেন বটে, কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। যাত্রা শেষও করেছেন ত্রয়ী উপন্যাসে— সে তিনটি উপন্যাসও ইতিহাসদীপিত। উপন্যাস লেখা থামিয়ে দেবার বহু পরে সৃষ্টিকর্মে আরেকবার মাত্র তিনি হাত

১. মনুষ্যত্ব কি : বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্গদর্শন। ১২৮৪

দিয়েছেন— 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সংস্কারের নামে পুনঃসৃষ্টি। তাঁর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস তাঁর সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবনের মাঝখানের একটি অধ্যায়। সমসাময়িক সমাজ বা পারিবারিক জীবন আকর্ষণ করছে তাঁর চিন্তাকে, জীবনভাবনাকে— কিন্তু তাঁর কল্পনার মুক্তি ঘটেছে তাঁর ইতিহাস-দীপিত উপন্যাসে। 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' উপন্যাসে ব্যবহৃত সামাজিক বাস্তব উপাদানে বৃহত্তর কল্পনার অবকাশ নেই। সেটা 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রশস্ত প্রান্তরে আছে। 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনব পরিকল্পনায় সে স্বাধীনতাভোগ সহজ। অর্থাৎ বাস্তবের দৈন্য থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাড়িত হয়েছেন ঐতিহাসিক রোমান্সের রঙিন রাজপথে এরূপ অনুমান মূলত নির্ভুল, যদিও ব্যাপারটার পিছনে একটা প্যারাডক্স্ আছে।

ইতিহাস তখন বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে সবে সত্য হয়ে উঠেছে। আঠারোশ সাতান্নর ঘটনা আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে প্রথম প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। সতীদাহ-রোধ, বিধবাবিবাহ এগুলি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সমাজে—সে সমাজও বাঙালির কাছে নতুন। সমাজও নতুন, ইতিহাসও নতুন—তবু এ দুয়ের মধ্যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে ইতিহাস। তার কারণ ব্যক্তি— বঙ্কিমের কল্পনার ব্যক্তি— সামাজিক মানুষ হয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পারত না। ইতিহাসদীপিত প্রান্তরে বঙ্কিমের কল্পনার ব্যক্তি নিজের নিগূঢ় নিয়তির মুখোমুখি হতে পারতো খোলাখুলি। উনবিংশ শতকীয় বঙ্কিমীসমাজের নানা প্রশ্ন তাকে আড়ষ্ট করে ফেলার সুযোগ সেখানে পেত না। উনবিংশ শতকীয় পজিটিভিস্ট ও ডিটারমিনিস্টিক বিশ্ববীক্ষার কারণে ব্যক্তি ও সমাজের যে দ্বৈত মাথা চাড়া দিয়েছিল বঙ্কিম সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন— তাঁর মোটা সংখ্যার প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর সামাজিক উপন্যাসে সে অবধানতা কার্যকর করতে পারেননি। তাঁর সমুদয় ভদ্রলোক নায়ক চরিত্র এ কথার প্রমাণ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক জগৎসিংহ ইতিহাসের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও একটি নূতন প্রকৃতির সূচক হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জগৎসিংহ এবং আয়েষার প্রেমের ঘটনার ভিতরই আমরা বঙ্কিমের মানসিক স্বাধীনতার প্রথম রূপটি দেখতে পেলাম। কারাগারে জগৎসিংহ এবং আয়েষার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি মোটেই ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে আয়েষার দিক থেকে প্রেমানুভূতির অনিবার্য বিস্ফোরণে তা হয়ে উঠেছে অনেকখানি আধুনিক। এই উপন্যাসের দুটি চরিত্র

বিশেষভাবে লক্ষণীয়— বীরেন্দ্রসিংহ ও আয়েষা। বীরেন্দ্রসিংহ ফিউডাল আত্মাভিমানের একটি মনুমেন্টীয় প্রতীক। তার পতনও ঘটেছে মনুমেন্টীয় মহিমায়। কিন্তু আয়েষা ফিউডাল কাঠামোর মধ্যে থেকেও তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে শুধু যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করেছে তাই নয়, জীবনমৃত্যুর সঙ্কট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আয়েষা ধীশক্তির সাহায্যে জীবনের প্রতি পক্ষপাত জানিয়ে তার আধুনিকতাকে স্পষ্ট করেছে। আয়েষা যে যুগের মেয়ে সে যুগে এমন ধরনের আধুনিক ধীশক্তি সম্ভব ছিল কি না এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যে necessary anachronism বা আবশ্যিক কালানৌচিত্য এ জাতীয় মহাকাব্য বা উপন্যাসের প্রয়োজনীয় উপাদান বঙ্কিমচন্দ্র তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের লুৎফ-উন্নিসা এবং মেহের-উন্নিসা সাক্ষাৎকারের পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় আবশ্যিক কালানৌচিত্যের আরেকটি নিদর্শন। এই দুই নারী সম্পূর্ণরূপে free will বা স্বাধীন ইচ্ছার ধারক। যদিও লুৎফ-উন্নিসা একথা বলেছে যে, দিল্লীর জাহাঙ্গীর বাদশাহ, আমীর ওমরাহো থাকতে সপ্তগ্রামবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমারের জন্য আকুল হওয়া তার ললাট লিখন—তথাপি সে ললাট লিখনের চেয়েও তার মধ্যে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপায়িত করে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা। লুৎফ-উন্নিসা এবং মেহের-উন্নিসা দুজনেই বুদ্ধি এবং মননের সাহায্যে নিজ নিজ আবেগগত অমীমাংসার হাত থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। এই ধরনের চরিত্রকল্পনা ঊনবিংশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ফ্রেমে সম্ভব ছিল না। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীর সক্রিয় ভূমিকা রূপায়ণের জন্য ইতিহাস থেকে কালখণ্ড বেছে নিতে হয়েছে। লবঙ্গলতার পক্ষে লুৎফ-উন্নিসার মতো ব্যবহার সম্ভব ছিল না, ইন্দিরার পক্ষেও নয়। তার কারণ ওইসব নারীচরিত্রগুলি তাদের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের দ্বারা প্রজ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। যারা পেয়েছিল রোহিণী ও কুন্দনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের দুজনকেই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিক ভবিতব্যের বলি রূপে নির্দিষ্ট করে দিলেন। সামাজিক ভবিতব্য ব্যাপারটি সেখানে মুখ্য হতে পারল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলির মধ্যে এই প্রসঙ্গে আর একটি চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে হল মবারক। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে মবারক সে গুরুত্ব পায়নি— সে গুরুত্ব চরিত্রটি পেয়েছে উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণে। মবারক চরিত্রটির মধ্যে যে death

wish প্রবল, তা চতুর্থ সংস্করণের ফল। এই death wish মবারককে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। তার দরিয়া ত্যাগ, জেবউন্নিসার সঙ্গে প্রেম, প্রেমের বিষময় পরিণাম, অথচ বিষকে অমৃতজ্ঞান— এ সবই বঙ্কিমীজগতের সামগ্রী। কিন্তু যে আবশ্যিক কালানৌচিত্য (necessary anachronism) চরিত্রটিকে আধুনিক দীপ্তি দিয়েছে তা হল চরিত্রটির death wish, এবং এর মূলে মবারক জেবউন্নিসার প্রেম। সে প্রেম যেমন হোক, সে প্রেমের পরিণতি যে বিবাহ, তা এই দুই নরনারীর সমুদায় ব্যাপারটিকে মধ্যযুগীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক করে তোলে। একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি— পিতার অভিভাবকত্ব অস্বীকার করে কন্যা বিবাহের সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং তা কার্যকর করল, বঙ্কিমী উপন্যাসে এ ঘটনা এই প্রথম। মবারকের দিক থেকেও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনীয়। সে বাদশাহের অধীনস্থ কর্মচারী। কিন্তু তার স্বাধীন বিবাহ তার জীবনে মানসিক বিড়ম্বনাবোধকে তীব্র করে তুলল। এই বিবাহের উদ্যোগ পর্বে সে উপলব্ধি করেছে সে তার সঠিক কর্মময় ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন। পুরুষ তার কর্মিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সচেতনতায় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন— এটা একটা আধুনিক দায়িত্ববোধ। বঙ্কিম নিজে সচেতনভাবে যে শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এটা সেই শ্রেণীর দায়িত্ববোধ। সুতরাং মবারক যখন দেখল তার প্রেম-মীমাংসা তার জীবনমীমাংসায় রূপান্তরিত হল না, তখনই তার বিবাহ বহন করে এনেছে বিষাদ। এবং এই বিষাদ 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথের বিষাদের বিপরীত। অমরনাথের ঊনবিংশ শতকীয় অধ্যয়নলব্ধ আধুনিকতার ফলে তার বিষাদ এক প্রকার বিষাদদর্শন। অমরনাথ তার এই বিষাদের সঠিক কারণ নির্দেশে সক্ষম হয় নি। তবুও আমরা বুঝতে পারি যে, লবঙ্গলতা ঘটনার আঘাতেই তার নৈরাশ্য ক্রমশ পরিণত হয়েছে ঔদাসীন্যে ও সংসার বৈরাগ্যে। শেষ পর্যন্ত অমরনাথ সংসার ত্যাগ করেছে। কিন্তু সে সংসার ত্যাগ গোবিন্দলালের সন্ন্যাসগ্রহণের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসের ফল নয়। মবারকের বিষাদ কোনো নৈরাশ্য থেকে আসে নি, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা-জনিত নিগূঢ় অকৃতার্থতা বা অচরিতার্থতা থেকেও তার সে বিষাদবোধ আসে নি। জেবউন্নিসাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্তে সাধারণ বিচারে তার ব্যক্তিগত জয়ই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তার সেই ব্যক্তিগত রাগরক্তিম স্বপ্নের সফল পরিণতির মুহূর্তেই তার বিষাদ ঘন হয়ে উঠেছে! সে একথা ভুলতে পারেনি যে, সে মন্‌সব্‌দার। মুঘল রাজপুতের যুদ্ধে তার যথার্থ ভূমিকা ছিল রণাঙ্গনে সে সেই ভূমিকা পালন করতে পারে নি। বিরহের

বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষা কর্মী-পুরুষের এই অচরিতার্থতার যন্ত্রণা কম তীব্র নয়। এইজন্য সে বারবার রাজপুত পক্ষকে এ প্রার্থনা জানিয়েছে যে, তাকে তোপের মুখে রেখে উড়িয়ে দেওয়া হোক। এই মৃত্যুবাসনাই মবারকের অবচেতনের কালো ছায়া দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। সে কালো ছায়া দরিয়া। তার ব্যক্তিগত জীবনের পানপাত্রটি যখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই তার কর্মী জীবনের অকৃতার্থতা এবং দরিয়া সংক্রান্ত পাপবোধ একত্রে সেই পানপাত্রের পূর্ণতাটি খণ্ডিত করেছে। সেখানে যে ছায়াটি ভেসে উঠেছে তা মৃত্যুরূপিণী দরিয়ার ছায়া।

এর পূর্বে লিখিত 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপও এক মৃত্যু ইচ্ছার দ্বারা অধিকৃত ছিল। তা শুধু রোমান্টিক মৃত্যুবাসনা নয়। এই সমাজ আমাকে বা আমাদের বাঁচতে দেয় না— এ জাতীয় একটা বোধ প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে প্রতাপের মৃত্যু ইচ্ছার মধ্যে কাজ করেছে। রমানন্দস্বামীর প্রতি তার শেষ দৃপ্ত ভাষণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সে দৃপ্ত ভাষণের মূলকথা— সর্বপ্রকার সামাজিক-নৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার। 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী'— এই বাক্যে কমা চিহ্নটি লক্ষণীয়। কমা চিহ্নটি এভাবে থাকার ফলে 'সন্ন্যাসী' আর সম্বোধনবাচক শব্দ নয়। শব্দটি ব্যঙ্গাত্মক অভিধায় রূপান্তরিত হয়েছে। মবারকের মৃত্যু-ইচ্ছা ও প্রতাপের মৃত্যু-ইচ্ছার মধ্যে মিল অমিলটাও এই সূত্রে অনুধাবনযোগ্য। মবারক ও প্রতাপের মৃত্যু-ইচ্ছার উৎস রয়েছে তাদের প্রেমে। প্রেম তাদের জীবনে যে গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন নিয়ে এল সেটাই দেখা দিল তাদের নিয়তিরূপে। মিল এইটুকু। অমিলটাই বেশী। প্রতাপের নৈতিক সচেতনতা এক মাত্রার ব্যাপার, মবারকের ভূমিকাসচেতনতা আর এক মাত্রার ব্যাপার। মবারক জেনেছিল জীবন বড় সুন্দর— কিন্তু জীবনের খাতায় যে অঙ্কগুলি সে বসিয়েছে তাদের যোগফল যে এড়াতে পারে না— মরতে তাকে হবেই (ইয়া আল্লা, আমাকে মরিতেই হইবে)। প্রতাপ জেনেছিল এখানে বাঁচার কোনো মানে হয় না। বেঁচে থেকে সে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না, উপরন্তু সকলের জটিলতাই আরো বাড়িয়ে তুলবে। প্রতাপ যে প্রেমবোধ তাড়িত তা বঙ্কিমের অন্য নায়কের মধ্যে নেই। প্রেমমোহ আর রূপতৃষ্ণা একই প্রবৃত্তির দুই পিঠ— একথা প্রতাপের প্রেম সম্বন্ধে খাটে না। সৌন্দর্যবোধ থেকে জন্মায় প্রেম, প্রেম থেকে জন্মায় প্রেমের পাত্রের জন্য আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। একথা বঙ্কিমের সকল প্রেমেরই গূঢ়কথা— এমন কি দেশপ্রেমেরও। তাই প্রতাপ মৃত্যু শিয়রে রেখে রমানন্দস্বামীকে বলে

গিয়েছিল—'আমার ভালবাসার নাম জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।' প্রতাপের মধ্যে স্পন্দিত রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি। অথচ তা অমূলতরু নয়। মীরকাসেমের পক্ষে সে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তার কারণ প্রতাপের ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব উপলব্ধিতে নিহিত।

লক্ষণীয় বঙ্কিমের ইতিহাসদীপিত উপন্যাসগুলিতে কখনো কখনো অতি শক্তিশালী সাবপ্লট ব্যবহৃত হয়েছে। 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' (চতুর্থ সংস্করণ) উপন্যাসের সাবপ্লট এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এক হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা'র অতি ক্ষুদ্র মেহের-কাহিনী এবং মৃণালিনীর মনোরমা-পশুপতি কাহিনীর বিষয়টিও এখানে ভাবা চলে। কাঠামো বিচারে এ সব সাবপ্লটের গুরুত্ব নির্ণয় সমালোচকেরা আগে করেছেন। 'মৃণালিনী'র মনোরমা চরিত্র সম্বন্ধে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাতী মন্তব্য আমাদের স্মরণে আছে। কিন্তু এই সাবপ্লটগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সাবপ্লটগুলির প্রধান চরিত্রপাত্র অনেকক্ষেত্রে তারাই যারা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতাস্বপ্নের প্রতিভূ! মনোরমা-মীরকাসেম-মবারক বা অন্যার্থে মেহের অনেকাংশে জীবনের বাঁধা ছকের বাইরের মানুষ। তাদের প্যাটার্ন অফ থিঙ্কিং বা এ্যাটিট্যুড টুওয়ার্ডস লাইফ কেবল যে রোমান্টিক ব্যক্তি অভীপ্সার দ্বারা চিহ্নিত তাই নয়— উনবিংশ শতকীয় ন্যাশনালিজমও তারা তাদের স্রষ্টার কাছ থেকে ধার পেয়েছে। সাবপ্লটের এইসব চরিত্রপাত্রেরা মধ্যবিত্তের তখনকার নবার্জিত স্বাতন্ত্র্যবোধে— যার বিপরীতার্থক শব্দ পারতন্ত্র্য— চিহ্নিত। সুতরাং হেগেল কথিত necessary anachronism এখানেও লক্ষিত। অথচ চরিত্রগুলি সে যুগের historical peculiarity বা ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলে আধুনিক হয়ে যায় নি। তাহলেই তারা হ'ত অনাবশ্যক কালানৌচিত্যের নিদর্শন— সুতরাং কুশিল্প। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মাত্র এক পরিচ্ছেদগত মেহের-উন্নিসা বিলাসিত জীবনের মধ্যবর্তী থেকেই তার স্বতন্ত্র প্রেমের জন্য দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারে নি। গোপন করে নি। মধ্যযুগীয় রোমান্সের পটভূমি থেকে বঙ্কিম এ জাতীয় চরিত্র কল্পনা করেছেন বটে, কিন্তু মেহের-উন্নিসার প্রখর বুদ্ধিমত্তা, মানবচরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি এবং সচেতন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ('সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?') নারীর আধুনিক ব্যক্তিত্বের পূর্বগামিনী ছায়া। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মীরকাসেম যখন বলেন, 'যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? ···আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি— বা মীরজাফরও নহি', তখন আমরা রাজনৈতিক ভামা-

ডোলের মাঝখানে দণ্ডায়মান এক স্বাধীনতামনস্ক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। মীরকাসেমের পতন বাংলার ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের একটা শোচনীয় ব্যাপার বলে বঙ্কিমের কাছে পরিগণিত হয়েছে। তখনো শাসনকর্তার বিচারদণ্ড নবাব নিজের হাতে ধরে রাখতে প্রয়াসী। অথচ আশ্চর্য, উপন্যাসে মীরকাসেমের স্রষ্টা মীরকাসেমকে যথাসম্ভব ধূম্রাচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছেন। বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে বিষয়টি আলোচনা করা যাবে।

তিন

কেউ কেউ লক্ষ করেছেন, বঙ্কিমের পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা তাঁর উপন্যাসের নারীরা অধিকতর সজীব ও গতিশীল। তাঁর ভদ্রলোক পুরুষ চরিত্রের আড়ষ্টতা তো সুবিদিত। কমলাকান্তের মতো কোনো চরিত্রকে তিনি যদি উপন্যাসে নায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অনেকটা খণ্ডিত হয়ে যেত। বঙ্কিমের সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রমালায় কমলাকান্তই একমাত্র পুরোমাপের আধুনিক মানুষ। তার চিন্তায়, আচরণে, সমাজ অননুমোদিত জীবনযাপনে— সর্বোপরি অস্তিত্বের যন্ত্রণায়, আত্মসম্বিতের বেদনায় এমন চরিত্র বঙ্কিম উপন্যাসে ব্যবহার করতে পারলেন না এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উপন্যাস-তত্ত্ব লিখে যাননি। অংশত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও মুখ্যত ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' আলোচনাই তাঁর উপন্যাস বিষয়ে একমাত্র আলোচনা। তা থেকে এ কথা বোঝা মুস্কিল যে তিনি উপন্যাস বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্বে আশ্রিত ছিলেন কিনা। ঐ আলোচনা থেকে শুধু একটা কথাই স্পষ্ট হয় যে তিনি উপন্যাসে বিষয়ীর স্বারাজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, বিষয়ের স্বাধিকার মানতে রাজী ছিলেন— বিশ্বাস করতেন গদ্যমাধ্যমের আধুনিক পারঙ্গমতায়। 'কল্পতরু'[২] উপন্যাসটি আলোচনা-কালে বঙ্কিম একটি জরুরী বিষয়ের অবতারণা করেন— তা হল মনুষ্যচরিত্রের দ্বিপ্রাকৃতিকতা। এই দ্বিপ্রাকৃতিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যতিরেকে উপন্যাস যে মহৎসৃষ্টি হয় না সে বিষয়ে বঙ্কিমের অবধানতাও এই আলোচনায় স্পষ্ট। প্রকৃতিমূলক চিত্র— যাকে পরবর্তী উপন্যাস সমালোচনায় ভাষায় naturalistic বলি তা মাত্র উৎকৃষ্ট হতে পারে— প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির সম্পূর্ণতা তাতে থাকবে না—এ জাতীয় একটি অভিমত বঙ্কিম পোষণ করতেন, এরূপ অনুমানের কারণ

২. কল্পতরু—বঙ্গদর্শন। পৌষ ১২৮১ : বঙ্কিম-রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ। ৮৯৯ পৃষ্ঠা।

এ আলোচনায় আছে। 'সম্পূর্ণ কাব্য' বলতে বঙ্কিম এ আলোচনায় যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মূলে রয়েছে জীবনের সমগ্রতা সম্বন্ধে লেখকের চেতনা। তিনি অবশ্য 'সমগ্রতা' (totality) শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তিনি সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন 'মহদংশ' শব্দটি। দ্বিপ্রাকৃতিকতার বর্ণিল দীপ্তিতে বঙ্কিমের কমলাকান্ত চরিত্রের মধ্যে উক্ত মহদংশের শৈল্পিক রূপায়ণ যে সম্ভব ছিল তা বঙ্কিম নিজেও জানতেন।

কিন্তু তাহলে তাঁর নিজের উপন্যাসে কমলাকান্তপ্রতিম নায়কের উপযুক্ত অব্‌জেক্‌টিভ কোরিলেটিভ রচনা করতে গেলে ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিক এলিটিজ্‌ম-এর ক্রোড়ে লালিত বঙ্কিমচন্দ্রের পজিটিভ সমাজের স্বপ্ন প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হ'ত এবং সে সংঘাতে স্রষ্টাকেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হ'ত, যেমন বারে বারে হয়েছে। এখানে আমরা আবার 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মীরকাসেমের কথা তুলবো। 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' এই তিনটি উপন্যাসই বাংলার ইতিহাসের প্রায় একই কালখণ্ড নিয়ে লেখা উপন্যাস— তিনটি উপন্যাসেরই শেষ কথা পথের কাজ পথে ফেলে রেখে ভাঙাঘর গোছানোর ভূমিকায় নায়ক নায়িকার প্রত্যাবর্তন। মীরকাসেমের প্রথম পদার্পণে যে দৃপ্ততা তা অচিরে হারিয়ে গেল হেস্টিংসকে সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে। মীরকাসেমের কামান নিনাদের প্রতিশ্রুতি তকি খাঁয়ের বুকে ছুরি ফুটিয়ে শেষ হয়ে যায়। ভবানী পাঠকের শিষ্যা ঘর ঝাঁট দিতে চলে যায়। এই বোধহয় সিপাহী যুদ্ধোত্তর বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানের স্টেবিলিটি সাধনার সতর্ক প্রচেষ্টা— নাকি এ শুধু তাই নয়, এ বুঝি বৃটিশ আমলাতন্ত্রের নেটিভ কর্মচারীর সার্ভিসবুক সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত উদ্বেগ।

এতৎসত্ত্বেও একটা কথা এই তিনটি উপন্যাস প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে কালখণ্ড এই তিনটি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে সেই কালখণ্ডের প্রধান লক্ষণ হ'ল অরাজকতা এবং অস্থিরতার মাঝখানে স্থিরাবস্থার সন্ধান। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাঙালি লেখক যিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে। তাঁর ইতিহাসবোধ তাঁর স্বদেশচেতনায় এল। এবং উল্টোটাও কম সত্য নয়। অর্থাৎ, তাঁর স্বদেশচেতনা তাঁর ইতিহাসজিজ্ঞাসার ফল। কথিত তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের অন্তিমলগ্নে ইংরেজ একটা বহিরাগত শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সমস্ত ইতিহাসটাই মীরজাফরী ইতিহাস নয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অতি অপরিণত রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে কিন্তু সুপরিণত ক্রোধ নিয়ে বাঙালিরা নবাগত

শক্তির সঙ্গে রণক্ষেত্রে মোকাবেলা করতে চেয়েছে। যদিও সেই রণক্ষেত্রেরই একটি সংকট ছিল, তা হ'ল ইতিহাস বিরোধী পক্ষের অনুকূলে— তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনটি উপন্যাসেই যাদের বীরের মর্যাদা দিয়েছেন তারা হ'ল সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক ও মীরকাসেম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখার বিষয় যে তাঁর উপন্যাসের প্রকৃত নায়কেরা কেউ এ জাতীয় বীরের মর্যাদা পায়নি। হয়তো এ ব্যাপারেও বঙ্কিমের নিজ যুগের ছায়া পড়েছে। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে এ জাতীয় বীরেরা আর মুখ্য ভূমিকায় ছিল না— ছিল অদূরগত ইতিহাসের স্মৃতিমাত্র।

কিন্তু এ অভিযোগ থেকে কথঞ্চিৎ মুক্ত বঙ্কিমের নারী চরিত্রগুলি। বঙ্কিমের দুর্গাকল্পনাকে পরে অরবিন্দ 'ভবানী ভারতী' কল্পনা করেছেন। যে আর্কটাইপ থেকে বঙ্কিমের এ কল্পনার স্ফূর্তি, তার প্রধান শক্তি গতিশক্তি বা ডাইনমিজ্‌ম্। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর রচনাগুলি লিখিত হতে থাকে ১৮৭৫ সাল নাগাদ। এই সময়েই "আমার দুর্গোৎসব" রচনায় তিনিই আর্কেটাইপের দ্বারা আবিষ্ট হন। এই আর্কেটাইপ পরে তাঁর দেবী চৌধুরাণী কল্পনায়, শ্রী ও জয়ন্তী কল্পনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 'আনন্দমঠে'র কল্যাণী কল্পনাতেও এর ছায়া আছে বলে মনে করি। কিন্তু আমার এখানে বলার কথা এই যে, ঐ আর্কেটাইপ ছায়া ফেলুক বা না ফেলুক— বঙ্কিমের সমস্ত নায়িকা-ব্যক্তিত্বে একটা ছক্কায় পঞ্জায় ছুটন্তভাব আছে। ব্যতিক্রম মাত্র দুজন— লবঙ্গলতা ও ভ্রমর। এর মধ্যে লবঙ্গলতা কল্পনায় ঐ আর্কেটাইপ-এর পূর্বগামী ছায়া অস্পষ্ট হলেও দুর্লক্ষ্য নয়। লবঙ্গলতা চরিত্রটি অনুধাবনের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাসমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত দরকার। প্রথম লক্ষণ— একথা কেউ কেউ লক্ষ করেছেন, রাধারাণী ছাড়া বঙ্কিমের কোনো নায়িকার নাম হিন্দু দেবলোক থেকে সংগৃহীত নয়। কিয়দংশে মাত্র তা ভাববাচক (শান্তি, কল্যাণী)। প্রধানাংশে তা প্রকৃতিবাচক। লতা, ফুল, ফলের আনুষঙ্গিক, নদী, নক্ষত্র—প্রকৃতির এই সব নানা প্রসঙ্গে তাঁর নামমালা গাঁথা। এই নাম নির্বাচনকে আমরা পুরোপুরি তাঁর স্বাধীন রোমান্টিক কল্পনার দান বলতে পারতাম, যদি না লক্ষ করতাম তাঁর দুই অসুখী নায়িকার নাম নদী ও নক্ষত্রের নামে— শৈবলিনী ও রোহিণী। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জ্যোতিষমতে নদী ও নক্ষত্রের নামে মেয়েদের নাম রাখতে নেই। রাখলে তারা অসুখী হয়। কিন্তু এই সামান্য হেরফেরটুকু বাদ দিয়ে তাঁর নারীপ্রকৃতি-গুলির স্বাধীনতাবোধের কথা ভাবলে এ নামকরণের সার্থকতা বোঝা যায়।

বোঝা যায় তখনো তিনি দেবী নামের ব্যঞ্জনায় যে আদি প্রতিমার ভাবলোক ক্রিয়াশীল তা থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। হিন্দু দেবদেবীদের নামে ছেলে-মেয়েদের নাম রেখে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেব না— 'ফুলমণি ও করুণা'র পরিশিষ্টে প্রচারিত এমন একটা নেতিমূলক মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের অবশ্যই নয়। তাঁর নায়িকাদের জীবনতৃষা পূর্ণত তাদের স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত আবিষ্কারের ফল। এই আবিষ্কারের মূলে যে আধুনিক ইতিবাচক জীবনবোধ তার প্রভাবে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর নায়িকাকুলের দ্বিতীয় লক্ষণ। সে দ্বিতীয় লক্ষণটি হ'ল— সূর্যমুখী-ভ্রমর-লবঙ্গলতা ছাড়া তাঁর প্রধান নায়িকারা সকলেই কোনো না কোনো কারণে ঘরছাড়া। যে যুগে বাঙালি মেয়েরা ঘরের চার দেওয়ালের চতুঃসীমার বাইরে বড় একটা বেরুত না, সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এক ঝাঁক মেয়ের কথা ভেবেছেন পথেই যাদের পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে— পথকে যাঁরা ভয় করেনি। সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পথ অথবা আউটডোর পটভূমি একটা প্রধান ব্যাপার। কপালকুণ্ডলা, লুৎফা, মৃণালিনী, গিরিবালা, শৈবলিনী, দলনী, প্রফুল্ল, শান্তি, কল্যাণী, শ্রী, জয়ন্তীর— এমন কি পারিবারিক উপন্যাসের ইন্দিরারও জীবনের প্রধান ঘটনা তাদের শিখিয়েছে পথকে ভয় না করতে। এই পথের প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নায়িকাদের সাহসিকতার দিকটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের সাহসিকতা গুণটি কাব্যে উপন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রশ্রয় পেয়েছে সব থেকে বেশী। মধুসূদনের হাতে এর প্রথম সূত্রপাত। বঙ্কিমের উপন্যাসে এর সম্যক বিস্তার। এটা যে একটা গুণ, সেটা মধ্যযুগীয় ভাববৃত্তে কোনোদিন স্বীকৃত পায়নি। পাবার কথাও নয়। বাঁধা কাঠামোর আনুগত্যই সেখানে ছিল নিয়তি, নতুনকালে সেখানে সাহসিকতা দেখা দিল স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গিনীরূপে। এই সাহসের ফলও হয়েছে কত বিচিত্র। রাধারাণী নিজের বিয়ের সম্বন্ধ, উদ্যোগ, পাত্রকে যাচাই করা সব নিজে করেছিল। লোকাচার বিরোধী এ আচরণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাধারাণীর এ আচরণের মূলে কেবল রোমান্টিক প্রেম তৃষাকেই প্রধান শক্তি বলে ভাবেন নি। রাধারাণীর এ জাতীয় আচরণের সঙ্গতি প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি প্লটের সাহায্যে একটা সুদৃঢ় যৌক্তিকতা সৃষ্টি করেছেন। পরিণত রাধারাণী আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর। এই স্বনির্ভরতা ছাড়া রাধারাণী তার সাহসিক পদক্ষেপের একটিও গ্রহণ করতে পারতো না। পরোক্ষেও একথা সত্য। আর্থিক স্বনির্ভরতা ছাড়া প্রফুল্ল নিজের এমনকি সাগর বৌয়েরও সকৌতুক সমস্যার সমাধান করতে পারত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারী ব্যক্তিত্বের এই প্রেক্ষাপটে লবঙ্গলতা একটি

ব্যতিক্রম। 'রজনী'র লিখনকাল ১৮৭২-৭৫। 'রজনী'র নতুন কাঠামো এবং তার নায়িকাকল্পনা দুই-ই একথা প্রমাণ করে যে, বঙ্কিম নিজেও যথেষ্ট সাহসী লেখক। গল্পকে তিনি প্রাচীন কাঠামো থেকে মুক্ত করতে চাইছেন, নায়িকাকে তিনি প্রথাবিমুক্ত করতে চাইছেন। ১৮৭৪-৭৫ বঙ্কিমের মনীষার পক্ষে উজ্জলতম দীপ্তি বিকিরণের কাল। ১৮৭৪ থেকে ৭৯-র মধ্যে তিনি সব থেকে বেশী ভাবনাচঞ্চল, সবথেকে বেশী অগ্রণী জিজ্ঞাসায় দৃপ্ত। 'চন্দ্রশেখর' অথবা 'রজনী' অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অন্যদিকে 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'সাম্য'— শিখরে শিখরে বঙ্কিম তখন নতুন নতুন জয়পতাকা প্রোথিত করছেন। এ সবের সূত্রপাত ঘটে 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'তে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ধ্রুপদী কাহিনী বিন্যাসের মাঝেও বঙ্কিমের গৌরব বিবাহিতা নারীর ও বিবাহিত পুরুষের প্রেমের ঘটনাব্যাখ্যানে— যার সামনে 'শাস্ত্র মূক'। 'রজনীর' গৌরব কাহিনীকথকদের স্বাধীনতা অর্পণে। প্রত্যেকের উত্তমপুরুষে যে অনস্বয়েয় জটিলতার ঠিকানা আছে— 'রজনী'র আঙ্গিকরীতিতে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। তবু, লবঙ্গলতা পরাভূত নায়িকা। শুধু পরাভূত নয়— শুধু পরাভূত হ'লে আমাদের কিছু বলার ছিল না। পরাভূত তো বঙ্কিমের কত নায়িকাই, কিন্তু তারা কেউ পরাজয়কে প্রথম থেকে স্বীকার করে নেয় নি। না পদ্মাবতী, না কুন্দ, না রোহিণী—এমন কি হীরা যে হীরা সেও নয়। কিন্তু লবঙ্গ, বঙ্কিমের প্রথম কলকাতার মেয়ে, অত সম্ভাবনাময়, সে কেন প্রথম থেকে এত আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত। বঙ্কিমের অন্য নায়িকাদের সঙ্গে লবঙ্গলতার প্রধান যে তফাত আমাদের প্রথমেই নজরে পড়ে তাহলো হিসেব তাদের বড়ো একটা কারো আসে না। লবঙ্গলতা প্রথম থেকেই হিসেবী। পাকা হিসেবী যে সে প্রকৃত হিসেবে চাপা দিতেও পা'রে। লবঙ্গলতা অন্তত চেয়েছিল তাই। প্রথমটা মনে হয় বাস্তব সম্বন্ধে লবঙ্গলতা বুঝি অন্ধ। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে কোন অলৌকিক সন্ন্যাসী এ অন্ধত্ব দূর করবে? তারপরেই বোঝা যায় সে মোটেই অন্ধ নয়, সে রীতিমতো চক্ষুষ্মান। সে অত চক্ষুষ্মান বলে সন্তর্পিত সতর্কতায় নিজেকে আবৃত করেছে প্রতি পদক্ষেপে। (এখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা সংক্ষেপে সেরে নিই। অমরনাথ একেবারে প্রথমটায় ছিল লবঙ্গতার শিক্ষক। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্কের অবাঞ্ছনীয় উপসর্গটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম অবহিত হলেন।) প্রথম থেকেই সে যেন কী একটা বোঝাতে চাইছে, যা সে নিজে ঠিক বোঝে না। প্রথমটা মনে হয় সে বুদ্ধি আর কাউকে বোঝাতে চাইছে— পরে ধরা পড়ে, না তা নয়, তার লক্ষ্য

সে নিজেই। আরো নজরে পড়ে— লবঙ্গলতাই বঙ্কিমের একমাত্র নায়িকা যে নড়ে না, চড়ে না— 'মুভ' করে না। সে দাঁড়ে বসা পাখির মতো কথা বলে মাত্র। ডানা ঝাপটায় না।

'চন্দ্রশেখর' আর 'রজনী' সামান্য ব্যবধানে লেখা। শৈবলিনী ও লবঙ্গতাকে সেজন্য একবার পাশাপাশি রাখা দরকার। এই জন্য আরো দরকার যে, এই দুই বিবাহিতা নারীর মধ্যে শৈবলিনী স্পষ্ট ভাষায় ও লবঙ্গলতা নাতিপ্রচ্ছন্ন-ভাষায় একথা নিজ নিজ প্রেমাস্পদকে বলেছিল যে, তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের নয়। দুজনের জীবনের অশান্তির মূলে রয়েছে সমাজের হস্তক্ষেপ। কিন্তু মিল এই পর্যন্তই। নিজ প্রয়াস ও পরাজয়ে শৈবলিনী এক— পরাজয়ের মাঝখানে বিজয়িনীর অভিনয়ে লবঙ্গলতা আর এক। ইতিহাসের সন্ধিলগ্নের পটভূমিকায় এক রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝখানে শৈবলিনীর দুঃসাহসী ঘোরাফেরা। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বনিয়াদী কায়স্থ পরিবারের আড়ষ্ট অন্তঃপুরজীবনে লবঙ্গলতার অধিষ্ঠান। তবু একটা প্রশ্ন জাগেই। শৈবলিনীর সাহস না হয় লবঙ্গলতায় প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু লবঙ্গলতার মধ্যে কি তার নিজস্ব বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো সমালোচনাও থাকবে না— যেমন শৈবলিনীর ছিল? একথাও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লবঙ্গলতা চরিত্রকল্পনায় বঙ্কিমের আয়োজন ছিল সব থেকে বেশী। হিসেবী বুদ্ধির দাপটে, সম্পত্তি-সচেতনতায়, নিজেকে ঢেকে রাখার শিক্ষায়, অধিকার-বোধে, ভূমিকা-সজ্ঞানতায় ও সুদক্ষ সাংসারিক সংলাপে লবঙ্গলতা উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার টিপিক্যাল উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের বধূ। একে যে কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করানো যাবে না, তার স্রষ্টা সে কথা জানতেন। 'আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই' বঙ্কিমের সমস্ত দ্বিধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শৈবলিনী প্রতাপের সঙ্গে এই শেষ সংলাপে মিথ্যা করে দিয়েছে রমানন্দ স্বামীর অলীক শুদ্ধিপ্রয়াস। এরকম সামাজিক অর্থে বিপজ্জনক উক্তি বঙ্কিমের আর কোনো নায়িকা কখনো করে নি। এর সঙ্গে অমরনাথ-লবঙ্গতার শেষ সংলাপটি তুলনীয়। লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলেছিল —'তুমি আমার কে? তা তো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—' অসমাপ্ত এই বাক্যটিকে সে কিছুক্ষণ বাদে সম্পূর্ণতা দিয়েছিল— এই ভাষায়— 'লোকে পাখি পুষিলে যে স্নেহ করে ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনো হইবে না।' নির্দিষ্ট শব্দটি অমরনাথেরও কান এড়ায়নি— 'ইহলোক'। 'ইহলোক' বা 'এ পৃথিবীতে' বলতে লবঙ্গলতা যা বোঝাতে চাইছে

তার অর্থ হওয়া উচিত 'এ সমাজ'। কিন্তু পাখি পোষার উপমায় আমরা বুঝি লবঙ্গলতা মূল কথাটি নিয়ে অনেক আমতা আমতা করছে। সন্দেহ হয় লবঙ্গলতার সুখের বিজ্ঞাপন, স্নেহের বিজ্ঞাপন এবং এইসব উক্তি বুঝি শৈবলিনী রচনার জন্য বঙ্কিমের নিজের প্রায়শ্চিত্ত। অমরনাথ-রজনীর ব্যাপারে লবঙ্গলতার উদ্বেগ আমাদের স্পর্শ করল না এইজন্য যে, অমরনাথ প্রসঙ্গে লবঙ্গলতাকে আমরা কখনো সমর্থন করতে পারি নি। সম্পন্ন পরিবারের বৌ মালিকানার প্রশ্নে খুবই সজাগ। শুধু রজনীর সম্পত্তি দখলে রাখার জন্যই যে সে উদ্বিগ্ন ছিল তাই নয়। লবঙ্গলতার পোড়ো জমি অমরনাথ— সেখানে আর কেউ আবাদ করবে, লবঙ্গতার সম্পত্তিবোধ এখানেও পীড়িত ছিল। তাই লবঙ্গলতার অমর-নাথ-অনুভূতি আমরা কোনো সময়ে বিশ্বাস করতে পারি নি। অশ্রুগদগদ মুহূর্তেও না। তার দম্ভ, তেজ সবই বালিকাসুলভ প্রদর্শনপরায়ণ আচরণ।

চার

নানা বিখ্যাত বঙ্কিমী স্ববিরোধের একটির দিকে এবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৮৭৪-১৮৭৯ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিলেন, তারই পরিণতিতে যেমন তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞানের অন্তত তখনকার মতো সব থেকে আধুনিকতম ধারণায়, তেমনি এই সময়ের মধ্যেই তাঁর চিন্তায় এবং চেতনায় হিন্দু জাতীয়তা-বাদের বীজটিও উপ্ত হয়েছে। একথা ঠিক যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সোশ্যালিজম্-এর কথা বলেছেন তা "প্রথম আন্তর্জাতিক"-এর সমাজতন্ত্রবাদ। তার লেখা পড়লে মনে হয় যে কোনো হাতফেরতা আকরগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট মার্কসীয় অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যেমন মার্কস কথিত primitive accumulation-এর তিনি বাংলা করেছিলেন আদিম সঞ্চয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে বঙ্কিম তাঁর সোশ্যালিজ্‌ম-এর পক্ষপাতী ন্যায়সূত্র ব্যবহার করে হিন্দু সোশ্যালিস্ট হয়ে উঠলেন না। বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা বঙ্কিমকে জাতীয়তাবাদী হতেই বাধ্য করেছে। বঙ্কিম 'সাম্য' (১৮৭৯) লেখার পরে যখন দেখলেন, যে, সাম্য হিন্দু ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তখনই তিনি 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচারবন্ধের পথে পা বাড়িয়েছেন। অন্তত, বঙ্কিম সেদিন যা অনুধাবন করে-ছিলেন তা হল এই, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ জাতীয়তাবাদী হতে পারে

না। ১৮৭৫-এর আগেই তিনি যখন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রবন্ধগুলি লিখছেন, তখন যে বঙ্কিম "বিড়াল" প্রবন্ধটি রচনা করলেন, আর যে বঙ্কিম "আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধটি রচনা করলেন— এই দুই ধারার কোনো সিনথেসিস্ বঙ্কিম রচনা করতে পারলেন না। বরং পরবর্তী কালে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে যে, এই দুই ধারা এণ্টিথেটিক্যাল। সে কারণেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করেছিলেন। ১৮৭৫-১৮৭৯-র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদৃষ্টি এইভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই শ্রেণীর বাঙালি মধ্যবিত্তকে নায়ক-পদে অভিষিক্ত করেন নি যারা অগ্রণী সামাজিক চেতনার পতাকাবাহী। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো নায়ক ছাত্র নয় —রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নায়কই হয় ছাত্র, নয় সবে কলেজসীমা লঙ্ঘন করেছে। সমাজের যে-অংশে তখনকার সীমাবদ্ধ এবং যৎসামান্য গতিশীল সামাজিক আন্দোলন চলছিল, বঙ্কিম সেখান থেকে কখনো কোনো নায়ক আহরণ করেন নি। বরঞ্চ দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই সময়কার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তখনকার সামাজিক আন্দোলনের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। বহুপত্নীক স্বামীর সংসারেও নারী যে স্বামীগরবিনী হয়, শৈবলিনীকে দিয়ে বিস্ময়কর অভিভাষণ করিয়ে বঙ্কিম তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এটা পরোক্ষে বহুবিবাহবিরোধী আলোড়নেরই বিপক্ষতা। কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণী দুজনকে দিয়েই তিনি দেখালেন বিধবার বিবাহ-বাসনা ও প্রেমাতুরতা শেষ পর্যন্ত নিহত হয়ে দেখা দেয়। এ সমস্তই আর কিছু নয়—যে সামাজিক আন্দোলন তখন যাহোকতাহোকভাবে দানা বেঁধে উঠছিল, জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমের মনে হয়েছিল তা ঐতিহ্যবিরোধী। এ কারণেই তাঁর নায়কমাত্রেই অত্যন্ত নেতিমূলক চরিত্রকল্পনা। নায়িকাদের মধ্যেও তিনি তপ্ত লোহা একবারই ধরেছিলেন, তা শৈবলিনী। এবং তা ধরেই ছেড়েও দিয়েছিলেন।

নায়কদের মধ্যে বঙ্কিমের স্বকালকে মূর্ত করছে অমরনাথ— সে যেন সেই সময়ের অর্জিত বিষন্নতার প্রতিনিধি। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, অমরনাথকল্পনায় তিনি তাঁর আদর্শ অনুযায়ী সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এ সমস্ত কথার কোনটাই ভুল নয়। কিন্তু তাহলেও একটা কথা থেকেই যায়। অমরনাথ কোন্ অচরিতার্থতার বিগ্রহ? কিছুটা অনুমান করতে পারি যখন আমরা অমরনাথের আত্মকথায় পড়ি :

পর কেবল বহির্জগতের কর্তা— অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার

> রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য জগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি বা নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি?

তখন আমরা বুঝতে পারি বহির্জগতে পীড়িত, প্রবল মন্ময়তাবাদী স্বাধীনতা অভিমানী এক যুবকের লেখনী থেকে কথাগুলি বেরিয়েছে। 'রজনী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে "অমরনাথের কথা"র তৃতীয় পরিচ্ছেদটি এখানে আরো উদ্ধৃতির যোগ্য। এ পরিচ্ছেদে স্বীয় পুরুষার্থের অবৈকল্য খুঁজে ফিরেছে এক যুবক। সে যুবকের অভিজ্ঞতায় যা মূল কথা, তার বীজ রয়েছে বঙ্কিমেরই আত্মসমীক্ষার। প্রায় একই সময়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর "আমার মন" রচনায় 'রজনী'-র দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত অমরনাথের আত্মবিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যাবে। 'প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইবে আমি কি খুঁজি'— এ প্রশ্ন অমরনাথেরও, এ প্রশ্ন কমলাকান্তেরও। কমলাকান্ত এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হয়েছিল স্থায়ী সুখ ও অস্থায়ী সুখের পার্থক্য নির্ণয়ে। তার শেষ সিদ্ধান্ত ছিল, পরসুখ বর্ধন ব্যতীত সংসারে স্থায়ী সুখের অন্য মূল নেই। অমরনাথ কিন্তু প্রশ্নটিকে অধিকতর যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে যেতে পেরেছিল। 'আমার কাম্য বস্তুর অভাবই আমার দুঃখ'— একথা যখন অমরনাথ বলে তখন সে তার স্বশ্রেণীর নেতিমূলক নিষ্ক্রিয়তার প্রায় প্রতিনিধিত্ব করে বসে। 'আমার কাম্য বস্তুর অভাব' এই বোধ থেকে অমরনাথের স্রষ্টা, তথা কমলাকান্ত পৌঁছেছিলেন অন্তত তাঁর অনুভূত তৎকালীন রঙিন উদ্দেশ্যচারী বিষণ্নতা থেকে দেশানুরাগের সুদৃঢ়তত্ত্বে। অমরনাথকে উপন্যাসে সে অবকাশ দিতে পারলে সে একটা ইতিবাচক চরিত্রে রূপান্তরিত হ'ত। উপন্যাসে সে অবকাশ ছিল না। আর, সমকালীন মধ্যবিত্তকে দিয়ে সে তত্ত্বের কর্মময় মূর্তি গড়ে তোলার সাহসও তাঁর ছিল না। আবার যদি প্রতাপের পাশে অমরনাথকে রাখি, তাহলে এই একই সময়ে পরিকল্পিত বঙ্কিমের দুই নায়কের ভিতর দিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার অসহায়তাকে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুভূতি ক্ষীণ হলেও প্রত্যক্ষ ছিল যে, ইংরাজের গড়া রিপোর্ট যাদের দস্যু বলে ঘোষণা করেছে, তাদের অনমুবর্তিতার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাই প্রতাপ দস্যু, ভবানী পাঠক দস্যু, সত্যানন্দ দস্যু। আরো লক্ষণীয়, এই তিন দস্যুরই প্রধান প্রতিপক্ষ অত্যাচারী রাজশক্তি— ইংরাজ-

শক্তি। 'ইংরেজ জাতিকে বাংলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য'—একান্ত ব্যক্তিগত কারণে হলেও প্রতাপের সিদ্ধান্ত ছিল কিছুটা জাতিবাচক। 'এইরূপ অনিষ্ট (ইংরেজ) আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে'— এ জাতীয় ব্যাখ্যায় তার সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত সীমাকে লঙ্ঘন করে যায়। প্রতাপের, ভবানী পাঠকের, এবং সত্যানন্দের চরিত্রনিয়তির সাদৃশ্যটুকুও অনুধাবনীয়— এরা প্রত্যেকেই প্রাণ বিসর্জনের জন্য আকুল ছিল। ইংরাজের অধিকৃত ভূমি বাসোপযোগী নয়— এ বোধ যেন এদের চঞ্চল করে তুলেছিল। এদের কাম্য বস্তু ছিল ইংরাজ বিদায়। সেজন্যই কিন্তু এত যন্ত্রণার মধ্যেও এরা কেউ বিষণ্ণ চিত্ত ছিল না। 'আমার কাম্য বস্তুর অভাব'— একথা প্রতাপ, ভবানী পাঠক বা সত্যানন্দের নয়। তাদের সকলের সামনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য তাদের মরতে পাঠিয়েছে বটে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও 'স্ট্যাটিক' করে তোলে নি। অমরনাথ যে শ্রেণীর মানুষ, যে যুগের মানুষ, সে যুগের বাঙালি যুবকের সামনে আত্মপ্রতিষ্ঠার অনেকগুলি পথ খোলা ছিল। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম অমরনাথের মতো সচেতন ব্যক্তির কাছে সেই পথগুলির সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই ধন যশ জ্ঞান— প্রতিযোগিতাপরায়ণ আধুনিক জীবনের দৌড়ের নানা ক্ষেত্র সত্ত্বেও, অমরনাথ ম্লান।

আরো দেখি, প্রতাপের জীবনে ভালবাসার অভিঘাত আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু অমরনাথের জীবনসম্বন্ধীয় চেতনা প্রথমাবধি নেতিবাচক। সে নিজের জন্য বা প্রেমাস্পদের জন্য প্রতাপের মতো স্বনির্দিষ্ট পথ নির্বাচন করতে পারে না। যে হিতবাদের ক্ষীণ জের তার শেষদিককার যাবতীয় করুণ সিদ্ধান্তের মধ্যে ছায়া ফেলেছে, তা পরাভূতের আত্মসান্ত্বনা মাত্র। সুতরাং অমরনাথ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গতিবেগসম্পন্ন নায়ক প্রতাপ। আগে অথবা পরে এ জাতীয় নায়ক নিয়ে কাজ বঙ্কিম করেন নি। প্রতাপের পর— এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলি শৈবলিনীর পর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেসব নায়ক নায়িকা এসেছে, তারা ঠিক ওই ডাইমেনশন আর পায় নি। নায়কদের ব্যক্তিগত জীবন এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিব্যাপ্ত ঘটনার সংযোগে এক বিস্তৃত জীবনের কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্র আর করে উঠতে পারেন নি। তিনি যদি অমরনাথ চরিত্রকল্পনায় যে পাংশুতা এবং সংকীর্ণতা রয়েছে তা ঘোচাতে পারতেন, তাহলে অমরনাথই হ'ত তাঁর সর্বোত্তম আধুনিক চরিত্র। কিন্তু অমরনাথ দেশত্যাগ করে এবং গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ করে একথাই প্রমাণ করল যে, তাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া ব্যাপারটার মধ্যেই

একটা দৈন্ত ছিল। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। বলা হয়ে থাকে এটি তাঁর সব থেকে সুলিখিত উপন্যাস। কথাটি মিথ্যা নয়। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে নেই। এ উপন্যাসের মূল সমস্যা নৈতিক সমস্যা। সে নৈতিক সমস্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাত ট্রাডিশনের দিকে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সেটা ছিল না তা নয়, কিন্তু যেভাবে হোক 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনী তাদের স্রষ্টার সচেতন অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে গিয়েছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তিনি প্রথম থেকেই চরিত্রগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন যে, তারা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছে এক একটি মূল্যমানের প্রতিনিধি। সে কারণেই, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ব্যক্তিজীবনগুলি যেমনভাবে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে 'চ্যালেঞ্জ' করতে পেরেছিল—অন্তত চেষ্টাও করেছিল, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তা কেউ করে নি। এ উপন্যাসে সে কাজ করার কথা ছিল একজনের, সে রোহিণী। বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত রোহিণীর মধ্যে ট্রাজিক দীপ্তির পূর্বাভাস লক্ষণীয়। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই সে দীপ্তিটি নিবিয়ে দিলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্যজীবনের স্থায়িত্বটাকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহ্য-অনুসারী চেতনায় আঁকড়ে ধরেছিলেন। অর্থাৎ শৈবলিনী থেকে ধীরে ধীরে বঙ্কিমচন্দ্র পিছিয়ে আসছিলেন। আর, প্রতাপ থেকে তো পিছিয়ে আসছিলেন বটেই। এর পরে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে কতকগুলো তত্ত্বের প্রতিমা পেয়েছি। কিন্তু জীবনপ্রতিমা আর পাই নি। এ পশ্চাদপসরণের কারণটি অনুধাবনীয়।

পাঁচ

শৈবলিনী-রোহিণী-কুন্দনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রমালায় এমন সব ব্যক্তি-কল্পনা যেখানে সত্তা-সমাজের বৈরিতার বিষয়টি বঙ্কিম ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু আগেই বলেছি এই বৈরিতার বিষয়টিকে প্রশ্রয় দিতে বঙ্কিমচন্দ্র পারেন না। কারণটা শুধু এই নয় যে, বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানদের স্থায়িত্ব সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রও অংশীদার ছিলেন। কারণটা শুধু এও নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-কল্পনা আত্মরক্ষামূলক। কারণ বরঞ্চ এই যে, তাঁর কাছে যে-সিন্থেসিস্টা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার মূল কথাটা ছিল দেশপ্রীতি। আর তাঁর দেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য লক্ষণ ইতিহাসপ্রীতি। কিন্তু তাঁর ইতিহাসচেতনায় প্রধান

সীমাবদ্ধতা এই যে, সে চেতনা ছিল আদর্শায়িত এবং ভাবাত্মক। হয়তো একজন দেশপ্রেমের প্রথম প্রবক্তার পক্ষে এছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা পরাধীনতার স্বরূপ অধ্যয়নে ভুল করলেন। কিন্তু ভুল সত্ত্বেও তাঁর আবেগের অকৃত্রিমতায় আমরা সন্দেহ করতে পারি না। সেই আবেগ থেকে তিনি উপনীত হলেন তাঁর দেশতত্ত্বে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লেখার আগেই তাঁর এই দেশপ্রীতির তত্ত্ব জায়মান হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব থেকে বঙ্কিম তাঁর অনুশীলন তত্ত্বে পৌছলেন না—এই তত্ত্বকে দাঁড় করানোর জন্ত তিনি অনুশীলন তত্ত্বের দীর্ঘ চর্চা শুরু করলেন। যখন তাঁর মনন ও চেতনা এই লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হতে থেকেছে, তখনই তিনি বিদায় দিলেন তাঁর সমকালীন মধ্যবিত্ত পাত্র পাত্রীদের। তখন তাঁর অমরনাথ অথবা গোবিন্দলালকে দিয়ে বা সেই শ্রেণীর চরিত্র পাত্রকে দিয়ে সে দেশতত্ত্বের প্রতিমা রচনা সম্ভব নয়। পরোক্ষে বঙ্কিম বুঝেছিলেন, তাঁর উপলব্ধ ও অর্জিত দেশতত্ত্বের পক্ষে এদের জীবন অতীব সীমিত। ত্রয়ী উপন্যাসে তিনি তাই আবার ফিরে গেলেন ইতিহাসের পটভূমিকায়। সেখানে সিপাহী যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক তটস্থতায় তাঁকে বিব্রত থাকতে হবে না। সেখানে এ স্বাধীনতা ব্যবহার করতে গিয়েও তিনি জানলেন একজন সচেতন মধ্যবিত্তের পরাধীনতার বিড়ম্বনা কত দুর্ভেদ্য। তাই তাঁর নায়কদের এত মনগড়া তত্ত্বের কুয়াসায় আত্মগোপন, এত আপোষ। এই পরিস্থিতিতে তিনি যখন বুঝলেন, ঝাঁসির রানীকে নিয়ে উপন্যাস লেখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না—বুঝলেন, যে 'আনন্দমঠ' নিয়ে আপোষের স্মৃতি পীড়াদায়ক—তখনই তিনি উপন্যাসক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন।

অথচ শক্তি যে তাঁর তখনও অক্ষুন্ন ছিল চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ' তাঁর প্রমাণ। চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ'-এর প্রকাশ কাল ১৮৯৩। ততদিনে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) লেখা হয়ে গেছে। লেখা হয়ে গেছে 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এসবের কোনো কিছুর প্রভাব 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নেই। মোহিতলাল এ বিষয়টি আবেগময় ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎচন্দ্র বক্তৃতায়[৩] ব্যাখ্যা করেছেন। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারী, মবারক জেবউন্নিসা, ঔরঙ্গজীব-নির্মলকুমারী—এই সব কোনো আখ্যান বা এপিসোডের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বময় পরিণামের কোনো যোগ নেই। ১৮৯৩—আর এক বছর তাঁর তখন বাকি আছে। যবনিকা কম্পমান। ঠিক এই সময়ে তিনি নতুন

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মোহিতলাল মজুমদার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫

'রাজসিংহ' লিখলেন। সে ইতিহাস অদূরবর্তী অতীতের বঙ্গদেশের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস নয়, ব্যর্থপরিণাম বিদ্রোহের ইতিহাস নয়। সেই ইতিহাসবিধৃত কাহিনীতে কোনো আবশ্যিক কালানৌচিত্য সৃষ্টির দরকার হল না। তা হলে লিখতে পারছিলেন না তিনি— একথা ঠিক নয়। লিখতে তিনি পারছিলেন— প্রতিভা তাঁর অক্ষুন্নই ছিল। কিন্তু তিনি লিখছিলেন না। কেন লিখছিলেন না, সেটা অনুধাবন করতে গেলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে তাঁর শেষ কয়েক বছরের নিরুপায় অথচ নির্ভুল উপলব্ধির দিকে। দেশপ্রীতি ছাড়া তখনকার ভারতবাসীর আর কোনো আঁকড়ে ধরার মতো ধর্ম নেই— এই তাঁর শেষ উপলব্ধি। অথচ একে নিয়ে আর তাঁর উপন্যাস লেখার সাহস নেই। এগার বছর পরে এ সব থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি লিখলেন নতুন 'রাজসিংহ'— তা শুধু তাঁর নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি মাত্র। এও আর এক পশ্চাদপসরণ বৈ কি!

১৯৮৫

চরম জটিলতার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শিল্পীমানসের সতত অন্বিষ্ট এক পরম ঐক্য। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ শিল্পকর্ম এই অন্বেষাজনিত টেনশনের তুরীয় উত্তরণ। কান্টের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শিল্পসংজ্ঞার্থের পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ে হেগেলের হাতে। শিল্পগত ঐক্য যে ইতিহাসের বিশেষ যুগের সঙ্গে গাঁথা ব্যাপার, বৌদ্ধিক ঐক্য যে সামাজিক কাঠামোর সামগ্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত— সে কথা হেগেল প্রতিপাদনে প্রয়াসী হন। ভাবরূপের শিল্পসম্ভব ঐক্য কবি বা শিল্পীর বিশ্ববীক্ষার দান। জগৎজীবনে পুরাতন ও নতুন মূল্যমানের যে নিয়ত বর্জন ও অর্জনের দ্বান্দ্বিক প্রবহমানতা প্রত্যক্ষ হচ্ছে, কবি বা শিল্পীর তৎসম্বন্ধীয় সচেতনতা মহৎ শিল্প-কীর্তির একটা প্রাথমিক শর্ত। সে শর্ত পালনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনন্যতাচর্চা তত সহায় নয়, যত সহায় ব্যক্তিস্বরূপের অবৈকল্য সন্ধান। সে কারণে কবি বা শিল্পী যে ভূমিকা পালন করেন, তার নাম বিষয়ের অভিব্যক্তি সাধন নয়— তিনি যা করেন তাহ'ল, বিষয়োপলব্ধিজনিত অনুভূতির রূপময় অভিব্যক্তি সাধন। কবিতার মূল্য নির্ভর করে এই উপলব্ধির গভীরতার উপর। যাকে আমরা বিষয় বললাম সেটা যাই হোক না কেন, বস্তুত কবির তত্ত্ববিশ্বেরই অংশ। ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের অব্যর্থ ব্যাখ্যা এখানে আমাদের কাছে সবিশেষ আলোকসম্পাতী— আমরা বর্তমান প্রবন্ধে চিত্রকল্প বিষয়ক আলোচনাতে সীমাবদ্ধ বলেই সে কথা আরো জরুরী— ব্যক্তিস্বরূপ জন্মায় আত্মজিজ্ঞাসার উদ্যোগে। আত্মজিজ্ঞাসার ভূমিকা রচিত হয় অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। আমরা যাকে Unitary World Vision বলছি, বলছি বিশ্ববীক্ষা, তা যেহেতু আত্মজ্ঞানেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ, যেহেতু কবিতা সমষ্টিগতভাবেই হোক আর ব্যক্তিগতভাবেই হোক, মানুষের ক্রমবর্ধমান আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য, সেহেতু কবিতার চিত্রকল্পের উপাদানে ও নির্মাণে, তার ব্যঞ্জনে ও ব্যঞ্জনায়, তার ইন্ধনে ও আলোয় সেই আত্মজ্ঞানের পরিচয় স্পষ্টতা পায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'তে সে আত্মজ্ঞানের মূল প্রেরণা যুগিয়েছে কবির উৎকণ্ঠা। এই উৎকণ্ঠার কেন্দ্রে ছিল কবির ব্যক্তিকতা ও নান্দনিকতার অবৈকল্য সন্ধান— মূলে ছিল শেষ চরিতার্থতার বাসনা। কিন্তু 'পরিশেষ' থেকে রবীন্দ্রচিত্রকল্পের স্বভাবে কিছু পার্থক্য দেখা দিল বিশ্বস্বীকার তথা আত্মজ্ঞানের নতুন মাত্রার জন্ত। 'বলাকা'র উর্ধ্বগা আবেগের মর্ত্যাবতরণ ঘটেছিল 'পলাতকা'য়। বস্তুবিশ্বের দৌরাত্ম্য যে সতত অস্বীকার্য নয় 'পলাতকা'র রূপে ছন্দে তারই পরিচয়। 'পূরবী'-তে রবীন্দ্রচিত্রকল্প পুনরায় বৃহত্তের অভিমুখী হয়েছে জল-স্থল অন্তরীক্ষের সঙ্গে সহমর্মিতায়— হয়তো সে সহমর্মিতার ব্যক্তি-উপাদান ছিল জীবনের যোগফল আর নিজেকেই পূর্ণত অবলোকনের বাসনায়—সে পূর্ণাবলোকনে চরিতার্থ ও অচরিতার্থতার আলোছায়ার মেশামেশি। 'পূরবী'র চিত্রকল্পেও তাই। 'নীল' সেখানে বাদী রঙ। এমন কি প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর অভিঘাতে লেখা কবিতাগুলিতেও নীল ও সাদা-কালোর মোটিফের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত আমরা এখানে 'পূরবী'র "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" নামক কবিতাটির সঙ্গে ইয়েট্স্-এর মৃত্যুতে লেখা অডেনের কবিতাটির তুলনা করতে পারি। কবির মৃত্যুতে লেখা দুটি কবিতাই মৃত্যুঞ্জয় প্রাণমহিমার জয়গান— শোক-কবিতার বিষাদের আধারে সে জয়গান ধৃত। রবীন্দ্রনাথের "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপকে দেশকালের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে মুক্ত মানবিকতার প্রেরণায় কবিতাকে সংগ্রামের মশাল করে তুলতে চেয়েছিলেন, সে কথা স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথ দুবার অগ্নি-রূপকের প্রয়োগ করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে সংগ্রামী ভাবী পথিকদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের গানের রাখীবন্ধনের কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার ভিতর দিয়ে। আশ্বিনের আশ্বাস সত্ত্বেও বর্ষার চিত্রকল্প কবিতাটিতে বারে বারে দেখা দিল। কিন্তু বার বার সব ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে 'মুক্ত' 'নব' 'নূতন' প্রভৃতি বিশেষণ, 'অগ্নিবাণ', 'বহ্নিতেজ' প্রভৃতি উপমান। এগুলির প্রতি কবি-পক্ষপাত এই কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ না রেখে তাঁকে প্রতীকে রূপান্তরিত করেছে—তা হল ভারতীয় তৎকালিকতায় মুক্তযৌবনের প্রতীক। 'মুক্তমন' 'দীপ্ততেজ' সেই প্রতীকার্থবাচক উক্তি। 'সর্ব আবরণ করি লীন চিরন্তন হলে তুমি' এই প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্পেও রয়েছে ভৈরবের মুক্তি সাধনার ঐতিহ্যে আধুনিক অবগাহন। ইয়েট্স্-এর মৃত্যুতে লেখা অডেনের কবিতাটিতে ইয়েটস্-এর ব্যক্তিকতা ততটা

প্রয়োজনীয় হয়নি, যতটা হয়েছে ইয়েটস্‌-এর মধ্যে কল্পিত কবি প্রতীকের স্বাধীনতার প্রশ্নটি। এই কবিতাটিতেও নিসর্গ প্রকৃতির চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। তা শীতের ছবি। কিন্তু বসন্তের আশ্বাসের কথা নেই। হয়তো উনিশশো উনচল্লিশে সে আশ্বাস সুলভ ছিল না। কিন্তু উনচল্লিশ সালের সেই দিনগুলিতে যখন :

> ইন্ দি নাইটমেয়ার অফ্ দি ডার্ক / অল্ দি ডগ্স্ অফ্ ইউরোপ বার্ক / এণ্ড দি লিভিং নেশনস ওয়েট / ইচ সেকোয়েস্টারড্ ইন ইটস্ হেট, তখন কবিকেই একমাত্র বলা যায় : ইন দি ডেজার্ট অফ্ দি হার্ট / লেট্ দি হিলিং ফাউন্টেন স্টার্ট / ইন্ দি প্রিজন অফ্ হিজ ডেজ / টিচ দি ফ্রিম্যান হাউ টু প্রেজ।

এ কবিতায় একাধিকবার ফ্রিমেন, প্রিজন্ সেলের কথা এসেছে। কিন্তু প্রসঙ্গ প্রকরণের প্রভূত পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি শোক-কবিতাই দুই কবির নিজ নিজ দেশকালধৃত জীবন অধ্যয়নের প্রমাণ বহন করছে।

'পূরবী' কাব্যে আস্তে আস্তে চিত্রকল্পের পরিধি বাড়তে শুরু করল। 'ইনট্রোডিউসিং দি ইরেলিভ্যান্ট' যে চিত্রকল্পের প্রধান অভিজ্ঞান তারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি যখন বলেন—'মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁইফুলের এই গান' তখন তা আর শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম বিরোধ অলংকারেরই নিদর্শন নয়। 'মেশিনগান' এবং 'জুঁইফুল'-এর সহাবস্থিত বৈপরীত্যে পুনরায় ফুটে উঠেছে ইতিহাস এবং কবির নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'পূরবী' পর্যায়ে নীল রঙের ব্যবহার সমধিক। নীল রঙ প্রশান্তি এবং আত্মস্থতার বার্তা বহন করে। কিন্তু এই নীল রঙ যে আর বেশীক্ষণ নীল থাকবে না, 'পরিশেষে'র কালো রঙ এসে তাকে গ্রাস করবে তার ইঙ্গিত 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে একেবারে দুর্লভ নয়। 'পূরবী'র "বৈতরণী" ও "অন্ধকার" কবিতা দুটিতে সমাসন্ন দিনান্তের অন্ধকারের চিত্রকল্প অবশ্য একান্ত-ভাবেই ব্যক্তিগত অন্ধকার। সে অন্ধকারের কাছে কবির ব্যক্তিগত প্রণাম আসলে আলোকেরই তপস্যা। কিন্তু 'পরিশেষ' পর্যায়ে অন্ধকারের পটভূমিটি হয়ে উঠল অনড়। আন্তর্জাতিক, স্বাদেশিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমাহারে এই কালো ডানা মেলে-দেওয়া অন্ধকারের পাখি কবির অনেকগুলি চিত্রকল্পে নতুন ভেহিক্‌ল রচনা করেছে। 'পরিশেষ' পর্যায়ের কবিতা বলতে যদি আমরা বর্তমান সংস্করণের কবিতাগুলিকেই মাত্র না ধরি— যদি প্রথম সংস্করনের কবিতাগুলিকে যার কয়েকটি পরে 'পুনশ্চে' চলে এসেছে ও সময়ের দিক থেকে অনিবার্য "শিশুতীর্থ" কবিতাকেও ধরি— যা 'পুনশ্চ' পর্যায়ের অন্তত একবছর

আগের লেখা, তাহলে 'পুনশ্চ' পর্যায়ে রবীন্দ্রচিত্রকল্পের মৌল শক্তি স্তিমিত, আমার এ অভিযোগের জবাবে দুই কাব্যের সীমানা চৌহদ্দি নিয়ে বৃথা বাদ-প্রতিবাদ ঘটে না। আমি যেভাবে 'পরিশেষ' কাব্যের সীমা নির্দেশ করতে চাই, তার সীমার মধ্যে বস্তুবিশ্বের অভিঘাতে চঞ্চল কবিমানস চিত্রকল্পে কীভাবে নতুন ভেহিক্‌ল্ ব্যবহার করেছেন তার একটি তালিকা দিলাম :

(ক) রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে। (খ) কাঁকর পথের পারে। শুক্‌নো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে। (গ) মলিন উষার স্বর্ণ, | কল্পনা যত বাদুড়ের মতো | রাতে ওড়ে কালো বর্ণ। (ঘ) প্রতারণার ছুরি | পাঁজর কেটে করে চুরি | সরল বিশ্বাস। (ঙ) বোবা গাছ ওরে | সহজে বহিস শিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন। (চ) কদর্যের কদাঘাতে | দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা। (ছ) বাদলের কালোছায়া | স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে | কলে পড়া জন্তুর মতো | মূর্ছায় অসাড়। (জ) পাহাড়-গুলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষু কোটরের মতো।

একথা আমরা জানি যে, ভেহিক্‌ল-এর নবীভবনে কবিতার বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার দিগন্তপরিবর্তনই শুধু ঘটে না, দিগন্তবিস্তৃতিও ঘটে। রবীন্দ্রকাব্যে আমি যাকে 'পরিশেষ' পর্যায় বলছি, সে পর্যায়ে বহির্বিশ্ব ও অন্তর্বিশ্বের সহযোগে ভেহিক্‌ল-এর এমন উদ্ভাবন ঘটেছে।

কিন্তু 'পুনশ্চ' পর্যায়ে চিত্রকল্পের জাত এবং প্রকৃতি কিছুই আর এমনটি থাকার কথা নয়। 'পুনশ্চে'র কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অবশ্যই মনে রাখি যে, 'পুনশ্চ' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিনিবেশের বিষয় ছিল গদ্য পদ্যের সীমারেখার রদবদল। 'পুনশ্চে'র গদ্যছন্দ সেই অন্বেষার পরিণাম। ছন্দোবদ্ধ বাণীর ধ্বনিমূল্য বিচারে একটা কথা বলা হয়—একই শব্দ ছন্দোবন্ধনে যে ধ্বনিমূল্যের নির্দেশ করে, ছন্দোবন্ধন থেকে বিমুক্ত অবস্থায় তা করে না, এমনকি দুই ছন্দের একই শব্দ পৃথক ধ্বনিমূল্য সৃষ্টি করে। ছন্দোবন্ধনে যুক্ত শব্দের ধ্বনিমূল্য (Phonetic Value) এক হিসাবে কবির তাৎক্ষণিক জীবনভাষ্যের প্রতিনিধি। চিত্রকল্পের বেলাতেও এই কথা প্রযোজ্য। 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে' অথবা 'তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে' এই উক্তির প্রোজ্ অর্ডারের মধ্যে যদি এ চিত্রকল্পগুলি স্থাপিত হয়, তাহলে তা সেই দশা পাবে, একটা গোলাপের পাপড়িগুলো খুলে সাজিয়ে তাকেই সেই গোলাপ বলতে গেলে যা হয়। 'পুনশ্চে' চিত্রকল্প কবিতার গদ্যছন্দে অবশ্যই আর পূর্বতন পর্যায়ের শক্তি-সংহতির

ধারাধরণ রক্ষা করবে না। লক্ষ্মীর আমি মান রক্ষা করবার কথা বলছি না। আমি ধারাধরণ রক্ষা করার কথা বলছি, আমি চিত্রকল্পের পূর্বতন ভাব প্রকৃতি রক্ষা করার কথা বলছি। 'পুনশ্চ' পর্যায়ে কবির প্রধান অভিষ্ট ছিল কাব্যের কথক চরিত্রটিকে পূর্বতন কবিতার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে এনে তাকে বন্ধুমণ্ডলীর সম্মুখীন করে দেওয়া। সে বন্ধুমণ্ডলী আধুনিক নাগরিক-সজ্জন। এবং সে আলাপনের ভাষাও অন্তরঙ্গ সামাজিক আলাপনের ভাষা। এ ভাষা চিত্রকল্পকে দাবী করে না। "বাঁশি" এবং "শিশুতীর্থ" 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আছে বটে কিন্তু তা যে 'পুনশ্চে'র নিজস্ব অভিজ্ঞানযুক্ত কবিতা নয়— তা যে প্রকৃত প্রস্তাবে 'পরিশেষ' পর্বের শেষ দান সে কথা আমি আগে বলেছি।

'পুনশ্চে' একাধিকবার যে প্রসঙ্গটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল জল বা নদী। "কোপাই" কবিতাটিতে জলের উপমান স্বাভাবিক। কিন্তু কবি যখন "খোয়াই" লিখতে গিয়েও বলেন, 'ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়' অথবা 'পাথরের উপর নির্ঝরের মতো আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল অনেক বৎসর', তখন বলতেই হয় কবি তাঁর নতুন ছন্দের সঙ্গে জলের একটা আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি যখন "সুন্দর" কবিতায় বলেন 'বর্তমানের নোঙর ছেঁড়া ভেসে যাওয়া এই দিন' অথবা "বিশ্বশোক" কবিতায় বলেন 'দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে শাখা প্রশাখায়' তখনও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আর এমনিতে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে নটীর চিত্রকল্পটি একাধিকবার ভেসে এসেছে। যদিও তিনি তাঁর একটি পত্রে গদ্যকাব্যের পক্ষ সমর্থনে বলেছেন, 'সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র।' তথাপি দেখা যায় নাচের জগৎ থেকে তিনি বারবার ভেহিক্‌ল সংগ্রহ করেছেন :

(ক) ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা। দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে। উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে। (কোপাই) (খ) যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে, । আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে, (ঐ) (গ) তবু ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে, । যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে (নাটক) (ঘ) তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে, । নটীর কঙ্কণে আলোর মতো। (বাসা)।

লক্ষণীয় যে, এগুলির অধিকাংশই নাচের ব্যাকরণ মেনে চলার চিত্রকল্প

নয়— তারা নাচের কঠিন অনুশাসন ভেঙে ফেলছে— একথাটাই তাদের বেশী করে বলার কথা। 'পুনশ্চ' বা 'শেষসপ্তকে', কবিতা যেখানে চিত্রকল্পের গুচ্ছ সৃষ্টি করতে গেছে সেখানেই কবিকে হাত পাততে হয়েছে তাঁর পূর্বতন স্মৃতির ভাণ্ডারের কাছে। আরো লক্ষ করার বিষয়, 'পুনশ্চ' পর্যায়ে কণ্ঠস্বরের ভূমিকা পরিবর্তনের জন্যই চিত্রকল্পের ব্যবহার জরুরী হয়ে উঠল না। বিষয়টি বিস্তারিত করে বলার জন্য 'লিপিকা' ও 'পুনশ্চ' থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করি :

> এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল ?
>
> অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা। জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।
>
> এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকা ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।
>
> (লিপিকা)

এবং এই সঙ্গে স্মরণ করি :

> আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ, | নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে | আকাশের ওপার থেকে—।

তারপরে ?

> তার পরে রইবে উত্তর দিকে | ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা, | দক্ষিণদিকে চাষের খেত, | পূর্ব দিকের মাঠ চরবে গোরু | রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে | গ্রামের লোক যাবে হাট করতে। | পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে | আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা। (খোয়াই : পুনশ্চ)

'পুনশ্চ' থেকে উদ্ধৃত অংশে কণ্ঠস্বরটি একজন কর্মীর। সে কণ্ঠস্বরে গাঢ় হয়েছে সেই কর্মীর প্রসন্ন জীবনস্মৃতি। 'লিপিকা' থেকে উদ্ধৃত অংশটিতে যাঁর কণ্ঠস্বর তিনি একজন কবি। দুটি কণ্ঠস্বরের পার্থক্য সহজেই অনুধাবনীয়। 'লিপিকা' অংশে গদ্যেও রয়েছে কবিসম্ভব আবেগের টান ও দোলা। 'পুনশ্চ' অংশে সে আবেগের দোলা ও টান তত আবশ্যিক হয়নি। 'লিপিকা' অংশে চিত্রকল্প তাই পূর্বতন কাব্যভাণ্ডার থেকে গৃহীত হতে বাধেনি। 'পুনশ্চ' পর্যায়ে কর্মীর কণ্ঠস্বরে লেগেছে প্রসন্ন সামাজিকের সংযত মননের দীপ্তি। আবেগ সেখানে গদ্য কবিতার অতিছন্দ স্বেচ্ছাচারে মাত্রাহারা না হয়ে পড়ে— এদিকে

কবির ছিল প্রখর দৃষ্টি। সেই বোধ থেকেই চিত্রকল্প এখানে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। আমি বলেছি 'পুনশ্চ' পর্যায়ে আবেগের দোলা ও টান তত আবশ্যিক হয়নি। কারণ 'পুনশ্চ' পর্যায়ে প্রধান হয়ে উঠেছিল কবির নিঃসঙ্গ দেখার সাধনা। যদিও একথাটি কবির 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কথা— 'আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসঙ্গ দেখিব তারে আমি',— তবু 'পুনশ্চ' থেকেই আমির আবরণ ভেদের সাধনা হয়েছিল গাঢ়তর, গূঢ়তর। তাই 'পুনশ্চে'র কাব্যরহস্যের ঠিকানা নেই তার চিত্রকল্পের মধ্যে। সে ঠিকানা রয়েছে বরঞ্চ উপমা আর বক্তব্যের লতাপুষ্প সম্বন্ধে; 'বৈকল্পিক বিন্যাসে' গঠিত হয় যে প্রতিসাম্য তার মধ্যে। উদ্ধৃত অংশে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের বর্ণনাতেই যে সে প্রতিসাম্য গঠিত হয়েছে তাই নয়, লালমাটি, নীলমেঘ, চষামাটির ধূসরতার সন্নিপাতে গড়ে ওঠে এক রূপকল্পনা— তা কিন্তু চিত্রকল্প নয়।

কিন্তু তার মানে এ' নয় যে, 'পুনশ্চ' পর্যায়ে কোনো মৌলিক চিত্রকল্প নেই। 'মাঝে মাঝে মর্চে ধরা কালো মাটি মহিষাসুরের মুণ্ড যেন' (খোয়াই), অথবা 'আমার বিশ্বের শেষ রেখাতে যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল' (একজন লোক), 'কম্বলচাপা হাঁপিয়ে ওঠা রাত' (ঐ) প্রভৃতি চিত্রকল্প এ কথাই প্রমাণ করে যে অনাত্মীয় উপাদান নিয়ে চিত্রকল্প রচনার নিঃসঙ্কোচ মানসিকতা এবং নিঃসঙ্গ দৃষ্টি 'পুনশ্চ' পর্যায়েও সক্রিয় ছিল। 'শেষসপ্তক'-এর "পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ" কবিতাটিতে মোহন সর্দারের চিত্রটিতেও কবিতার ক্ষেত্রে অনুরূপ অনাত্মীয় জগতের আভাস বয়ে আনে। হয়তো কবির ছবির জগতেই তার প্রকৃত ঠিকানা। 'একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি | দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো | পথের বাঁ ধারটিতে জমেছে ছায়া'—এ চিত্রকল্পটি প্রসঙ্গেও এই কথাটি প্রযোজ্য।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, সেই রবীন্দ্রনাথ যখন ছন্দোবদ্ধ মিলনান্ত পংক্তি-সজ্জাকে পুনরায় মেনে নিলেন তখন তাঁর চিত্রকল্পও আবার পুরাতন মন্ত্রশক্তি ফিরে পেল। একটু আগে আমরা 'পুনশ্চ' থেকে এমন একটি চিত্রকল্পের উদাহরণ দিয়েছি যেখানে নিশ্বাস চেপে ধরা কম্বলের ভেহিকল ব্যবহৃত হয়েছে। 'আকাশপ্রদীপ'-এ "ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালে বিলে" কবিতাটিতে সেই উপাদানই কত শক্তিমান হয়ে ওঠে তা লক্ষণীয় :—

> জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে, | ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে, | রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে— | ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।

এই কবিতাটি নিজেই যে অসামান্য সেকথা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। ছড়ার অনুষঙ্গে একটা হারানো যুগের সঙ্গে আজকের বিশ্বাসহারা আধুনিক যুগের ঠোকাঠুকির ফলে রসের পেয়ালা উছলে পড়েছে। প্রারম্ভিক চিত্রকল্পই প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকল্পের শেষ আলোক এবার ছড়িয়ে দিচ্ছেন :

> পাকুড়তলির মাঠে | বামুনমারা দিঘির ঘাটে | আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা | ঠিক দুক্কুরবেলা | বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে | ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে | হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।

এই এক চিত্রকল্পেই আবহমানকাল আলোকিত হয়ে ওঠে। আসর এইভাবে জমিয়ে নিয়ে তারপরে কবি যখন বলেন, 'তপ্তহাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে | ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে', তখনই কবিতাটির মূলভাব মূর্তি পরিগ্রহ করে। বেশ বোঝা যায় যে, ভাববস্তুর পুরাতন বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আর শান্তি পাবেন না। তাঁর চিত্রকল্পসৃজনের ক্ষমতা সেখানে অভ্যাসিকতায় ম্লান। 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের "যক্ষ" কবিতাটি তার নিদর্শন।

কবি যখন পৌঁছোলেন 'আরোগ্য' ও 'রোগশয্যায়' কাব্যপর্যায়ে তখন তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে নিজের আমিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বসংসারকে অনাসক্ত চিত্তে দেখার সাধনা। তাঁর এই দেখা কতখানি সার্থক হয়েছিল তার একটা প্রমাণ তার পূর্বেই পাওয়া গেল 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায়। এই কবিতাটি একটু পৃথকভাবে আলোচনা করার জন্য পড়ার প্রয়োজন আছে :

> জানি দিন অবসান হবে, | জানি তবু কিছু বাকি রবে। | রজনীতে ঘুমহারা পাখি | এক সুরে গাহিবে একাকী— | যে শুনিবে, যে রহিবে জাগি | সে জানিবে, তারি নীড়হারা | স্বপন খুঁজিছে সেই তারা | যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগি। | কিছু পরে করে যাবে চুপ | ছায়াঘন স্বপনের রূপ | ঝরে যাবে আকাশকুসুম, | তখন কূজনহীন ঘুম | এক হবে রাত্রির সাথে। | যে গান স্বপনে নিল বাসা | তার ক্ষীণ গুঞ্জন-ভাষা | শেষ হবে সব-শেষ রাতে।

মনে পড়ে আর একটি কবিতা। সে কবিতাটিও আরেকটি কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। কাব্যগ্রন্থটি 'নবজাতক'। বাংলা সন তেরশ সাতচল্লিশের বৈশাখে বেরুল 'নবজাতক'। শ্রাবণে ছাপা হল 'সানাই'। 'নবজাতকে'র শেষ কবিতা "শেষকথা"। 'সানাই'-এর শেষ কবিতা "অবসান"।

স্বতঃই নজরে পড়ে যাকে আমরা চিত্রকল্প বা ইমেজ বলি তা এখানে প্রকাশ্যে নেই। যদি থাকেও তবে তা এখানে একান্তই সংগুপ্ত বা 'হিড্‌ন্'। 'ছায়া-ঘন স্বপন' প্রভৃতি মৃদু বর্ণনার মাঝে মাঝে কখনো সখনো চিত্রকল্পের দু-একটা পাপড়ি ধরা পড়ে বটে, কিন্তু কবিতাটি প্রকৃত প্রস্তাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি অনুমানাত্মক বিবৃতির উপর। কী হয়েছে তা নয়, কী হতে পারে সেটাই এখানে বলবার কথা। সুতরাং ভবিষ্যৎ-কালবাচক ক্রিয়াপদ এখানে শান্ত গাম্ভীর্যে ব্যবহৃত হল। এমনভাবে 'জানি' শব্দটি প্রথমে বসানো হয়েছে যে ভবিষ্যৎ-কালবাচক ক্রিয়া একটা অনিবার্য ভবিতব্যের রূপ পেয়েছে। অনুমান হয় দুটি বইয়ের শেষ কবিতার বেলায় কবি ভেবেছিলেন আসন্ন সমাপ্তির কথা। "শেষকথা" আর "অবসান" এই নাম দুটি যেন শেষের রঙকে ধরিয়ে দিতে চায়। আমাদের বর্তমান ক্ষুদ্র আলোচনার লক্ষ্য "অবসান" কবিতাটির নিবিষ্ট পাঠ।

প্রথমেই লক্ষণীয় সাড়ে তিন মাস আগে লেখা "শেষকথা" কবিতাটিতে কবি যেন সামনে কাউকে রেখে কথা বলছেন। তিনি যে সেখানে সংলাপের বশবর্তী তা বেশ বোঝা যায়। সে সংলাপ কিন্তু দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে নয়—নিজেরই গোপন অন্তরতর সত্তার সঙ্গে সে আলাপ। তাকে সম্বোধন করে শান্ত অনুচ্চ কণ্ঠে এ হিসাব-নিকাশের প্রস্তাবনা—'কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে'। এই "শেষকথা"য় কবি যে চিন্তা করছেন তাও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছেন—'মনে-মনে ভাবি তাই'। শেষ কথা বটে, কিন্তু কথার শেষ নয়, আশারও শেষ নয়। তখনও এ ভাবনা মনের মধ্যে জাল বুনছে—'বিচ্ছেদের দূরদিগন্তের ভূমিকায়। পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্ত রবিরশ্মির রেখায়'। তখনও এ আশা দুর্মর, আজকের মুছে ফেলা চিত্রপটে আবার নূতন রঙে ছবি আঁকা শুরু কি কোনো দিন হবে ?

"অবসান" কিন্তু এর থেকে গাঢ়তর কবিতা। এ একান্তভাবেই আত্মগত। "শেষকথা" যদি হয়ে থাকে মুখর ভাষণ, "অবসান" তবে নিঃসন্দেহে মৌন *চিন্তা। "শেষকথা"য় 'আমি' প্রবল না হলেও প্রকট। "অবসান"-এ প্রথম দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে 'আমি' নিজেকে জানান দিয়েই নেপথ্যে সরে গেছে।* "শেষকথা"-য় ভাবনা পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে রয়েছে—তা দানা বাঁধে নি তা নয়, ঝিছরির মতো দানা বেঁধেছে। "অবসান" কবিতায় 'ভাবছি যে' একথা আগের কবিতার মতো ('মনে মনে ভাবি তাই') খুলে বলার দরকার নেই। গোটা কবিতায় ভাবনা একটি ছোটো ঘটনার ভিতর দিয়ে নিটোল স্ফটিক দীপ্তি ঘটনাই সেখানে ভাববার রূপ ধরেছে। প্রারম্ভেই দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে

'তবু কিছু বাকি রবে'— 'তবু' আত্যন্তিক অবসানের পর এক নিবু-নিবু প্রদীপ। এই ক্ষীণ আলোয় আমাদের যা-কিছু দেখার দেখে নিতে হবে। দিনের মুখর কর্মকাণ্ডের পরে রাত্রির নীরবতায় শুধু একটি ঘুমহারা পাখির গান— কী গান, কেমন গান সে কথা বলা নেই। কিন্তু তার চেয়ে গূঢ় কথার আভাস দেওয়া হল। যে জেগে থাকবে সে সেই গানের একটা মানে খুঁজে পাবে। সুতরাং এখন থেকে গানটি আর নিসর্গের অংশ নয়— শ্রোতার — যে শ্রোতার দিন সারা হয়েছে, অথচ আর সকলের মতো যে মনের দিক থেকে ঘুমিয়ে-পড়া মানুষ নয়, যার খোঁজার পালা তখনও অনিঃশেষ, সে সেই গানের মধ্যে নিজের অন্বেষাপরায়ণ সত্তার, হয়তো বা অস্তিত্বেরও ঠিকানা খুঁজে পাবে। পাখির এক সুরের একলা গান শুনতে শুনতে শ্রোতা ব্যক্তিটির মনে হল— তার স্বপ্ন পাখির গানের শব্দমূর্তি ধরেছে। সে স্বপ্নের বিশেষণ দেওয়া হয়েছে 'নীড়হারা'। সেও বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে ঐ পাখির মতো। সেও নিঃসঙ্গ। দূর আকাশের তারায় কবির বিবাগী প্রাণের শেষ ঠিকানা। গানের মতো কবির স্বপ্ন সেই ঠিকানা খুঁজে ফিরছে।

এইবার গান আর 'ছায়াঘন স্বপনের রূপ' এক হয়ে গেল। 'তবু' এই অব্যয়টি কবিতাটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে যে নিবু-নিবু প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল, তাও এবার নিঃশেষে নির্বাপিত হবে। 'কিছু পরে করে যাবে চুপ/ছায়াঘন স্বপনের রূপ'। 'আকাশকুসুম' বলতে আগের অংশে ধৃত নক্ষত্র-অন্বেষার কথা বলা হয়েছে। তখন আর শব্দ বা স্পর্শের কোনো জগতই থাকবে না। কূজনহীন ঘুম আর রাত্রির যবনিকা তখন একাকার। যে-আকুলতা ছিল সারা দিনের সঙ্গী, তা আকাশকুসুমের মতোই হারিয়ে যাবে। পাখির গান আর কবির নীড়হারা স্বপনের ঘুরে বেড়ানো একসঙ্গে থেমে যাবে। সব-শেষের রাতে সব-কিছুই শেষ হয়ে যাবে। পাখি বাসা খুঁজছিল। বাসা শুধু বাসস্থানই নয়, পাখির অভিজ্ঞানও বটে। অনিকেত সত্তা এমন করেই খুঁজে ফেরে নিজেকে। কবির কাছে পাখির গান হয়ে ওঠে নিজের শিল্পময় সত্তার প্রতিরূপ, তা এক হিসাবে, সেই নিজেকে খুঁজে ফেরারই স্বপ্ন। 'যে গান স্বপনে নিল বাসা'—আকৃতিময় স্বপ্ন আর নৈসর্গিক পাখির গান শেষ পর্যন্ত এক হয়ে মিলিয়ে গেল। তখন থাকবে শুধু ব্যক্তিনিরপেক্ষ জগৎ-ব্যাপার। রাত্রির নিঃশব্দ কালো পর্দা।

আমার মনে পড়ে এমিলি ডিকিন্‌সনের সেই কবিতাটি, যার প্রথম উক্তিটি এই— 'অ্যাট্ হাফ্ পাস্ট্ থ্রি, এ সিঙ্গল্ বার্ড আন্টু এ সাইলেন্ট স্কাই'। সাড়ে

তিনটের যে পাখির ডাক একরকম, তা সাড়ে চারটের আর একরকম। সাড়ে সাতটার তা ফুরিয়ে গেল! থাকল শুধু আলোকময় বিশালতা, যার অপর নাম 'স্পেস্'। ঘটনা-বস্তুই সেখানে চিন্তা-প্রতীক। "অবসান" কবিতাতেও পাখির একলা গান হয়ে গেল কবির স্বপন। স্বপন আর পাখির গান দুইই দিনশেষে রাত্রির আঁধারে নীড়হারা। কিছু পরে আর তাও থাকল না। থাকবে শুধু নিরপেক্ষ উদাসীন স্পেস্। সমাসন্ন যবনিকার নিচে একটা মহানিষ্ক্রিয়তার মনোভাব নিয়ে কবিতাটির শুরু—সমাপ্তিতে তা আরো ঘন হয়ে উঠল। সমাপ্তির জন্ত খেদ নেই, সে কারণেই কোনো আশ্বাসবাক্য নেই, সান্ত্বনাবাক্য নেই।

'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থে এবং 'আরোগ্যে' আলোক এবং অন্ধকারের স্বপ্নময় চিত্রকল্পটি অনেকবার ফুটে উঠেছে। 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা সকালে লেখা। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা বিকালে লেখা। দুটি কাব্যগ্রন্থেই কিন্তু বারবার আলো অন্ধকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস। সেই প্রয়াসের একটি অসামান্ত চিত্রকল্প :

> চাঁদেরমুকুট পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা। রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

কিন্তু 'আরোগ্য' পর্যায়ে এই সব চিত্রকল্পকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে উঠছে অনন্ত শূন্তের ইঙ্গিত। মন্দিরের চুড়া, গাছ, অরণ্যের উর্ধ্ববাহু, সমস্তই যেন শেষ বন্ধনমুক্তির ইঙ্গিত।

সান্ধ্যরবিচ্ছায়া ও দুজন আধুনিক কবি

কবিতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শব্দের আভিধানিক অর্থ যুগে যুগে, পাত্রে পাত্রে সমান থাকলেও, প্রধান কবিদের হাতে তার অনুষঙ্গের হেরফের ঘটেছে বারে বারে। হাতের কাছে এর অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'রক্ত' শব্দের অনুষঙ্গ আর নজরুলের 'রক্ত' শব্দের অনুষঙ্গ এক নয়। দূরের উদাহরণ ইংরেজি 'লিলি'। মধ্য ভিক্টোরীয় যুগে যা ছিল শুভ্র সারল্যের স্মৃতিবহ, প্রি-র‍্যাফেলাইট্‌দের হাতে তা-ই হল নীরক্ততার প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের 'নদী' আর জীবনানন্দের 'নদী' এক অর্থের আকাশ নিয়ে আসে না। এর নানা কারণের মধ্যে অন্যতম একটি বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। যে-কোনো বড়ো কবির স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বকে ঠিকমত বুঝে নেবার একটা বিশেষ পন্থা হল সেই কবির সময়-চেতনাকে ঠিকমত চিনে নেওয়া। সময়ের জটিলতাকে কবি কোন্ দ্বান্দ্বিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করেন সেটাই এ প্রসঙ্গে আমাদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। 'মৃত্যু' এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে তিনবার তিনরকমের অনুষঙ্গ বয়ে এনেছে। এটা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চেতনার পরিবর্তনের ফল নয়, কবির সময় চেতনারও বিশিষ্ট সাক্ষ্য বটে।

সময়ই কবির মৃত্যু-চেতনার পরিমাপক। সুতরাং জীবনচেতনারও পরিমাপক সময়। সময়কে অনন্তের সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন বলেই প্রাচীন ভারতীয়েরা ট্র্যাজেডি লিখলেন না। খণ্ডকালকে আত্যন্তিক বেদনায় এবং বিক্রমে গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি অমরত্ব পেল। সময় সম্বন্ধে এই বোধ যদি পৃথিবীর কোনো দেশে আজও অগৃহীত থাকে, পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির আবেদনে সে সম্যক সাড়া দিতে পারবে না। সময়-চেতনার প্রভেদ কেমনভাবে একই কালে পরিবর্ধিত দুই কবির জীবন-মৃত্যু-চেতনায় পার্থক্য সৃষ্টি করে রিল্‌কে ও রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ। ডুয়িনো এলেজি'র (১৯১৩) ভাষ্য উপলক্ষে রিল্‌কে বলেছিলেন যে, এলেজিগুলিতে জীবন ও মৃত্যুকে অভিন্ন স্বীকৃতি

দেওয়া হয়েছে। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা মেনে নিলে সেই সীমাবদ্ধতায় প্রবেশ করতে হয়, যার মধ্যে আছে সমস্ত অনন্তকে পরিবর্জন। মৃত্যু জীবনের সেই অংশটা যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। রিল্‌কে বলেছেন, আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণচেতনা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে—which is the same in two unseparated realms ; ইহলোক বলে কিছু নেই, পরলোক বলে কিছু নেই। যা আছে তা এক পরম ঐক্য—great unity। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চেতনা রিল্‌কে থেকে পৃথক। 'বলাকা' (১৯১৭) পর্বেই তাঁর মৃত্যু-চেতনা পরিণতি পেয়েছে। 'বলাকা' কাব্যে কবিতার সংখ্যা ৪৫, আর 'মৃত্যু' বা 'মরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩০ বার। এ মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন অমৃতময় জীবনকে আত্মীকরণের একটা পন্থা রূপে। মৃত্যুকে পার হয়ে লাভ করতে হবে অমৃত, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সামাজিক মানুষের হয়ে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বলাকা'য়।[১] 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বললেন নিজের পক্ষ থেকে আরেক কথা। "কঙ্কাল" কবিতাটির মূল কথা আমরা এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি— 'আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবনমৃত্যুরে / লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে'। রিল্‌কে জেনেছিলেন— there is neither here, nor a beyond but the great unity, in which those creatures who surpass us, the angels are at home। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে কোনো দেবদূত বা ঈশ্বরের কথা বললেন না। 'বলাকা'য় মৃত্যুর বিজয়ী প্রতিযোগী 'অমৃত'। 'পূরবী' থেকে মৃত্যুর বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী 'সুন্দর'। তাঁর 'সুন্দর' জীবন-মৃত্যু-নিরপেক্ষ চিরন্তনত্বের কথা বলে। সঙ্কটাতুর য়ুরোপে রিল্‌কে জানতে চেয়েছিলেন এই জড় বিশ্বে মানুষের ঠিকানা। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে গেলেন এক পরম পূর্ণকে— যার মধ্যে নশ্বর ও শাশ্বত, জীবন ও মৃত্যু 'অবিচ্ছেদ্য এক অঞ্চল' -রূপে চিরবিদ্যমান। সেই বিশ্বসংকটেরই মধ্যে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভারতীয় ধ্রুবত্বের কথা বলেছেন, বলেছেন 'চিরন্তন এক'-এর কথা। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল 'হে মহাজীবন, হে মহা-মরণ, লইনু শরণ লইনু শরণ'। তাঁর কাছে মৃত্যু জীবনের মাত্রা। এই মৃত্যু-মাত্রিক জীবন-ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ অনন্তের মুক্তছন্দে রূপায়িত করে বুঝে নিতে

১. এর পূর্বে 'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের "আত্মার প্রকাশ"-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে'। ঐ প্রবন্ধেই তিনি আরো বলেন যে, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। এটাই কি সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির বোঝা পড়ার প্রশ্ন নয়? বিশেষ আমরা যখন বঙ্গভঙ্গের যুগের সামগ্রিক পটভূমিকায় ব্যাপারটি চিন্তা করি?

গিয়েছিলেন। 'এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা'— তাই শুধু জন্মদিনের প্রাসঙ্গিক উক্তি মাত্র নয়।

দুই

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, কিংবা বলা ভালো, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভ থেকেই সময় দ্রুতলয় হয়ে ওঠে। সেই জটিল দ্রুতলয়ের ফলে বস্তুবিশ্বের প্রতি অধিকতর মনোযোগের দাবি প্রবলতা পেল, ডাক এল অবচেতনের গভীরে অবতরণের জন্য, আহ্বান অনুভূত হল স্বপ্নলোকের মতো অসংলগ্ন তৎকালীন নানা বিপরীতের মালা গাঁথার—এবং এ-সবই ছিল সেই সময়কে অঙ্গীকারের লক্ষণ। ফর্মের ভাঙাচোরা এই সাক্ষ্যই দেয় যে, রবীন্দ্রনাথ এবং তরুণ কবিরা সকলেই এক নূতন সময়-চেতনার— সুতরাং নূতন জীবন-মৃত্যু-বোধের— অন্তর্বর্তী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে নিজেও অনুভব করেছিলেন এই জটিল উদ্‌ভ্রান্ত সময়ের চাপ, তার প্রমাণ রয়েছে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত দুখানি পত্রে। ১৯৩৬ সালে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছিলেন— 'ক্ষণিকায় আমি ত্রিশবছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে।' ১৯৩৯ সালে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকেই তিনি আবার লেখেন— 'বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তার মূল্যের আদর্শ। ঐতিহাসিক এক একটা অপঘাতে সাহিত্য-সেতারের কানে মোচড় লাগায়।'[২] ঐ চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এতদিনের স্থির পৃথিবীটা 'ভূমিকম্পের পৃথিবী হয়ে উঠেছে— মনোলোকের অবচেতন স্তরে যে আগুন চাপা ছিল সে হয়েছে চঞ্চল—। 'সাজানো কিছুর উপরে শ্রদ্ধা নেই—।' কিন্তু তাই বলে চির অশ্রান্ত শিল্পী রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদপসরণ করেন নি ঐ পরিবর্তমান বস্তুজগতের প্রাধান্য বিস্তারের সামনে। বরঞ্চ তিনের দশকে দেখা গেল প্রখর আত্মসচেতনতায় ও বস্তুজ্ঞানে তিনি আয়ত্ত করলেন নব নব ফর্ম-এর জটিল দুরারোহ শৃঙ্গ। ছবি, নৃত্যনাট্য, গদ্যছন্দের কাব্য তাঁর শৈল্পিক অক্লান্ততার নিদর্শন। অবচেতনের রহস্যঘন আলো-আঁধার তাঁর তখনকার কবিতার চিত্রকল্পে, ছবিতে এবং 'শ্যামা' ও 'চিত্রাঙ্গদা'-র মতো নৃত্যনাট্যে প্রকাশ পেয়েছে।

---

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, পৃ ৮৮ ও ২২৪

অমিয় চক্রবর্তী সেই-সব আধুনিক কবিদের অন্যতম, যাঁরা শান্ত্যরবিচ্ছায়ার আকাশ পটে দেখা দিয়েছেন, এবং রবি-কিরণে স্নাত হতে হতেই নিজ দীপ্তিকে গাঢ় করে তোলার শক্তি ও পটভূমি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর কনিষ্ঠ সহযাত্রী হিসাবেই অমিয় চক্রবর্তী জেনেছিলেন—

ক· কবিতার জগৎ ও গদ্যের জগতের মাঝখানের দরজাটি খুলে দিতে হবে ;

খ· মৃত্যু ও বিনষ্টির মধ্যে থেকেও যথাসম্ভব তার দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকতে হবে ;

গ· রূপের জগতের কথা বলতে বলতেই আভাস দিতে হবে অধরা অরূপের। রূপ-বিরূপের অচ্ছেদ্য অখণ্ডতা তন্ময় দৃষ্টিতে ধরে নিতে হবে।

কোনো কবির ভূমিকাই সরলীকৃত ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হতে পারে না। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য সাধনারও কোনো 'সরল-কথা' সম্ভব নয়। পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত বৈশিষ্ট্য-সূত্র তিনটির সাহায্যে আমরা শুধু তাঁর কাব্যের চারপাশটা জরিপ করতে পারি। প্রকৃত কবির দেখা পাওয়া যাবে একমাত্র তাঁর কবিতার মধ্যে। অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা-গ্রন্থ 'খসড়া' বিষয়ে ও প্রকাশে নূতন দিগন্তের উন্মোচক। কথ্য স্রোতের টানকে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিত করে— পরিদৃশ্যমান সংসার-ছবিকে পৃথক তুলির টানে এঁকে দিয়ে এই কবি তখন জীবনকেই বুঝতে চেয়েছেন তার নিহিত এবং প্রকাশিত রূপের সমগ্রতায়। দৃশ্য 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। কবির কৃতিত্ব সেই দৃশ্যকে চরিত্রবান করে তোলায়। বুদ্ধদেব বসু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা আলোচনায় বলেছিলেন কবির 'প্রকৃতি বর্ণনাও পাথরের উপর খোদাই করা কাজের মতো গভীর ও সাকার'[৩]। কিন্তু আমাদের মনে হয় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ভাস্কর্য প্রতিমা অপেক্ষা চিত্রল বর্ণাভার প্রাধান্য বেশি। তাঁর "সমুদ্র" কবিতাটিকে এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনার জন্য নিতে পারি। এই কবিতায় বর্ণিত সমুদ্রে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন এক বিরাট অন্তহীন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত— 'সমুদ্রের নীল কারখানা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চাকা উঠছে পড়ছে, পৃথিবীকে বানিয়ে তোলবার মজুরি চলছে দিনরাত্রি'[৪]। 'সমুদ্রের ভিতর পৃথিবী রচিত হচ্ছে'— এ অনুভূতির ইঙ্গিত বাঙালি কবির পাবার কথা হয়তো রবীন্দ্রনাথেরই "সমুদ্রের প্রতি" কবিতা থেকে। 'পূরবী'-র "সমুদ্র" কবিতাতেও

৩. 'কবিতা,' পৌষ ১৩৪৪।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, পৃ ৩৭১।

সমুদ্র কল্পিত হয়েছে এক তরল রঙ্গশালার চিত্রকল্পে। এই ইঙ্গিত দুটি স্মরণে রেখেই অমিয় চক্রবর্তীর সমুদ্র ধারণ করেছে এক আধুনিক কর্মশালার রূপক। সমুদ্র দেখলেই আধুনিক কবির 'অশ্রান্ত বিরহী'-র কথা মনে পড়া উচিত নয়—বুদ্ধদেব বসুর এই কটাক্ষ অন্য রোমান্টিক কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের বেলায় খাটে না। যদি আমরা অমিয় চক্রবর্তীর সমুদ্র-বর্ণনার এই অংশের :

> 'নীল কল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে-পড়া। শব্দের ভিড়ে
> পুরনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।'
> নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
> বালি বানায়, গ্রাস করে মাটি, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে
> দ্বীপ ভাঙে ;…
>
> "সমুদ্র", 'খসড়া'।

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' গ্রন্থের "সমুদ্র" কবিতার এই অংশের ভাবচ্ছবির তুলনা করি :

> কত মহাদ্বীপ মহাবন
> এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
> দেখা দিয়ে কিছুকাল ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
> নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
> মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
> হানিছে তরঙ্গ তব।

তা হলে আমাদের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় যে, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনাগতির মধ্যেও আছে এক চিরকালীন আধুনিকতা। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তী, আলোচ্য কবিতায় অন্তত, অভিনব, হবার জন্য পণবদ্ধ। এইভাবে সংকল্প-সম্বদ্ধ হবার জন্য আগ্রহ সেদিনের আধুনিক কবিতারই চারিত্র্য। অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দোরীতি, সুধীন্দ্রনাথের শব্দ-সন্ধান আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। রবীন্দ্রনাথের শব্দপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথের জগতের আবহাওয়া ও অনুষঙ্গকে বহন করে। তাঁর ছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে

ঘটে 'পুনশ্চ' পর্যায়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শব্দের অনুষঙ্গ পালটায় নি। এদিকে তিরিশের যুগে নূতন কবিদের জীবন-মৃত্যু-চেতনা যখন সময়ের তাগিদে বদলাতে শুরু করল, তখনই তাঁরা নূতন অর্থানুষঙ্গে, নূতন ভাবানুষঙ্গে শব্দের পুনর্জন্ম দাবি করলেন। ছন্দের নবায়ন (অমিয় চক্রবর্তী ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়), বাগ্‌বিন্যাসের নূতন 'চাল' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে)— এ সবই এই সময়কে অঙ্গীকরণের ফল। সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়াসের পরিণাম। লক্ষ করার বিষয় বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সব থেকে কম ওঠে অমিয় চক্রবর্তীর বেলায়। তিনি তাঁর ছন্দকে নূতনত্ব দিলেন বক্তব্যকে নূতন স্বর দেবার জন্য। এই নূতন স্বর তাঁর অভিনবত্বের প্রয়াসকে সজীবতা দিয়েছে। তাঁর ভাবনা-পদ্ধতিরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর আঙ্গিক চিন্তায়। বুদ্ধদেব বসুর 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থের আলোচনায়[৫] অমিয় চক্রবর্তী একই সমুদ্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতার এই অংশে :

> সমুদ্র ধূ-ধূ করছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
> যেন চিরকাল এক বিরাট মুহূর্তে প্রসারিত ;

"'যেন' কথাটা বাদ দিলে নির্দেশ বদলাতো কিন্তু জোর কি বাড়ত না?" এই সংশোধনী প্রস্তাব থেকেই বোঝা যায় অমিয় চক্রবর্তীর কাছে অলংকরণ অপেক্ষা তুলির আঁচড় বা টান বেশি মর্যাদা পেত ; ভাষ্যের প্রতি তাঁর ততটা মনোযোগ নেই, যতটা মন চিত্রের প্রতি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ-ভাস্কর্য, বা বিষ্ণু দের কবিতার নাট্যগতি অমিয় চক্রবর্তীর নয়। নাটক অধিগ্রহণ করে কালকে। অমিয় চক্রবর্তীর জগৎ যদিও ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মৃত্যু-আকীর্ণ জগৎ, তবু দেখা যাবে সেই মৃত্যু-আকীর্ণ, সংশয়-সমাকুল, বিনষ্টি-বিধ্বস্ত সময়ের দ্বারা কবি স্পৃষ্ট হয়েছেন কম। তাঁর কবিতায় ধাবমান সময় (time) বা ইতিহাস অপেক্ষা স্থিরদ্যুতি 'স্থান' বা 'দেশ' (space) প্রাধান্য পায়। এই অর্থেই তাঁর কবিতা চিত্রীর কবিতা।

তাঁর চিত্রের, তথা তাঁর কবিতার বিষয় পৃথিবী। পৃথিবীর রূপ ফুটিয়ে তোলা সহজ কথা নয়। তাঁর ভাষাতেই বলি[৬], 'ধরণী সহজ বস্তু নয়, ভ্রাম্যমানকে নীল জলে ভাসায়, দুর্গম পাহাড়ে চড়ায়, খাদ গহ্বরে গিয়ে মাথা ঘোরায়— কবিত্ব নিংড়ে নিতে আঙুলের জোর চাই।' তাই তাঁর কবিতার

৫. 'কবিতা', পৌষ ১৩৪৫।
৬. 'কবিতা', পৌষ ১৩৪৫।

চিত্রপটে বারে বারে রূপায়িত হতে চেয়েছে— বিশ্বরূপ বিশ্বজন আর বিশ্বমন। কবির চোখে দেখা বিশ্বরূপ :

ক. আফগান চূড়, তাম্র ইরানী, কখনো হিমানী
কখনো ধরা,
ঘূর্ণিত ধরা হিন্দুকুশের ;
জয়জয়শ্রী হিমালয় রাজ
ধরণীর ধ্যানী কিরীট ঝলে। "রুদ্রাক্ষর", 'অভিজ্ঞান বসন্ত'।

খ. বন্-বন্ ঘুরচে বিশ্বের লাট্টু,
খাতু'ম সিক্কিম পেরু টিম্‌বাক্‌টু
লেন্তি ব্রহ্মের কোনটা ?
ধক্-ধক্ সূর্যের মনটা। "উদ্ভট", 'মাটির দেয়াল'।

গ. ওপারে বাস্ চলেচে, রাত্রির শহর, কার সময়
অগণ্য ঘরে, দোকানে, দরজায় যায় থামি',
চলে সংসার পথে ঘরে। "সেইপথ", 'একমুঠো'।

ঘ. শান্তি পাবি দেখ চেয়ে ঐ সোনার ক্ষেত ;
স্তূপ-করা ঐ ধানের সোনা
স্তব্ধ মাটির কী সঙ্কেত।
. স্তরে-স্তরে মাটির সবুজ প্রাণ-আগুনে
উর্ধ্বে ওঠে আরেক আলোর মন্ত্র শুনে ;...
"পৃথিবী", 'দূরযানী'।

শান্তিনিকেতন, খোয়াই, ভারতবর্ষের নানা মন্দির, কত পথ-প্রান্তর, ন্যুইয়র্কের ইস্ট রিভার, বে-স্টেট রোড, ওহায়ো, আবার বোধগয়া, উত্তরাপথ হরাপ্পা— বিশ্বপথিক কবি এখানে রবীন্দ্রনাথেরই প্রিয় শিষ্য— তাঁর ঘর কোনো ভৌগোলিক সীমানায় আটকে যায় নি। সে ঘর সব ঠাঁই।

তাই ঘরে ঘরে তাঁর পরমাত্মীয়। পরম মমতায় এবং ভালোবাসায় তিনি এঁকে দেন পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের জীবন-ছবি, সে-মানুষ রাষ্ট্রিক নয়— দেশোত্তর এবং কালোত্তর যে মানবস্বভাব, তাকেই কবি রূপায়িত করেছেন বিশেষ মাটির রঙে :

ক. পোঁটলা বিছানা নিয়ে ভিড় উঠলো
দুপাশে চীনে পাহাড়, চীনে গাছ, অচেনা বাঁকা ছাত-
বাড়িতে আমার আবিষ্ট চোখ,
দণ্ডে চারিয়ে গেছে সহযাত্রী চাষীর স্নিগ্ধতা—এই বৃদ্ধ লোক ॥
"চীনে বুড়ো", 'অভিজ্ঞান বসন্ত'।

খ. যুদ্ধের খবর পৌছলো।
আনলে তুমি বেদনায়
নূতন পৃথিবী চেতনায়
ডান্‌জিগের মেয়ে।
ছবিতে দেখেছি, ওড়া চুল আঁখি ছেয়ে,
কিছুতো জানো না, শিশুমুখে হাসি, স্কুলে যাও দূরদেশে···
"যুদ্ধের খবর", 'একমুঠো'।

গ. না-দাড়ি-কামানো বুড়ো প্রসন্ন রুক্ষ দৃষ্টিপাতে
দেখে সমুদ্রের জল, হঠাৎ জেটির ভিড়ে পশে
মজ্জায় গভীর তারি পরিচয় :
"শ্রীমান শ্রীমতী", 'পারাপার'।

তাঁর কবিতা ছুঁয়ে আসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রটিকে, সেই ছাত্রীটিকে, ছুঁয়ে আসে 'ইতিহাস" কবিতার নেবুরঙা শার্টপরা সেই মানুষটিকে। সে কবিতার মুকুরে ভেসে ওঠে মণিকর্ণিকার বীণাবাদিনী। অথচ দেশ-বিদেশের এত রঙ, এত বিভিন্ন আলোয় আসলে কবি যা ধরতে চেয়েছেন তা হল বিশ্বমন। এই অর্থে অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বমনস্ক আধুনিক কবি। তিনি যে বিশ্বের কথা বলেন সে বিশ্ব আজকের, এই শতাব্দীর— কিন্তু সাম্প্রতিকের ধূলির দাগ তাতে থাকলেও মলিনতাকে তিনি মানেন না। এদিক থেকে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর মিল আছে। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর অমিলটা হল— বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষের মধ্যে যেটুকু চলিষ্ণু সেটুকুকে ধরে নেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রত্যক্ষের মধ্যে যেটুকু স্থির সেটাকে অবলম্বন করেন। বিষ্ণু দে নিজে স্থির, কিন্তু তাঁর আবেগ গতিশীলতা আশ্রয়ী। অমিয় চক্রবর্তী নিজে গতিশীল— আগ্রহ তাঁর স্থির চিত্রে। এই স্থির চিত্রের বিষয় বিশ্বমানসের একটুকরো আধটুকরো প্রতিফলন, কখনো উদ্ভাসন। সে উদ্ভাসনে অর্থের নানা বর্ণ :

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে শাম্পানে জাভানির
প্রলাপীর জল-ছবি অবনীর :
কানে চোখে ঠেকে তবু বুঝি না॥

"প্রতীক্ষা", 'পারাপার'।

পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো দৃশ্য, কোনো মানুষই তাঁর কাছে বিস্ময়ের বস্তু নয়। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" কবিতার সঙ্গে তাঁর বিশ্ববোধের কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" ও "পৃথিবী" কবিতার মধ্যে যে বিশ্ব-বিস্ময় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় তার বদলে আছে এক অন্য ভাব। যা-কিছু বিশ্ব-চিত্র তিনি দেখছেন, তা সবই যেন তাঁর পূর্ব পরিচিত, অন্তত এ কথা সত্য যে, নব পরিচয়ের বিস্ময়কে তিনি কখনো সঞ্চারিত করতে চান নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্ব-পরিক্রমার আর-একটি তফাতও নজরে পড়ে। "সিয়াম" বা "বোরোবুদুর"-জাতীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের সূত্র অনুসরণ করে অতীত-বর্তমানে সেতুবন্ধন-প্রয়াসী। অমিয় চক্রবর্তীর দৃষ্টি ততটা অতীতে নয়, ততটা ভবিষ্যতে নয়—যতটা বর্তমানে। এখানে আবার বিষ্ণু দের সঙ্গে তাঁর অমিল। বিষ্ণু দের স্ব-কালে ত্রিকালের মেলামেশা। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে যেহেতু কাল অপেক্ষা স্থানই প্রধান বিষয়, তাই তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত নন। বর্তমানেরও সেই অংশটায় তাঁর দৃষ্টিপাত, যে অংশ অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি এক চিরন্তনত্বে বিশ্বাসী আধুনিক কবি।

আধুনিক কবি বলেই এক গতিবেগের চলচ্ছন্দ ফুটে উঠেছে অনেকগুলি কবিতায়। প্লেন থেকে, ট্রেন থেকে, মোটর থেকে দেখা ভূ-চিত্র অথবা বিশ্ব-দৃশ্যের কত কত স্ন্যাপ-শট ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। তারও থেকে বড়ো কথা তাঁর কোনো কোনো কবিতায় গতি নিজেই মূর্তি ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি 'দূরযানী' কাব্যগ্রন্থের "শঙ্কর অমৃতের মন্দির" কবিতাটি। বাজার বসতির পথ পেরিয়ে শঙ্কর মন্দিরে পৌঁছানো, পুরোহিতের সঙ্গে গর্ভগৃহে প্রবেশ, ফিরে আসা, ফিরতে ফিরতে আবার মন্দিরের দিকে তাকানো— আর কবিতার প্রতি স্তবকের শেষে ধুয়োর মত শঙ্কর মন্দিরের উল্লেখ— সব মিলিয়ে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মন্ত্রিত হয়েছে গতিবেগ। ব্যাপারটি কবির আরো অনেক কবিতাতেই ধরা পড়ে। এমন-কি, তাঁর হপকিন্স-প্রীতি, স্প্রাং-রিদ্‌ম-এর বাংলায় প্রবর্তনার পিছনেও আছে এই গতিময়

পথিকের দৃষ্টি-মাধুকরী। পঙ্‌ক্তিগুলির কাটা কাটা বাক্য যেন সেই ধাবমানতার ছবি। একক শব্দে সম্পূর্ণ বাক্যে গতির ইশারা :

—থাক্। সম্পূর্ণ অজানা আমি। ঘোরা
অজানা শহরে। দেখতে দাও একবার
হ্যারিসন রোড। স্রোত কোথা গেছে দূর
জাপানী খেলনা, চুড়ি, নিয়ে নতুন হরফে
মার্কা সিগারেট। সদ্য বই। মোড়ে চুপে-চুপে
দিঘির ভিড় ঠেলে যাবো না গলিতে, দরজায়
ধাক্কা দেবনা। দুপুরের তোপ ; একটা।···

"দরজা", 'একমুঠো'।

এই গতিবোধকে নিংড়ে নিয়ে তিনি কখনো কখনো গূঢ় কথাও বলেন— সে গূঢ় ভাষণে হয়তো বা অপার্থিবের ইঙ্গিত, হয়তো এক দার্শনিকতা :

ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ্ণ স্বাদ ফুলের তীর,
ইচ্ছে-ভরা বুনো আঙুর, জামের শাঁস,
ভিতরে কত দ্রুতের ভয়, কখনো বেলা সময়হীন—
বেরিয়ে এলেই নেই।

"বৈদান্তিক", 'পারাপার'।

কিন্তু সেই গূঢ় গভীরতার বাণীতেও লাগে এক দ্রুতগতি পথিকের পথ চলার ছন্দ।

তিন

'এজরা পাউণ্ডের বক্তব্য তিনি কবিতায় একত্র স্পষ্ট বলেন নি, পাথরের নুড়ির মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এলোমেলো মনোময় ছন্দের তলে তলে তা প্রত্যক্ষ দেখা শক্ত নয়। ছবির সঙ্গে গাঁথা হয়ে তাঁর মনের অব্যবহিত ধারণা প্রকাশ পায়, প্রকাণ্ড ধার্মিকতার প্রয়োজন হয় না'।[৭]

হয়তো সব বড়ো কবির সমালোচনাই এমন। অন্ত কবিকৃতির আলোচনা-

৭. অমিয় চক্রবর্তী, "এজরা পাউণ্ড— কবিতার দরবারে পত্রাঘাত", 'কবিতা', পৌষ ১৩৫৫।

কালে দেখা যায়, তিনি আলোচ্য কবির রস গ্রহণের মধ্যে শুরু করেন এক ধরনের আত্মব্যাখ্যা। এজন্য পাউণ্ডের কবিত্বের সেই অংশটিই অমিয় চক্রবর্তীকে আকৃষ্ট করেছে যে অংশের সঙ্গে তিনি খুঁজে পান তাঁর ভাবভঙ্গির আত্মীয়তা। এই জাতীয় আত্মব্যাখ্যা ও বীক্ষণ আমরা রবীন্দ্রনাথে পেয়েছি, এলিয়টে পেয়েছি। বস্তুত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতে কোনো আরোপিত তত্ত্ব নেই, তাঁর কবিতাও কখনো সূত্রভাষ্য নয়। উজ্জ্বল যত অভিজ্ঞতা বা বস্তুখণ্ড তিনি সংগ্রহ করেন, তা দিয়ে তিনি কোনো স্থাপত্য রচনার কথা ভাবেন নি। অথচ তাঁর ছড়ানো নুড়িগুলির মধ্যে কান পেতে থাকলে এক নাতিপ্রচ্ছন্ন জলের স্বর শোনা যায়। সেই জলেরই অন্য নাম চিরবহতা জীবনধারা। জীবনাতীতের সামনে সে জীবনধারা যে প্রশ্ন করতে চায়, ওই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলির মাঝে সে প্রশ্নটিও হারিয়ে যায় না। "লিরিক" (পারাপার) কবিতাটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তির অসামান্য প্রশান্ত প্রশ্নটি আমাদের মনে পড়ে :

> পৃথিবীতে লগ্ন ছিলো এই মিলনের ঘর,
> এসেওছিলাম দুজনে—তারপর ?

রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ব্যস্ত হন নি উত্তরের জন্য, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিচলিত হন নি বিপরীতের তরঙ্গাঘাতে। হাত বাড়ালে পাওয়া যায় এ কথা সত্য হতে এ জগতে বাধা নেই। সব কিছু শেষে মিলিয়ে যায়, একথা জানলেও দুঃখ নেই। 'তার বদলে পেলে'— এ যেমন সত্য, 'বেরিয়ে এলেই নেই'— এও তেমনই সত্য। এ এক অপক্ষপাত নিরাসক্তি, কিন্তু কবির নিরাসক্তি। এর জোরটুকু ছিল বলেই তিনি কোথাও আটকে গেলেন না।

আবার অন্যদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অমিলটুকুও অনুধাবনীয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে যে 'পোড়ো বাড়ি, শূন্যদালান'— তা বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদনের অনুষঙ্গ বয়ে আনে,[৮] অমিয় চক্রবর্তীকে সেই পোড়ো বাড়ির ভাঙা দরজা খুঁজতে পাঠায় ঝোড়ো হাওয়াকে[৯]। রবীন্দ্রনাথের কাছে বস্তু কল্পনার সিঁড়ি, অমিয় চক্রবর্তীর কাছে বিষয় বা বস্তু তাঁর নিজের কালের সচেতনতার ভাষা। ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে তাঁর "চেতন স্যাকরা" কবিতাটির সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের "বাঁশি" কবিতার কিনু গোয়ালার গলিতে যে কান্তবাবু থাকে, তার সঙ্গে চেতন স্যাকরার মিল-অমিল দুই-ই নজরে পড়ে। কান্তবাবু এবং চেতন স্যাকরা দুজনেই শিল্পী। বীভৎস গলিটার

---

৮. 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ২৪-সংখ্যক কবিতার প্রথম স্তবক।

৯. অমিয় চক্রবর্তীর "সঙ্গতি" কবিতা।

সমস্ত কদর্যতা কান্তবাবু মিথ্যে করে উড়িয়ে দিতে পারেন তাঁর কর্নেটে সিন্ধু বারোয়াঁায় তান তুলে। চেতন স্যাকরাও বলে :

> গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
> সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
> ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।

কিনু গোয়ালার গলির সঙ্গে চেতন স্যাকরার গলির বাস্তব সাদৃশ্যটিও লক্ষণীয়। দুঃসহ অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে দুটি কবিতাতেই। রবীন্দ্রনাথ গলির বস্তুরূপ ফুটিয়ে তুলতে কোনো অনুপুঙ্খ বাদ দেন নি। উপমা বা চিত্রকল্পেও তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক কবির বিষম-সমীকরণ-ক্ষমতার প্রমাণ। বাদলের কালো ছায়ার উপমা, বা আপিসের সাজের উপমা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। চেতন স্যাকরার গলিতেও 'ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর আড়ৎ'; 'বন্দী স্যাঁৎসেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা'। তথাপি এই সাদৃশ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যটিও লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের কিনু গোয়ালার গলি নির্মমভাবেই কিনু গোয়ালার গলি। অমিয় চক্রবর্তীর চেতন স্যাকরার গলি যেন অতটা নির্মম হতে রাজি হয় নি। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, গলিটা যতই নির্মম হোক, শেষ পর্যন্ত তো তাঁর হাতে আছেই কান্তবাবু—তাঁর তুরুপের তাস। কান্তবাবুর কর্নেটেই হরিপদ কেরানির অনন্ত গোধূলী লগ্নের স্রষ্টা হয়ে উঠবে। কান্তবাবু গলিটাকে গ্রাহ্যই করেন না। চেতন স্যাকরা কিন্তু গলি সম্বন্ধে, তথা তার বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে, সজাগ। সে গলির জীবনকে সমালোচনা করে। এবং এই সমালোচনার কারণেই চেতন স্যাকরা তার ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ—কান্তবাবু আত্মবিস্মৃত শিল্পী। চেতন স্যাকরা সমাজ-সচেতন ব্যক্তি, কিন্তু শিল্প-সচেতন শিল্পী। অর্থাৎ সে-ও যেন রবীন্দ্রনাথের মতোই বলে ফেলতে পারে—'আমার মনটা হয়তো সোশিয়লিস্ট, আমার কর্মক্ষেত্রে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু উর্বশী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র'[১০]। চেতন স্যাকরা নিজেকে 'উদ্ধত বুড়ো' বলেছে। তার এই ঔদ্ধত্যই তার সচেতনতা, তাও এক শিল্পীর ধর্ম। 'চেতন' নামটির এবং কান্তবাবুর 'কান্ত' নামটির তাৎপর্যও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। দুই কবি যেন ভেবে চিন্তেই তাঁদের দুজন শিল্পীর নাম এমন রেখেছেন।

আধুনিক কবিদের কবিতায় যে তৃতীয় স্বরের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, 'চেতন

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', একাদশ খণ্ড, পৃ ২৯৫।

স্যাকরা' কবিতাটি'র চরিত্রে সেই স্বর এক ব্যক্তিত্ব রচনা করেছে। তাঁর বিখ্যাত কবিতা "বড়োবাবুর কাছে নিবেদন"। এখানেও তৃতীয় স্বরের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এরকম আরো গুটিকতক কবিতার সাক্ষ্যে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর কবিতায় আমরা যে তৃতীয় স্বরের উপস্থিতি অনুভব করি তার একটা স্বরূপ হল তারা সকলে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি, কিন্তু সাধারণ মানুষ। তারা তাদের সাধারণত্বের মধ্যেই ধারণ করে রেখেছে একটি নাতিপ্রচ্ছন্ন অসাধারণত্ব। কী কী কেড়ে নিতে পারবে না, বড়োবাবুর কাছে সেই ফিরিস্তি দেবার সময় যে-কেরানিটি কথা বলে, সে পৃথিবীর সঙ্গে তার অনাহত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন। এইখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। চেতন স্যাকরার মতোই সেও একটা বর্মের অধিকারী। এই বর্মের অপর নাম সহজ মানবিকতা। এই মানবিকতার কারণে রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর কোনো কোনো কাব্য-প্রসঙ্গের মিল-অমিলটাও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় ঊর্ধ্ব'-আকাশের নিঃশব্দ নীলিমার দিকে ইঙ্গিত করে এমন অনুষঙ্গবাহী নানা প্রসঙ্গের সমাবেশ :

> …বৃদ্ধ মহানিম, / নিবিড় গম্ভীর তার অভিজাত্যচ্ছায়া ॥ অরণ্য তাহারি তলে ঊর্ধ্বে বাহু মেলি ॥ দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের-রেখা-আঁকা ॥ দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে / শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া ॥ ঊর্ধ্ব হতে জয়ধ্বনি/ অন্তরে দিগন্ত পথে নামিল তখনি ॥ বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে / ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক্ মৌন পল্লবসম্ভারে ॥ খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার ॥ হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে ॥ যেমন সুন্দর ঐ নক্ষত্রের পথ ॥ শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায় ॥ দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা ॥ সেথা হতে সন্ধ্যাতারা / রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ ॥

ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে ইঙ্গিত এক মহানিঃশব্দতার ইঙ্গিতও বটে। এই-সব প্রসঙ্গগুলির সান্নিধ্যে কেবলই মনে হয় আয়ুপ্রান্তবর্তী কবির সামনে এক মহামৌনের যবনিকা দুলছে। অর্ধশায়িত কবির দৃষ্টি প্রিয় মর্ত্যভূমি থেকে সংহৃত হয়ে নিবদ্ধ হয়েছে বারে বারে সেইখানে— 'সেথা হতে সন্ধ্যাতারা রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ'।

অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার'-পর্যায়ে এমনই নানা প্রসঙ্গের দেখা মেলে, যাতে পাওয়া যায় ঊর্ধ্বের ইঙ্গিত :

ওঙ্কার উঠেছে বাঁকা পাথুরে নিখাদে মুয়েজিন ॥ নয়নীল ছিরের শৃঙ্গে ত্রিশূল ॥ যোড়ো শৃঙ্গে দেওদার ॥ গাছের মর্মরে শান্তি থর থর, পর্বতে উঁচু পথ ॥ লাল নীল বিদ্যুৎ অক্ষরে / রাত্রির শূন্তের শীর্ষে চিহ্নমালা জলে মোছে শুধু ॥ মাথা নাড়ে "জানি" "জানি" ক্যাথলিক গির্জা চূড়া স্থির ॥ ধূসর পাথর, দরজা, মধ্যযুগী আধুনিক চূড়া ॥ উজ্জ্বল আকাশ-চেরা গম্ভীর বিরাট উঁচু বাড়ি / তারো উর্ধ্বে স্বচ্ছ আজ নীলান্তিক বসন্তের বেলা ॥ প্রকাণ্ড পিতল-বাঁধা কাঠের তোরণ ॥ গির্জার গম্বুজ চূড়া উর্ধ্ববাণী ॥ মেপ্‌ল-ওকের সারি উঁচু মাথা গাছ ॥ উঠেছে গুরুদ্বার স্বর্ণচূড় মিলিত পূরবিয়া ॥ রাত্রি শেষ হলো প্রার্থনার মন্দিরে মিনারেটে ॥ এই মন্দিরের চূড়া সূর্যলাগা / স্বর্ণালী জ্যোতির্ভেদী ॥ শেল বিদ্ধ গির্জা-শিরে ধ্বনি স্তরে মেশে নীল রঙ / অক্ষত আলোর স্নিগ্ধতায় ॥

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর এই প্রসঙ্গে অমিলের দিকটাও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। উদ্ধৃত উর্ধ্বতাবাচক প্রসঙ্গগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এক শূন্যতার সমাসন্ন মৌনের অনুষঙ্গ। ঠিক ক্লান্তি নয়— এক প্রশান্ত বিরতির অনিবার্যতা সেখানে আসল কথা। পক্ষান্তরে 'পারাপার'-এর কবি কোনো প্রস্থানের কথা বলেন না। তিনি বলেন ঐ উর্ধ্বের পদতলে নিবদ্ধ জীবনের কথা। তাঁর অধিকাংশ উর্ধ্বতাবাচক বস্তুগুলি মানুষের রচনা— তাদের ভাষায় মানুষের কীর্তির গম্ভীর ব্যঞ্জনা। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের গাছ-মন্দিরচূড়া-গিরিশৃঙ্গ-নক্ষত্র একান্তই মন্ময় দৃষ্টিতে দেখা। অমিয় চক্রবর্তীর এই জাতীয় প্রসঙ্গগুলি নৈর্ব্যক্তিক এবং তন্ময় দৃষ্টির ফল।

চার

'প্রায়', 'যেন', 'মতো' প্রভৃতি উপমা-উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় খুব কম। নেই বললেই হয়। অনেক সময় নিহিত চিত্রকল্পের ভাষা দীপ্তি দেয় তাঁর কবিতাকে। অনেক সময়ে এপিগ্রামে গড়া চিত্রকল্প তাঁর সহায়। বিস্তৃত বা জটিল চিত্রকল্পের দিকে বা আলংকারিক চিত্রকল্পের প্রতি তাঁর তেমন ঝোঁক নেই। এটা তাঁর শৌখিন আঙ্গিক-রীতি নয়—তিনি এই ভাবে জীবনকেই বুঝতে চেয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় কোনো

'হয়তো' নেই, কোনো 'বোধ হয়' নেই। কেননা, তাঁর কোনো সংশয় নেই, কোনো দ্বিধা নেই। তাঁর মতোই এই শতাব্দীর প্রথম বৎসরে জাত একজন প্রতিনিধিস্থানীয় আধুনিক কবির কথা আমরা বিপরীত দিকে মনে করতে পারি— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গী। তাই সংশয় তাঁর ছায়া-সঙ্গী। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বাসী— কাজেই জটিলতার তিনি কেউ নন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এক আত্যয়িক কালের প্রতীক বারবার রূপ পরিগ্রহ করেছে বর্বর দস্যুর। দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে সুধীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক কল্পনায় আনন্দের সূর্যালোক অপেক্ষা এক সমাসন্ন অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠতে চেয়েছে। সময় বা কাল পরোক্ষে প্রত্যক্ষে সুধীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতীকগুলির স্রষ্টা। অর্থসঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বসংসার প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে-ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, টলে গেল অগ্রজের অটল বিশ্বাস, তা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রতীকিত হয়েছে 'মরু', 'মারী', 'ব্যাধি' ইত্যাদি প্রসঙ্গে। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাঁর কবিজীবনের 'ক্রন্দসী' পর্ব পর্যন্ত 'জঞ্জাল' বা 'আবর্জনা'-শব্দের প্রায়শ প্রয়োগ, প্রায়ই তা যুক্ত হয়েছে 'উচ্ছিষ্ট' বিশেষণের সঙ্গে :

> উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা ; মগ্নতরী জঞ্জালের মতো॥ জমায়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল॥ প্রেমের সমাধি স্তূপে মমত্বের জঞ্জাল॥ অতিক্রান্ত উৎসবের উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল॥ শুধুই জঞ্জালে তাই ভরিয়াছি প্রাণের পসরা॥ নগরের আবর্জনা জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে ঘুরে॥ শটিত জঞ্জাল কণা॥ অবিমৃশ্য জন্মের / জঞ্জালে বিমায়ে সংকীর্ণ সৌধ॥

এই জঞ্জাল-চেতনার গূঢ় অর্থে ধূমায়মান কবির কাল-চেতনা। অমিয় চক্রবর্তীর মতো স্থান বা দেশ নয়, সময়ের হাতে লাঞ্ছিত-সত্তা মানুষ বা ব্যক্তির যন্ত্রণাগম্ভীর জীবন সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়। তাই বিমুখ বর্তমানের নির্জীব ধূসর প্রেতভূমির মাঝখানে সুধীন্দ্রনাথ বারে বারে স্মরণ করেছেন প্রাক্তন প্রেম, অগ্রজের অটল বিশ্বাসের দিন। স্মৃতি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেকখানি—এক প্রৌঢ় স্মৃতি। তা বর্তমানের অন্ধকার পটে রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই অবচেতনের বার্তাবহ, যা অপেলব, কঠিন অথচ দীর্ঘশ্বাসের মতো বুক কাটা। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় স্মৃতি প্রচলিত কাব্যগত অর্থে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে নি।

প্রসঙ্গত সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতার স্বরূপটিও

অনুধাবনীয়। সুধীন্দ্রনাথের কাছে তৎকালীন বাস্তবতা ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। বিশ্বাস বা প্রত্যয় কেবলই মায়ামৃগের মতো দিগন্তে হারিয়ে যায়। হতাশা ব্যক্তিকে—বিশেষ অতীত-সচেতন, কর্ম-সচেতন ব্যক্তিকে কেবলই গ্রাস করতে চায়। চতুর্দিগ্‌বর্তী মূল্যাবনমনের দিকে তাকিয়ে কিন্তু সে-ব্যক্তি ট্র্যাজেডির চরিত্র হয়ে যায় না, কেননা এখানে তো তার কোনো 'হামারশিয়া' কাজ করছে না। সুধীন্দ্রনাথের নায়ক কাল-নামক নিয়তিকেই দায়ী করে নিজের বিড়ম্বনার ছবি আঁকে এই বলে—'সামান্তাদের সোহাগ খরিদ ক'রে / চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।' ডায়োনিশিয়ান ট্র্যাজেডির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সুধীন্দ্রনাথ এক সক্রেটিক দৃষ্টিকোণের অধিকারী হয়েছেন। জ্ঞানকে তিনি স্থান দিয়েছেন সর্বাগ্রে— তাই কালবৈগুণ্য তাঁকে আঘাত হানলেও লাঞ্ছিত করতে পারবে না। কেননা তাঁর জয় পরাজয় ব্যক্তিগত তো নয়ই— উপরন্তু নিরাসক্ত কবিমন তাদের দিয়েছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। তা বলে তিনি নিষ্প্রতিরোধ আত্মসমর্পণেই নিঃশেষিত নন। "উটপাখী" কবিতার সাক্ষ্যে বলতে পারি যে, তিনি জেনেছিলেন প্রয়োগবাদীর কাছে অভিজ্ঞতা, উটপাখির কাছে বালুর মতো। সেই বালু সতত স্থানান্তরণশীল, সে সত্যকে তার মধ্যে পেতে পারে না। সে শুধু সেখানে একটা কথাই জানতে পারে, অপরিহরণীয় অনিশ্চয়তাই সত্য। "উটপাখী" কবিতার 'আমি' এবং 'তুমি' কবিসত্তার দুই ভাগ। এক ভাগ, অর্থাৎ 'তুমি' সমাসন্ন বিপদ এড়ানোর জন্য অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেছে। কবিতাটির 'আমি' যুক্তিবাদী বা জ্ঞানবাদী। সে সেই পথেই সত্যান্বেষার সন্ধান দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কবিতাটিতে কান্টিয় মীমাংসায় উপসংহার এসেছে। প্রয়োগবাদ ও যুক্তিবাদের সহযোগিতায় পাওয়া যাবে সত্যকে। পাওয়া যাবে না তাদের বিশ্লেষে। সন্দেহ নেই যে, সুধীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ চৈতন্য রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রগৃহে দীক্ষিত। প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা চলে, সুধীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের মতোই অন্তত প্রেমের স্মৃতিবিহারে বাস্তবকে অতিবাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন। "শাশ্বতী" কবিতার শেষ স্তবকে : 'ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,' 'অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি', বা 'সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে' প্রভৃতি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে রবীন্দ্রনাথের "ছবি" কবিতার 'আজি তাই / শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল' প্রভৃতি উক্তি। কিন্তু যে-ঊর্ধ্বপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের মেলে ধ্যানের নিভৃত অনাহত আনন্দলোক, এই শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে জেত্তনায় জড়িয়ে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের জটিলতার শেকলের বোঝা, সে ঊর্ধ্বপ্রয়াণ

সুধীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মসচেতনতায় সম্ভব ছিল না। তাই এমন-কি "শাশ্বতী" কবিতারও শেষ কয়েকটি চরণে সহসা ধ্বনিত হয় বর্তমানের বিপুল প্রত্যাখানের স্বীকৃতি— 'কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে'। সমস্ত কবিতাটিতে চিত্রকল্পপুঞ্জ পরস্পর সন্নিপাতে যে তীব্র স্মৃতিবিহারকে মূর্ত করে তুলেছে তা যেন সহসা আরেকটি চিত্রকল্পের ঘাতে ভেঙে গেল— 'স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে / অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা।' যে-অমা-অন্ধকার সুধীন্দ্রনাথের চৈতন্যের জ্যোতির্বিন্দুর চারিদিকে কৃষ্ণবলয়ের সৃষ্টি করেছে, তা যেন এখানেও আত্যন্তিক হয়ে উঠল। সেই সমাসন্ন অন্ধকারের প্রতিমুখে : 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে / আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না'—একটি অসহায় আত্মসান্ত্বনা মাত্র।

সুধীন্দ্রনাথের অন্বেষা বিশুদ্ধ চৈতন্য। অমিয় চক্রবর্তীর অন্বিষ্ট বিশুদ্ধ অনুভূতি। তাই সুধীন্দ্রনাথ প্রতীকী। বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক অভিধা প্রদানের পক্ষপাতী[১১], কিন্তু সে শুধু প্রতীকীরা যে-অর্থে রোমান্টিকদের উত্তরাধিকারী সেই অর্থে। অথচ সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক কবির বিশ্বমনস্কতাও বিপুলভাবে বিদ্যমান। সেই সূত্রেই বলতে সাহস করি, সুধীন্দ্রনাথের অন্তরসত্তার যে অংশটি রোম্যান্টিক, সেই অংশটির প্রতি তাঁর কোনো ভাবালু মমতা ছিল না। যথার্থ আধুনিকের মতোই তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজেই সেই রোমান্টিক সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। জানি না তাঁর বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য 'সুধীন্দ্র জানে যে, তার নিজের বাঁচা মরা চেকোস্লভাকিয়ার ইতিহাসের ওপরও নির্ভর করে'[১২]—কতখানি সত্য। তবে এ কথায় কোনোই সংশয় নেই যে, সুধীন্দ্রনাথের চিত্তে বিশ্বগত জটিলতার মীমাংসা নেই। বরং সুতীব্র জিজ্ঞাসায় সে জটিলতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আত্মমীমাংসায় কখনো কখনো চঞ্চল কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এইভাবে—'তাঁর আর আমার ধর্ম আকাশপাতালের মতো পৃথক। তিনি সুখ, উদয়াস্ত নির্বিকার : আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠেছি ; সদ্‌গতির আগেই হয়তো তমসায় আবার তলাব'[১৩]। এই প্রবল অন্ধকার-চেতনা সুধীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই অন্ধকারের মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে অন্য বর্ণকল্পনা, যথা :

---

১১. 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা, দে'জ, ১৯৬৬।

১২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'বক্তব্য', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী ১৯৫৭, পৃ ২৫৭।

১৩. 'অর্কেস্ট্রা'-র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ।

ক. আতুর নয়ন তাই করে অন্বেষণ
কুটিল আমার মধ্যে তব বক্র কেশের মাতন,
অবাধ্য, উৎক্ষিপ্ত বহ্নি-সম ;

"উদ্‌ভ্রান্তি", 'অর্কেস্ট্রা'।

খ. সন্ধ্যার রাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে

"অর্কেস্ট্রা", 'অর্কেস্ট্রা'।

গ. স্তব্ধ রাতে
শোকাবহ শিশিরসম্পাতে
মোর ফনিমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীষ

"কাল", 'ক্রন্দসী'।

ঘ. বুঝিলাম বেলা চ'লে যায়,
দিগন্তের পটে আঁকা অস্থিসার হিম চন্দ্রমায়
সূর্যের অপরিহার্য তেজ
রচে শেষ শেজ ;

"ভাগ্যগণনা", 'ক্রন্দসী'।

এ সমস্ত চিত্রকল্পে প্রতীকে সুধীন্দ্রনাথ যা খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাকেই খুঁজছিলেন তাঁর ছবিতে, তাঁর নৃত্যনাট্যে। অ-চারু, অস্থিসার, কঠিন রবীন্দ্রনাথের ছবির জগৎ। কথার সৃষ্টিতে যখন তাঁর ঔদাসীন্য জন্মে গিয়েছিল, যখন তিনিও সত্যকে সুন্দর বলে ততটা নয়, যতটা দুঃসহ কঠিন বলে ভালোবেসেছেন, এবং সে-ভালোবাসায় প্রশ্রয় পেল না কোমলতা, পেলবতা, তখনই রবীন্দ্রনাথ রেখার মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছেন 'আধুনিকতা'-কে। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতি সুদূর সাদৃশ্য মাত্র এইখানে। রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের অর্ধ পরিচিত মুখোশ বা ভঙ্গিমার রহস্যঘনতার সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছে করে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অপেলব, তন্মাত্র চিত্রকল্পের এবং প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে প্রাচীন প্রস্তর খণ্ডের মতো দুরূহ আভিধানিক শব্দপুঞ্জের।

পাঁচ

সুধীন্দ্রনাথের জগৎ দ্বিধাবিদীর্ণ। 'মানসীর দিব্য আবির্ভাব সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে / জাগরণে আমরা একাকী'— এই বিদীর্ণতা সুধীন্দ্রনাথের; তা কদাচ অমিয় চক্রবর্তীর নয়। তাঁর উত্তরণী মন্ত্র বরঞ্চ এই কথা বলে, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন।' সুধীন্দ্রনাথের মনস্বিতায় মুক্তি ছিল না। মুক্তি তাঁর অম্বিষ্টও নয়। অমিয় চক্রবর্তী হৃদয়বাদী। মুক্তির জন্য তিনি ব্যস্ত নন। তাৎক্ষণিক নানা মুক্তি বন্ধুর প্রসন্ন হাসির মতো বারে বারে তাঁকে ঘিরে ধরে। অথবা মুক্তি তাঁরও অম্বিষ্ট নয়। তিনিও খুঁজেছেন জীবনের প্রতি মুহূর্তের পিছু ডাক। সুধীন্দ্রনাথের 'ইতি'র চন্দ্র-বিন্দু নেতির অন্ধকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত। তাই তাঁর কবিতায় প্রাথমিক নাটকীয়তা না থাকলেও, সে কবিতা যেন অধিকাংশ সময়ে পঞ্চমাঙ্ক ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যের নায়কের উক্তি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় পাই জীবনের সংযত মাধুর্যের সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি। তাঁর অনেক কবিতাই নতুন জগতের কবিতা। এই একান্ত অরাজনৈতিক কবির দৃষ্টিতে বারে বারে উপনিবেশবাদবিমুক্ত বিশ্বের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। সে-বিশ্বাসের মূলভিত্তিও রবীন্দ্রসম্মত— মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই। রবীন্দ্রনাথ থেকেই এক উত্তরাধিকৃত আস্তিক্য অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়েছে পাথেয়। 'পাথেয়' শব্দটি এখানে সর্বার্থে প্রযোজ্য— কেননা সে তো এক পথিক কবিরই পাথেয় বটে। তাঁর আস্তিক্য পথিকতারই আস্তিক্য। পথপ্রান্তবর্তী তীর্থ তাঁরও লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের মতোই পথের দুধারে তাঁর চোখ মেলা বারে বারে অথবা বিভূতিভূষণের মতোই।

শেষবর্তী রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও জীবনাতীত বা অরূপ অধরা অপেক্ষা বিশ্বাস করেছেন, বিশ্ব সত্য, ততোধিক সত্য মানুষ। এই কথাটি তিনি কখনো পুরানো কথা বলে বাতিল করে দেন নি। কবি রবার্ট ফ্রস্টের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর মিল নেই বললেই হয়, সুতরাং তা দেখানোর উদ্দেশ্যও আমাদের থাকতে পারে না। কিন্তু রবার্ট ফ্রস্টের একটি স্থায়ী উপলব্ধির সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বিশ্বাসের একটি অনুচ্চারিত সাদৃশ্য যেন কোথায় আছে। 'দি ব্ল্যাক কটেজ' কবিতায় ফ্রস্ট বলেছেন যে 'কেন পরিহার কর একটা বিশ্বাস, তা বাতিল হয়ে গেছে বলে? যথেষ্ট আঁকড়ে ধর তাকে—তা আবার সত্য হয়ে উঠবে।' বলাই বাহুল্য ফ্রস্ট এখানে বিশ্বাসের অপরিবর্তনীয়তার কথা বলছেন না। বলছেন সত্যের কালজয়ী স্বরূপের কথা। অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্যও কতকটা তাই। তাঁর কবিতা 'মানুষের শাশ্বত মুহূর্তগুলির কথা' বলে।

পটভূমি পাল্টে যায়। চারদিকের উপকরণ বদলে যায়। এক থাকে পটধৃত ব্যক্তির অন্তরের ছবি। এ জন্তই তিনি মানুষের বিচার করেন না এমন নয়— কিন্তু তিনি কখনো দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করেন না। 'ঘরে ফেরার দিন' এবং 'হারানো অর্কিড' এই দুই কাব্যগ্রন্থে তাই বোঝা গেল এই কবি আধুনিক হবার জন্ত ব্যস্ত নন, কবিত্বের জন্তও ব্যস্ত নন— এঁর একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন-নামক সেই মহৎ চিত্রকরের সঙ্গে সঙ্গে ফেরা, যার কাজ মানব-বিশ্বের চলচ্ছবিকে মুহূর্তে মুহূর্তে ফুটিয়ে তোলা। এর বড়ো প্রমাণ 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের 'দীপাবলী' এবং 'চলতি' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে। ছোটো কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবিদের সমতুল্য কৃতিত্বের অধিকারী। কিন্তু তাঁর ছোটো কবিতায় প্রধানত ফুটে ওঠে একটা কোনো-না-কোনো আলেখ্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করি 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের "ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে একদিন প্রশ্নোত্তরে" কবিতাটি।

যে-আস্তিক্য অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতাকে নূতন মাত্রা দিয়েছে তার স্বরূপটি এই আলেখ্যগুলির উপরে একটা আলো ফেলে। তাকে কিন্তু মিষ্টিকের গূঢ় স্নিগ্ধ আলো বলা চলে না। তিনি ব্যস্তও নন সে ভাবে সেই আলোটিকে প্রতিপন্ন করার জন্ত। তাঁর আস্তিক্যের মূল কথা হল— জীবনের প্রতি বিশ্বাস। মানুষের মহৎ কীর্তিতে তাঁর উপেক্ষা নেই! কিন্তু হীরের টুকরো যেমন ওজনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে বর্ণচ্ছটা প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রমাণিত করে— এই কবির কাছে জীবনও ঠিক সেইভাবে প্রতিভাত। কিন্তু তা হলেও তাঁর সম্বন্ধে শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। আত্মসচেতনতা এবং বিশ্বসচেতনতা আধুনিক বাংলা কবিতার একটা প্রধান লক্ষণ। অমিয় চক্রবর্তীর চেতনাকে কি সভ্যতার আধি এবং ব্যাধির যন্ত্রণা কিছুই স্পর্শ করে নি? 'হারানো অর্কিড'-এর ভূমিকায় যে-কবি বলছেন— 'আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পড়েছিল অনিন্দ্যসুন্দর বিজয়ী অর্কিড, বর্বর সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে। কোনোদিনই হারাবে না'—সে-কবি সম্বন্ধে এমন কথা বলা যাবে না। 'হারানো অর্কিড' নাম-কবিতাটির ছোট্ট প্রেম কাহিনীর অন্তে কথাটি হল—'অর্কিড কখনো হারাবে না।' অর্কিড তাঁর হাতে প্রেমের প্রতীকই শুধু নয়— জীবনের প্রতীক। অন্ধকার আছে, থাকবেও—কিন্তু মানুষের বুকের কাছ অর্কিড হারিয়ে যাবে না—চিরন্তনত্ব ও আধুনিকতার মাঝখানের বেড়াটি খুলে দিতে দিতে অমিয় চক্রবর্তী এই কথাই বলে চলেছেন। বলে চলেছেন মৃত্যুর কথা নয়—পৃথিবীর বৃন্তে কোটা এ-

জীবন ("সাক্ষী", হারানো অর্কিড)-এর কথা। দুঃখের কালো কয়লা নেই—এমন কথা তিনি বলেন না। বলেন—'বুকভাঙা কালো কয়লা তীব্ররাতে / হীরে হও' ("হীরে", হারানো অর্কিড)। সে কবিতা যতই হয়ে উঠুক না কেন 'নীলমাখা পাখি হাওয়ার একক/গ্রহপারে ওড়া শূন্য সাধক', তবু তার পালকে খুঁজে পাই : 'পৃথিবী দিনের মাটির কণিকা লীনা,/ঠোঁটের কোনায় মহুয়ার কণা লুকোনো/বাংলা ঘরের সবুজ চিহ্ন কোনো,/নখের তলায় জীবনের ধুলো লাগা!' ("পরিচয়", হারানো অর্কিড) এই তাঁর উড়ে চলা, চিরকালের দিকে। 'প্রেমে রঙে শুধু একটি'। তাঁর পর্বের আধুনিকতার প্রধান কথা এই যে, তিনি সত্যকে কখনো বিপন্ন বলে ঘোষণা করলেন না। সত্যকে দিয়ে তিনি কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করলেন না।

ছয়

'একবার ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনের কোনো সময়ে রিল্‌কের কাব্য ওঁকে [জীবনানন্দকে] স্পর্শ করেছিল কিনা'—বললেন, না, রিল্‌কে ওঁর বিশেষ জানা নেই।—বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে[১৪] অমিয় চক্রবর্তী এ কথা জানিয়েছিলেন। জীবনানন্দের কবিতায় রিল্‌কে যতটা আছেন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় রিলকে পরিমাণে ততটাই আছেন—যদিও বিদ্যমানতার প্রকৃতিটা ভিন্ন। জীবনানন্দ এবং অমিয় চক্রবর্তী দুজনেই বলেন রৌদ্রের কথা। দুজনেই বলেন মৃত্যুর কথা। রিল্‌কের মতো কেউই কিন্তু ভাবনালীন হতে চাইতেন না। জীবনানন্দ যদি বা কখনো কখনো ভাবনার ভারে অবনত—অমিয় চক্রবর্তীর কাছে চৈতন্য দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। জীবনানন্দের রৌদ্র সব সময়ে অন্ধকারের প্রতিমুখে স্থাপিত। তাই তাঁর রৌদ্রের নানা রঙ। অমিয় চক্রবর্তীর রৌদ্র আপন মহিমায় সত্য। তার নিজেকে প্রমাণ করার জন্য কোনো অন্ধকারের বিরোধী ভূমিকার দরকার নেই। সেখানে আলো এবং অন্ধকার, রাত্রি এবং প্রভাত, জীবন ও মৃত্যু অচ্ছেদ্য অখণ্ডতায় বিরাজিত। মৃত্যু সেখানে জীবনেরই স্মারক। "সন্ন্যাসীর মৃত্যু" কবিতাতেই শুধু নয়, 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যের "সান্টা মারিয়া দ্বীপে" নামে কবিতাটিও মৃত্যু সম্বন্ধে কবির প্রসন্ন দৃষ্টির নিদর্শন। এইসব থেকেই বলি, তিনি যতটা আধুনিক তার থেকে অনেক বেশি কবি। এই কবিত্বই তাঁর চেতনার অভিজ্ঞান।

১৪. 'কবিতা', জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা : পৌষ ১৩৬১, পৃ ১২৭।

আধুনিক কবিতার জন্ম আধুনিক জটিলতাকে সাড়া দিতে গিয়ে। সুতরাং এই আহ্বানের জটিলতাকে না-বুঝলে আমরা এই সাড়ার জটিলতাকেও মূলে স্থূলে অনুভব করতে পারি না। আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন দ্রুতবেগে এক ক্রমবর্ধমান আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মচেতনা এবং আত্মাভিজ্ঞানের সন্ধানী পালা শুরু হল, আধুনিক কবিতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে থেকেছে আধুনিক রূপে ও স্বরূপে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রাতেও মধ্যবিত্ত মানসে তখন নেমে আসছে নিজ ভূমিকার ম্লান সমাপ্তি সম্বন্ধে গাঢ় অনুভূতির ধূসরিমা। দু-দুটো গণআন্দোলনের অকাল অবসানে বহু খণ্ডিত আবেগের, দমিত বাসনার, নির্বাপিত উত্তেজনার ঘোলাজলে ভেসে গেল পূর্বজদের প্রতিষ্ঠিত বহু বিশ্বাস।[1] অর্থরিটির পতন শুরু হল বিশ্বজোড়া মন্দা-র মধ্যে—মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগের স্মৃতি তখন ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। রুশ বিপ্লবের পর থেকে সারা জগতে এসেছে পুরনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা। ইংলণ্ডে ১৯৩৩-এ অক্সফোর্ড ছাত্র-সংসদ তাঁদের সুবিখ্যাত 'King and country[2] প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বৃদ্ধদের সম্বন্ধে একটা বিমুখতা ও একটা অবজ্ঞার ভাব প্রকট হতে থাকে। অরওয়েলের 'The Road to Wigan Pier' (1937) গ্রন্থে যেকোনো দূষিত অবস্থার জন্ম বৃদ্ধদের প্রাধান্যকে দায়ী করা হল— স্কটের নভেল এবং হাউস্ অব লর্ডস যেহেতু বৃদ্ধদের পক্ষপাত-ধন্য ছিল, তাই তা হল নিন্দার যোগ্য। আধুনিকতম ভাষায় এ্যাংরি ইয়ংমেন বলতে যা বোঝায়, তারই সূত্রপাত লক্ষ করি দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে দিশাহারা যুবকের আচরণে। এর কারণটি বিশ্লেষণযোগ্য। য়ুরোপের পশ্চিমদিকের দেশগুলিতে—বিশেষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াটি

---

১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯২৮) এই স্বপ্নভঙ্গকে আরো নিষ্ঠুর করে তুলল।

২. চার্চিলের যুদ্ধস্মৃতিতে এই ঘটনার তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বৃদ্ধ ও তরুণের বোঝাবুঝির দুস্তর ব্যবধান চোখে পড়ে।

এই সূত্রে অনুধাবনযোগ্য। একটা ভয়ানক রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে গেল—তার জন্য কর্তৃপক্ষ শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে একটা কৃত্রিম বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সে-সব আবেগ এবং দোহাইগুলি যে কতটা অন্তঃসারশূন্য ছিল মহাযুদ্ধের বারুদের ধোঁয়াশা সরে যেতেই তা যুবক শ্রেণীর কাছে স্পষ্ট হতে থাকল। ১৯৩০-এ ইংলণ্ডে কাফ্‌কার ম্যুইর ট্রানস্লেশন প্রকাশিত হল—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উঠতি বুদ্ধিজীবীরা কেউ কেউ তখন কাফ্‌কার নব যীশুর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখছেন নিজের জটিল অষ্টাবক্র পরিস্থিতিকে। তখন তাঁরা নিজেদের বেঘোর সময়ের একটা তিক্ত সংজ্ঞার্থ খুঁজেছেন। এই মনোভাবগুলির প্রাথমিক ফসল হল পুরনো নেতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার। ইংরেজ কবিদের মধ্যে বামপন্থী প্রবণতা এ সময়ের সংজ্ঞার্থ সন্ধানের ফল। মার্কসীয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও বিশ্ববীক্ষা তখনই জরুরী হয়ে উঠল।

প্রায় একই কালে, শতাব্দীর একই দশকে, দু এক বছরের আগে-পিছে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত তার কবিকুলের একাংশে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে—এটা আমরা লক্ষ করি।[৩] এখানেও মধ্যবিত্তের সামাজিক নৈরাশ্য নিজ শ্রেণীর নেতৃত্ব-বিনাশের চেতনা, রাজনৈতিক হতাশা একটা নতুন জীবনভাষ্যের জন্য চঞ্চলতার জন্ম দিল। সুতরাং পুরনো জমানা বা old order-এর বিরুদ্ধে অনাস্থা—বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের চিন্তায় শুধু নয়, কাজে কর্মেও উচ্চারিত স্পষ্টতা পেতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে ও বাইরে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বামপন্থা মহাত্মাজীর অথরিটির বিরুদ্ধে শুধু নয়, যেকোনো প্রকার হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়েছে—অন্তত বাংলাদেশে। মার্কসবাদ যে এমন অবস্থায় তরুণ কবিদের বিশ্ববীক্ষাকে প্রভাবিত করবে তাতে আকস্মিকতা কিছু নেই। অবশ্য প্রতিবাদের কবিতা এর আগেই লেখা হয়েছে। নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই পুরনো ব্যবস্থার ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সামাজিক সাম্যের জন্য কবিদের সজাগ হতে হবে এমন কথা নজরুল এর আগেই লিখেছেন। ইংলণ্ডেও ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে

---

৩. ১৯৩৪-৩৬-এ লেনিন পড়া কেতা হয়ে উঠেছে। উল্লেখ করি বিষ্ণু দের "জন্মাষ্টমী" কবিতার বাঁকা কটাক্ষ—লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-

এব্‌ল ইন্‌
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং ?

কবেট, রবার্ট ওয়েন, ডিকেন্স, উইলিয়ম মরিস, রাস্কিন সামাজিক ভাবে অসন্তোষকর অবস্থার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটা হয়তো বা রোমান্টিকদের পুরনো জমানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই শিল্প-বিপ্লব-পরবর্তী পরিণাম। কিন্তু Anti-Dhuring-এ এঙ্গেলস যা ভেবেছেন এ প্রসঙ্গে সে কথা-না ভেবে আমরা পারি না :

> All former moral theories are the product in the last analysis of the economic stage which society had reached at that particular epoch. And as society has hitherto moved in class antagonisms, morality was also a class morality

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঈশ্বর এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রয়ানার বিরুদ্ধে সমালোচনার মনোভাব, নজরুলের রাজনৈতিক সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে জনতাকে অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের' প্রভৃতি ঘোষণা একটা নতুন বাস্তব পরিস্থিতিকে অঙ্গীকার, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—কিন্তু এসব কবিতার পিছনে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রণোদনা রয়েছে এমনটা নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে না। তবে একথা বলা যাবে, এসব কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থভূমিকার ছক বাঁধা পরিসর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য একটা আকুলতা লক্ষ করা যায়। ইংলণ্ডে যেমন চ্যানেলের ওপারে ফ্যাসিজম-এর বিপদটা হয়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ, কলকাতায় কলোনির বাবুরক্তের গ্লানিও তেমনি গঞ্জনা ছড়াচ্ছিল প্রতিপদে—রোমান্টিক বিদ্রোহ কল্পনার জের ধরেই নজরুল উচ্চারণ করছিলেন "ফরিয়াদ" বা "কুলি" কবিতার চকচকে ধারালো পঙ্‌ক্তিগুলি। যতীন্দ্রনাথ লিখছিলেন ফেমিন রিলিফের কবিতা। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের তফাত এখানে যে ব্যাপারটি এখানে রোমান্টিকতার মার্কসীয় কোরিলেটিভ সংগ্রহ নয়, মার্কসবাদেরও রোমান্টিকীকরণ নয়—এটা এদেশে এসেছে আরো সুস্পষ্ট কার্যকারণ থেকে। সেটা হল ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ।[৪] নজরুল যতীন্দ্রনাথের অবস্থা থেকেই ব্যাপারটি বোঝা যায়। তাঁদের কবিতার ক্রোধ এবং সংশয় অনেকটাই যেন একথা বলে যে সমাজের স্ট্রাকচার এবং সুপারস্ট্রাকচারের প্রতীয়মান বাস্তবতার সঙ্গে তাঁরা মিলতে পারছেন না। এখানে স্ট্রাকচার

৪. এর সঙ্গে এলিয়ট কথিত Sweeney Agonistes এর নায়কদের কোনো মিল নেই, যারা ওয়েস্তিসের মতো নিজেদের ভেবেছিল— জীবনের মাঝখানে থেকেই জীবন থেকে নির্বাসিত। ১৯২৫-এ Hollow Man-এও এলিয়ট এক আধুনিক boredom-এর কথা বলেন— বাংলা কবিতায় তার প্রভাব পড়েছে আরো পরে।

এবং সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কালে মার্কস যে জটিলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে দিকে নজর রেখেই বলতে পারি যে এই দুইজন কবির কিছু কিছু রচনায় সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার আহ্বানে সাড়া দেবার চেষ্টা ছিল। এটাই বড়ো কথা, এটাকে মার্কসীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার একটা ধারা বলার জন্য কেউ ব্যস্ত নন।

কিন্তু নজরুল কম্যুনিস্ট-আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন—ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজঃফর আহমেদের বন্ধু ছিলেন—আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।[৫] এসব মেনে নিয়েও বলতে পারি নজরুল প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। ১৯২৮-এর বিশাল শ্রমিক ধর্মঘট নজরুলকে প্রভাবিত করেছে শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়ে। কিন্তু নজরুল তারাশঙ্করের 'চৈতালীঘূর্ণি' উপন্যাসের মতোই শ্রমজীবী সচেতন মাত্র। তার কারণ শ্রেণী-সহানুভূতি। এর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের প্রাথমিক সংযোগটাই বড়ো কথা।

চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত নিজ অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এবং বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে তো বটেই তাত্ত্বিকভাবেও সচেতন হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত সজাগ যুবক তখন দুটো আধিতে পীড়িত—এক, অস্বাধীনতায়— সেটা আবার রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় আর একটা ফোড়ার মুখ পেয়েছে, দুই, নিজে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়। ১৮৪২-এ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক বিতর্কে মার্কস বলেছিলেন :

> The mortal danger of each person consists in the danger of losing himself. Hence unfreedom is the true mortal danger for man.

রাস্কিনের সমসাময়িক মার্কস। কিন্তু মার্কস-এর তত্ত্ব ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়ে উঠল রাস্কিনের অনেক পরে। নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থেকে এল সেই ভয়ের কারণকে অপসারিত করার

---

৫. কিন্তু মনে রাখি যেন, নজরুলের বিদ্রোহী আখ্যার মূলে তার প্রতিবাদী জীবন যাত্রা। তাঁর সাম্যবাদও খানিকটা 'বিদ্রোহী নৈরাজ্যবাদ'— পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যবিত্ত বাংলা কবিতা : [illegible] ২।১।১৯৭৩।

ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা আবার অন্তার্থে সন্ধান করেছে পূর্ণ মানুষকে—মার্কস যাকে বলেছেন whole man.[৬]

বিচ্ছিন্নতার বেদনা সে সময়ের বাংলা কবিতায় কতটা উচ্চারিত হয়েছে তার একটু পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখনই তো এ প্রশ্ন দুর্মর হয়ে উঠল শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, শরীরে জলের গন্ধ মেখে উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে চাষার মতন প্রাণ পেয়ে কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে?

ক. সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?

বোধ : জীবনানন্দ দাশ।

তখনই তো কেউ বলেছেন :

খ. মানুষের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে? বুঝি নাকো ভাষা যে এদের

সোহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতী : বিষ্ণু দে।

অথবা :

গ. বুদ্ধিজীবী রুদ্ধঘরে সঙ্গীহীন
আত্মরতির সম্মোহনে কাটায় দিন।
পাষাণ কালো আকাশে আলো কখন কাঁপে?

পূর্বরাগ : বুদ্ধদেব বসু।

তখনই তো মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানির করুণ এবং একার্থে প্যাথেটিক স্বগতোক্তি

---

৬. The alienated worker, says Marx, "does not fulfil himself in his work but denies himself, has a feeling of misery rather than well-being does not freely develop his physical and mental energies, but is physically exhausted and mentally debased...

Early Writings : Karl Marx P. 125

ধ্বনিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'চলচ্চিত্র' কবিতায় নিদারুণ বেকার জীবনের অকর্মক যন্ত্রণার অবিস্মরণীয় এই আত্মবিলাপ ভুলবার নয় :[৭]

এই নিয়ে আটবার
চাকরীর চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ভদ্র বংশজাত বি এ,
সচ্চরিত্র (বাধ্য হয়ে), পরিশ্রমী (হায় পণ্ডশ্রম!)—
আর কত আনাগোনা ঘামে ছেঁড়া সুপারিশ নিয়ে
মুক্তাকবিহীন হতাশার গোলক ধাঁধায়।
আর কতদিন
দুর্ভিক্ষ লুকিয়ে রাখা মলিন পাতলুনে।

শেষটা এক করুণ আত্মসমর্পণ নিজ শ্রেণীর ভবিতব্যের কাছে :

মনে মনে—শুধু মনে মনে—
অফুরন্ত অবাধ ভ্রমণ!
এই বাস্-এ একজন কলেজের দিকে যায় রোজ
মোটা,
কুৎসিত সন্দেহ নেই,
তবু অন্তত হতাম যদি কেরানি কি ইস্কুল মাস্টার।

খণ্ডিত ভগ্নাংশীভূত পুরুষকারের এই যন্ত্রণা বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণী হিসাবে পঙ্গুত্বের যন্ত্রণাও বটে। কখনো গান্ধীর কখনো অরবিন্দের শরণ নিয়ে সে অচরিতার্থতার অবসান ঘটে না, আবার এদিকে ওদিকে কানাঘুসো যাও শোনা যাচ্ছিল তাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করলেও বিপদ আছে :

সার সত্য শোনো, মাথা ঠাণ্ডা করো ; হৈ চৈ ছেড়ে
ভাবো তো মুখে যা বলো, সত্যি তাই হয় যদি—তবে
সব যাবে, সব যাবে, একেবারে সর্বনাশ হবে।

১৯৪০-এর বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে লেখা বুদ্ধদেব বসুর এই কবিতা থেকে একটা কথা আমরা বুঝতে পারি কলকাতার কবিরা তিনের দশক শেষ হবার

---

৭. 'His work is not voluntary but forced labour' মার্কস কথিত alienated worker-এর স্বরূপ বর্ণনা ধরেই আমরা বলতে পারি— তার কর্মহীনতাও imposed এবং forced—উদ্ধৃতিটিতে তিরিশের জঞ্জাল যন্ত্রণার তথ্যনিষ্ঠ ছবি পাই।

অনেক আগেই মার্কসীয় শ্রেণীবিপ্লবের তত্ত্বে মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এর প্রায় দশবছর আগে, যখন প্রত্যক্ষভাবে কেউ মার্কসীয় তত্ত্বে দীক্ষিত হন নি তখন থেকেই কিন্তু সভ্যতাভিমানী এবং সংস্কৃতি অভিমানী কোনো কোনো চরিত্র উপনিবেশের অকৃতার্থ বিবর্ণ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বজ্রনাদ করেছে এই ভাষায় :

সহেনা সহেনা আর জনতার জঘন্য মিতালি।
প্রণয়ের মমত্ব বন্ধনে,
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে,
হে ভৈরব, জীবন দুঃসহ।

"প্রত্যাখ্যান" : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

'জনতার জঘন্য মিতালি' বা 'পতঙ্গের সাম্যবাদ'[৮] মধ্যবিত্তের আত্মম্ভর চিন্তাকে একটা আভিজাত্যের রোহভূমি দিতে চেয়েছে। এটা ছিল না মার্কসীয় অর্থে শ্রেণীজ্ঞান। সেটা বরঞ্চ পাওয়া গেল সমর সেনের কবিতায়। মধ্যবিত্ত রক্তের ক্লান্তি, দুর্বহ অস্তিত্বের ধূসরতার বোধ, এই জীবনের সীমাবদ্ধতার সকল দায় সম্বন্ধে পরিষ্কার চেতনা— শ্রেণীগত বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা সমর সেনের কবিতাতে এমনভাবে প্রতিফলিত হল, যার পিছনকার মার্কসীয় প্রেক্ষণ-পটকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। সমর সেনের প্রথমদিকের প্রধান কবিতাগুলি এক হিসাবে তিনের দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত আত্মবিলাপ। আমাদের মনে পড়ে এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলি :

হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি ;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি :
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।

৮. 'পতঙ্গের সাম্যবাদ' কথাটির মধ্যে অথরিটেরিয়ান রাষ্ট্রের রেজিমেন্টেশনের দিকে ইঙ্গিত তীক্ষ্ণ হয়েছে এমন কথা ভাবি না। বরঞ্চ পরাধীন স্বদেশের ব্যক্তিত্বচর্চাবিহীন জীবনের কথাটাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে করি।

কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

স্ববিরোধে পূর্ণ, ভাঙনের শেষধারে এসে দাঁড়ানো এই যুবক চরিত্রটির অস্তিত্বের জটিল পাঠ সত্তার গভীর বাণীতে নিয়ে আসে তার ভবিষ্যতের ভূমিকার ইঙ্গিত কবিতাটির শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে।

শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্তের ভূমিকাবসান ট্রাজিক রূপ নেবে, না প্যাথেটিক হয়ে উঠবে, তা অবশ্যই নির্ভর করে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে কবির মনোযোগের উপর। "উজ্জীবন" কবিতায় ১৯৩৮-এর ২৯শে অক্টোবর সুধীন্দ্রনাথের কবিতার চরিত্র শুনতে পান এক পদধ্বনি। 'পদধ্বনি— কার পদধ্বনি / হানে মৌন অনুনাদ ?' 'আসে কি সে-অর্ধপশু, অর্ধেক মানব / সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু ? / পুরাণ-পুরুষ হত : বাজে বক্ষে আর্তির ডমরু'। এখানে চরিত্রটি বস্তুত উজ্জীবনের কথা ভাবেনি—ভয় পেয়েছে আত্যন্তিক বিনাশের মুখোমুখি হয়ে। একই মিথ্ আরো স্পষ্টভাবে ব্যবহার করলেন বিষ্ণু দে তাঁর "পদধ্বনি" কবিতায়। কিন্তু ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় অগ্রগতি বিষয়ে মার্কসীয় চেতনার আলোক ব্যবহার ফলে—"পদধ্বনি"-র নাটকীয় একোক্তির নায়ক-চরিত্র অনেক বেশি তাৎপর্য পেল—কবিতার বিচারেও বটে। তাই দেখি শক্তির অবক্ষয় নয়, শক্তির রূপান্তর, সে রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা "পদধ্বনি" কবিতার বিষয়। সেদিন সেই ১৯৩৯-এ যখন নতুন সামাজিক শক্তির অভ্যুদয়কে মার্কসীয় ইতিহাস জ্ঞানে অনিবার্য বলে মনে হয়েছে, "পদধ্বনি"-র অর্জুন সেই সময়ের নায়ক। তার খেদোক্তির পরিমণ্ডলে ছিন্নস্মৃতির বিলীয়মান স্বর্ণাভা—তার সম্মুখে স্পন্দিত ছিল আগামীকাল।[৯] কবিতাটির পরিসমাপ্তিতে দেখি—মোহ এবং মনীষা, অহমিকা এবং ভবিষ্যৎবোধ ইত্যাদির মিশ্রণে কবির সৃষ্ট নায়ক যেমন তাকিয়ে আছে তার ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তির দিকে, তেমনি তার দৃষ্টি তাকিয়ে রয়েছে ভাবীকালে। সেই মনীষা ইঙ্গিত তুলেছে— 'একি নব অবতার ? একি যুগান্তর ?' আবার পরক্ষণে সেই মোহ সংশয়ের আবছায়া

৯. তখন ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামায় ঘা পড়েছে। দেশে দেশে নতুন শক্তির আগমন-ধ্বনি বেজে উঠছে— এক সর্বাত্যয়ের মধ্য দিয়ে। এই অবস্থায় কীর্তিমান মধ্যবিত্তের চরিত্রপ্রতীক হয়ে উঠল অর্জুন— "পদধ্বনি" কবিতায়।

সৃষ্টি করে—'দস্যুদল উদ্ধত বর্বর'। এ অর্জুনের, তথা এই মধ্যবিত্তের সচেতন সত্তা দস্যুদের প্রাণৈশ্বর্যের প্রতি প্রশংসমান। সে ইতিহাসের এই নবপর্যায়ে 'আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর' দস্যুদলের আবির্ভাব মুহূ আসলে ক্রান্তিলগ্নের চ্যালেঞ্জকেই স্বীকৃতি জানায়।[১০]

এইভাবে বিষ্ণু দে-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক মধ্যবিত্ত চরিত্র মার্কসীয় ইতিহাস-বীক্ষার দৌলতে রূপান্তরিত হল এক সকর্মক ভবিষ্যউন্মুক্ত চরিত্রে। কবিতার ভাবগত মেরুদণ্ড ও রূপগত প্রকরণ অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছে এই বীক্ষণের বিভায়। এশিয়া ভূখণ্ডে সামরিক স্বৈরাচারী সাম্রাজ্য পিপাসা চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আবিসিনিয়া নির্জিত হয়েছে ফ্যাসিস্ত ইতালির হাতে, অষ্ট্রিয়া ধর্ষিত হয়েছে নাজি জার্মানীর কাছে— স্বদেশ ও বিদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জায়মান সেই চেতনা এবার কমিটমেণ্ট এবং এলাইনমেণ্ট-এর প্রশ্নের মুখোমুখি হল। এই বেপরোয়া সময়কে স্মরণে রেখে একবার আমাদের হিসাব-নিকাশ করতে হয় আধুনিক কবিতার তাত্ত্বিক পটভূমিরূপে মার্কসবাদের অবদান কতটা। আমরা দেখি :

এক : কবিতার ভাষা এক নতুন তির্যকতা পেল। ঋজুতাও হল অভিনব। অর্থাৎ ঋজু ও তির্যক দুধরনের প্রকাশভঙ্গিই জন্মান্তর পেয়েছে।

দুই : সকল কবিতাই হল এক অর্থে নাট্যকবিতা। সুতরাং কবিতার তৃতীয় স্বরে এক নতুন ডাইমেন্‌শন্ এল।

দুই

আধুনিক কবিতার ভাষায় এই নতুন বাস্তব অবধানতার পরিচয় পাওয়া যায় দুভাবে। আমরা জানি যে কোনো সাহিত্যই—লিখিত অথবা মৌখিক, গদ্য অথবা কাব্য একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের ভাষা। 'বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারের ভাষা'— বলতে এখানে এ আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা

১০. এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকেও একবার আকৃষ্ট করেছিল। সেই অলিখিত কাব্যনাটকের পরিকল্পনাটি তিনি জানিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে। পুরাণ ব্যাখ্যাটি অবশ্য ছিল কবির নিজস্ব কল্পনার দান। খবরটি পাই Samvadadham-এর P. C. Mahalanobis memorial Volume-এ Rabindranath Tagore : Prasanta Chandra Mahalanobis রচনায়।

তৎকালীন সামাজিক, ব্যক্তিক, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিকেই বুঝি। পরিস্থিতি তখন দাবি করছিল বৈপ্লবিক রূপান্তর, পরিস্থিতি তখন প্রতি অংশে বিশ্বগত-পরিস্থিতি, প্রতি মুহূর্তই তখন বিস্ফোরক। অতএব যে কাব্যপ্রকরণ প্রেমবিরহ ব্যক্তিগত বাসনার itemization[১১]-এ ব্যস্ত, তার জায়গায় নতুন প্রকরণের প্রয়োজন হল। প্রথম প্রয়োজন হল গতিবেগের। মার্কসীয় তত্ত্ব সাম্যবাদী বাঙালী কবিদের বাক্যশৈলীতে এনে দিয়েছে গতিবেগ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এবং অরুণ মিত্রের এই সময়ের কবিতাগুলি এ কথার সাক্ষ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল পটভূমিকে ধরার জন্য এই গতিবেগের দরকার হয়েছিল এমন বললে কম বলা হবে। বরঞ্চ পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন থেকে বাক্যের এই সচল তীক্ষ্ণতার জন্ম— একথাটাই এখানে জরুরী। 'জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন জ্বলে সাংহাই' এই বাক্যে ক্রিয়াপদ বর্ণনাত্মক সাধারণ বর্তমান কাল। একটি পঙ্‌ক্তিতে বাক্য সম্পূর্ণ হতে না হতেই পরের চরণে ধ্বনিত হল গুরুগম্ভীর সিদ্ধান্ত 'দস্যুর দলে রোখবার আগে সংহতি চাই'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সময়ের যে কোনো কবিতায় মাত্রাবৃত্তবদ্ধ বাক্যশৈলীর দ্রুত মুভমেণ্ট দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস। অনুরূপ প্রয়াস ভিন্ন তাৎপর্যে বিশিষ্ট হল সমর সেনের গদ্যছন্দে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ তাঁর 'শ্যামলী' মাটির বাড়ির মতো সুন্দর কিন্তু ব্যবহারোপযোগী হল না— সমর সেনের গদ্যছন্দের মাটির বাড়িতে চেনা জীবনের ধুলো বালির সঙ্গে সহাবস্থান। 'প্রাণপণে দেখি ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক'— এখানে 'প্রাণপণে' এই ক্রিয়ার বিশেষণটিতে মধ্যবিত্ত নায়কটির মানসিক অস্থিরতা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। এই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে মূর্ত করতে চেয়ে কবিরা রচনা করেছেন সংহত বাক্যাংশ—কখনো কখনো তা প্রবচন তুল্য সিদ্ধ উক্তি— অরুণ মিত্রের 'জনসাধারণ অসাধারণ' অথবা সরোজ দত্তের 'দুঃসাহসী বিন্দু আমি বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা' এমনই এক একটি উক্তি। ভাষার নতুন অন্তঃসত্তা অবস্থাকে বুঝে নেবার জন্য আগ্রহ কবিদের— আত্মসচেতন কবিদের একটা বড় লক্ষণ। ১৯১৫ সালে যে-সভায় রোমান জ্যাকবসন তাঁর বিখ্যাত পেপারটি পড়েছিলেন— Khlebnikov's (খ্লেবনিকভ'স্) Poetic Language. সেই সভায় মায়াকোভস্কি উপস্থিত ছিলেন। এটা থেকে মায়াকোভস্কির মাধ্যম সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার যে-পরিচয় মেলে

---

১১. মায়াকোভস্কির আত্মহত্যাকালীন ভাষা থেকে এই শব্দটি গ্রহণ করেছি। পুরাতন কাব্যরীতি নয়, পুরাতন জীবন ধারাকে কটাক্ষ করা হয়েছে ঐ বিবৃতিতে।

তা আসলে তাঁর অভিজ্ঞতারই যন্ত্রণা। ১৯৩৫ থেকে ৪৫ এর মধ্যে বাংলা কবিতার বাণীবিন্যাসে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একটি হল 'ইমেজ' এবং এপিথেটগুলির ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব এন্টিথিসিসকে পরিবেষণ করা। বিষ্ণু দে-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তো বটেই জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও এই প্রকরণ লক্ষ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘ কবিতায় যে অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান-রীতি প্রয়োগ সেটাও শুধু মিউজিক্যাল ইমপোর্ট নয়। বিশেষ করে বিষ্ণু দে দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে ধরতে গিয়ে পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট-এর আশ্রয়ী হয়েছেন। এন্টিথিসিসগুলি সম্বন্ধে বিষ্ণু দের চেতনা ক্রমশ প্রকাশ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতি তাঁর কৌতূহল। এতো গেল একদিক। আরেকদিকে দেখি মার্কসীয় বাস্তববীক্ষা থেকে কাব্যের ভাষাজ্ঞানও নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে অর্থে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন— Language anticipates and enacts the altering pulse of material life—সেই অর্থেই এ যুগের কাব্যভাষা ফ্রয়েড-য়ুং-এর মনঃসমীক্ষা এবং মার্কসের ইতিহাস জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে— এ যুগের নাড়ীর স্পন্দনকে প্রতিধ্বনিত করার জন্য। কথ্যভাষার মধ্যেই অকৃত্রিম কাব্য ভাষার বনিয়াদ।[১২] যে কোনো জোরালো মৌখিক উক্তির মধ্যে আছে কাব্যের উপাদান (has in it energies which are political)। কবির ভাষা নির্বাচন ঘটে আত্মসচেতনতার এক বিশেষ স্তরে। সেই আত্ম-সচেতনতা একটা সমগ্র পরিস্থিতির অংশ— গভীরতর তাৎপর্যে অন্বিত। সেই বোধকে আত্মস্থ করেই এযুগের কবিতায় আমরা বাগ্‌ভঙ্গির বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করি।

> All literature— oral or written, lyric or prosaic, archaic or modern— is language in a condition of special use—

যদি একথা মেনে নিই তাহলে বলতে হয় এ যুগের কবিতায় কথ্যস্রোতের লোকায়ত চালের জন্য আকুলতা এক অনন্ত পরিস্থিতির স্বীকৃতি। সমর সেনের কবিতায় 'আর' সংযোগাত্মক অব্যয়ের ব্যবহার আপাত অসম্পৃক্ত বিবদমান বাস্তবতার জন্যই অর্থপূর্ণ। 'আর' সেখানে 'এবং'-এর বিকল্প নয়। 'আর' এখানে 'তদুপরি'। 'ধূসর' শব্দটি বিবর্ণ অস্তিত্বের বিশেষণ-প্রতীক। 'হলুদ

১২. 'Neither thoughts nor language in themselves form a realm of their own...they are only manifestations of actual life.'— K. Marx and F. Engels, The German Ideology 'words are action too'.— Lenin

ঘোলাটে চোখে মোটর এগোয়'— সমর সেনের এই বর্ণনা আর জীবনানন্দের সেই যে মোটরগাড়ি গাড়োলের মতো কেশেছিল— প্রায় এক কথাই জানাতে চায়—যন্ত্র-যুগ যত আমাদের ছকে বেঁধে ফেলছে, তত মনের দিক থেকে আমরা হয়ে যাচ্ছি মন্থর। একজন দৃশ্য দিয়ে আর একজন শব্দ দিয়ে সেই দুঃসহ পুনরাবৃত্তিকে রূপ দিতে চেয়েছেন। ভাষার ঋজুতা ও ভাবনার তির্যকভঙ্গি আধুনিক কবিতায় পরস্পরের সঙ্গে কতটা বোঝাপড়া করে সমর সেনের কবিতায় তার পরিচয় পাই :

> আর হাওয়ায়
> নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপাগন্ধ
> মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার মতো ;

শুধু দুর্জ্ঞেয়তা ও দুর্বোধ্যতার সূত্রে দুটি সুদূর সম্পর্ক— 'অদ্ভুত চাপাগন্ধ' ও 'নিঃশব্দ কান্না' একত্র হল। দুটো মিলিয়ে শুধু দুর্মর নয়, এক দুর্বহ অন্ধকারের অনুভূতি সঞ্চারিত হল। আমরা লক্ষ না করে পারি না জীবনানন্দের কবিতায় 'স্তব্ধতা' নিয়ে আসে নির্জনতার অনুষঙ্গ, সমর সেনের কবিতায় 'স্তব্ধতায়' আসে কর্মহীনতার অনুষঙ্গ। সমর সেনের কাছে অনন্বয় বোধের মার্কসীয় ভাষ্যই মান্য।

বিষ্ণু দের 'ঘোড়া' 'পাখি' 'হরিণ' 'নদী' প্রভৃতি প্রতীক জীবনমান্য হয়ে ওঠে মার্কসীয় বিশ্বভাষ্যকে অবলম্বন করে। গতিশীলতার এই প্রতীকগুলিতে তৎকালীন রিয়ালিটির দ্রুত পটপরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হয়েছে— শুধু তাই নয় এর ফলে নির্মিত হয়েছে বিষ্ণু দের সেই প্রসিদ্ধ কাব্যশৈলী— বিস্তৃতি যেখানে সংহতিতে নিবিষ্ট। "ক্রেসিডা", "ওফেলিয়া", "ঘোড়সওয়ার", "এলসিনোরে" ইত্যাদি কবিতার স্তবক পরিকল্পনা রীতি স্মরণীয়— সেখানে আপাত বিচ্ছিন্ন স্তবকগুলি গ্রথিত হয়ে আছে নায়ক-চরিত্রের টেন্‌শনের সূত্রে। এবং সে টেন্‌শনের মূলে রয়েছে বিষ্ণু দের ছন্দ জ্ঞান—সময়ের ছন্দজ্ঞানের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। বিষ্ণু দের ছয় মাত্রার ছন্দের প্রসিদ্ধি তর্কাতীত। তারপরেই বোধ হয় আমরা উল্লেখ করতে পারি তাঁর সাত মাত্রার বিলম্বিত লয়ে সংকল্পকে এবং প্রতীতিকে গাঢ় করে তোলার গূঢ় রহস্য। একজন মার্কসবাদী কবি—পূর্ণ মানুষ যাঁর অন্বিষ্ট— সাতমাত্রা দীর্ঘতরঙ্গাভিঘাত তাঁর স্বগতোক্তির ভাষা হয়ে ওঠে।

কমিট্‌মেণ্ট এবং এলাইনমেণ্টের প্রশ্নটি চারের দশকের স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক কার্যকারণে আরো জরুরী হয়ে ওঠার ফলে কাব্যের ভাষা কমিটেড

কবিদের কাছে আরো গুরুত্বের দিকে এগিয়েছে। এ যুগে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে সময়ের অব্যবহিত চাপে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ভাষা 'কমিটেড' এই কারণে যে একটা সামাজিক দায়িত্ব তাঁরা নির্বাচন করে নিয়েছিলেন— একথা ফর্মালিস্টদের মতো ভাবেন নি যে,

literature is a language freed from paramount responsibility to inform.

লক্ষণীয় এঁদের ভাষায়— বিশেষ করে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ভাষায় ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদের ব্যবহার।

Man's capacity to articulate a future tense— his ability and need to 'dream forward' to hope make him unique.—

একথা ভাষার ইতিবৃত্তে গুরুত্বপূর্ণ, কাব্য ভাষায় এ গুরুত্বটা প্রতিভাত হয় অন্য ভাবে। সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন বলেছিলেন :

ক. অবশেষে সব সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ
তারপরে হব ইতিহাস

অথবা

খ. তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে,
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।

অথবা

গ. কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখে মুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়।

অথবা

ঘ. সব চুপচাপ : জাগবে হয়তো বোশেখি ঝড়ে

অথবা

ঙ. তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা
জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব।

চ. কবে আমরা জলে উঠব—
সবাই শেষবারের মতো!

ছ. আমরা বেরিয়ে পড়ব
সবাই একজোটে, একত্রে
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জলন্ত আমরা ছিটকে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে;

এই ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের পিছনে শুধু সুকান্তের ভূমিকা নির্বাচনটিই মুখ্য ব্যাপার নয়, দুর্বিষহ বর্তমানের কাছে অসমর্পিত থাকার সংকল্পটিও এখানে প্রধান। তিনি বাক্যে ক্রিয়ার অতীতকাল বেশি ব্যবহার করবেন যিনি জেনেছেন তাঁর বর্তমান তাঁকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে না। তিনি বাক্যের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ বেশি ব্যবহার করবেন, যিনি জেনেছেন বর্তমানের দ্বন্দ্বময় অগ্রগমনের ছন্দকে।

তিন

কবিতা ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনার সাক্ষ্য— সেই ক্রমবর্ধমান আত্ম-চেতনাকে একটি প্রেক্ষণ বিন্দুতে সংহত করে তোলার ব্যাপারে মার্কসবাদ সাহায্য করে। আগের পরিচ্ছেদে আমরা আধুনিক কবিতার চরিত্র-ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। 'চরিত্র ভাষা' কথাটি এখানে ইচ্ছা করেই ব্যবহার করা গেল— কেননা কম বেশি সব কবিতা এক হিসাবে নাট্যকবিতার লক্ষণাক্রান্ত— অন্তত বেশির ভাগ কবিতাতেই একটা চরিত্রের আত্মগত বা বহির্গত উক্তি প্রধান কথা। কাজেই সে ভাষারহস্যের মূল খুঁজতে গেলে বক্তাপাত্রটিকে চিনে নেওয়াটা আরো আবশ্যিক। এইবার আমি বাধ্য হচ্ছি চারের দশকের বাংলা কবিতার একাংশের একটা প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। চারের দশকেই সেই জাতীয় কবিতা প্রচুর লেখা হল যার মূল প্রেরণা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রাত্যহিক আন্দোলন। মার্কসীয় তত্ত্ব যত কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংহত হয়েছে কবিতাও তত আত্মানুসন্ধান পরিহার করে বক্তব্য-প্রধান উদ্দেশ্যবাদী হয়ে গিয়েছে— মার্কস এঙ্গেলস নিজে কিন্তু এ ধর— উদ্দেশ্যবাদকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। এবং লেনিন স্পষ্টই বলেছিলেন:

> Every artist has a right to create freely according to his ideals independent of everything.

লেনিন শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি। মার্কস-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতি সৃষ্টি করে লেনিন আরেকটি কথাও বলেছিলেন :

> The history of all countries shows that the working class exclusively by its own effort, is able to develop only trade union consciousness.

অর্থাৎ সে নিজে নিজে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রচনা করতে পারবে না— তার জন্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ডাক পড়বে। লেনিন যদি সত্যই একথা বিশ্বাস করে থাকেন যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক আইডিয়লজি সৃষ্টি করতে অক্ষম— তাহলে মার্কসকথিত অস্তিত্ব ও চেতনার সম্পর্ক, শ্রেণী এবং ভাবাদর্শের সম্পর্ক মান্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। হয়তো এই সমস্ত এবং আরো নানাবিধকারণে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা প্রশ্ন তীব্রতা পেতে শুরু করেছিল— সত্যই মার্কসীয় ঈসথেটিকস্ বলে কিছু আছে কি না। ১৯৪৭ সালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্ততম সভ্য রজের গারোদি এ প্রশ্ন তুললে তা নিয়ে সর্বত্র তুমুল বিতর্ক-বাত্যা বয়ে যায়। এদেশে তা নিয়ে আলোচনা দানা পাকাতে না পাকাতেই ভারতীয় কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক লাইন বদলে যায়— শুরু হয় পার্টির বহু আলোচিত 'বামযুগ'। বর্তমান আলোচকের মতে এই যুগে কবিতার কাছে আমরা অনেক ভুল দাবি পেশ করেছি। তার ফল হল :

> ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই
> রক্তের ধার রক্তে শুধব কসম ভাই।

লেখা হল পার্টি স্লোগান ধরে :

> আমরা সব বাগনানের বৈনানের চাষিরাই
> সকলে মিলে জোট বেঁধেছি এবার তুমি শোন ভাই
> জমিদারের জোতদারের জুলুম নয়, জমি চাই।

অতি সরলীকৃত কবিতার পাশাপাশি এল অতিসরলীকৃত কাব্যসমালোচনা এই লোকসংগীত উদ্ধৃত করে :

> "নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা।
> এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
> তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
> পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী—

লেখা হল :

"বিষ্ণুদের মতো তথাকথিত 'ভদ্র' কবিরা রচনা করুন তো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি! কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদরা এই প্রাণশক্তি ?"[১৩]

সুখের বিষয় এই পিরিয়ড ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত অর্থে যাঁরা মার্কসবাদী, তাঁরা সকলেই তাঁদের কবিতার চরিত্রে সে-পূর্ণ মানুষকে খুঁজেছেন—যে পূর্ণ মানুষ ছিল মার্কস-এর অনুসন্ধেয়। এঁদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি। বোধকরি পূর্বোক্ত হঠকারী আতিশয্যের প্রতি বিরূপতার স্মৃতি বহন করে অরুণ মিত্র ১৩৮৪-র 'গাঙ্গেয়' পত্রিকার শ্রাবণ সংকলনে পুষ্কর দাশগুপ্তকে এক সাক্ষাৎকারে জানান :

"কমিউনিস্ট ঘোষণার সঙ্গে হয়তো সম্পর্কিত করা যায়, এমন কবিতা প্রথম জীবনে গোটা তিনেক লেখেছি, তারপর আর লিখিনি। তাছাড়া কোনো বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে কবিতা লেখায় আমি বিশ্বাসী নই।"

কিন্তু তাই বলে অরুণ মিত্র নিজ চরিত্র বিসর্জন দেন নি। মার্কস যে সমগ্র মানুষের কথা বলেন, অরুণ মিত্রের কথায় ও কবিতায় তারই ঠিকানা। তিনি বলেন :

"যদি বামপন্থা মানে হয় মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনা, জীবনের সঙ্কট সম্বন্ধে অনুভূতি, নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের চেতনা এবং তা উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, তাহলে আমায় কবুল করতেই হবে আমি বামপন্থী কবি।"

অরুণ মিত্রের কবিতায় লাল ইস্তাহারের টগবগানি আজ আর খুঁজে পাবো না ঠিকই—কিন্তু অডেনের মতো তিনি একদা কবিতা লিখে পরে ভাঁটির স্রোতে

---

১৩. অথচ তখনই এই সমস্ত কুৎসারটনাকে উপেক্ষা করে বিষ্ণু দে-র সাধনা এবং বোধি, প্রেম এবং প্রতীক্ষা একীভূত হয় একটি 'তুমি'-তে :

পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে
কুৎসা শুধু কুয়াসা হবে ভোর
উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।...
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

গা ভাসিয়ে দিলেন,—এমনটা নয়। বরঞ্চ মানুষের বহতা-জীবননদীর ঘোরা-ফেরা, আবর্ত, জোয়ার, চরপড়া—সবটাই তাঁর কবিতায় ফুল ফুটিয়েছে, দীপ জ্বালিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কসবাদ বিষ্ণু দে-কে তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণে সাহায্য করেছে বিচিত্রভাবে। তিনি কলাকৌশল বা টেকনিকের প্রগতিকে বিশ্বাস করেন—তাই জানেন টেকনিকের উৎস শেষ পর্যন্ত জীবন। মার্কসবাদ কিভাবে কবিতা লিখতে হয় তা শেখায় না। সে বিষয়ে টেকনোলজির অগ্রগতির ক্ষেত্রেও যেমন কবিতার ক্ষেত্রেও তেমন উত্তরাধিকারকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর মার্কসবাদ তাঁকে জীবনের জল মাটি শিকড়ের সন্ধানে অক্লান্ত করে তোলে। কলোনির বাবুজীবনের জের-ধরা আমাদের এই ভাঙাচোরা, বহুদিন থেকে প্রতিহত জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষ করেন রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক শুদ্ধতার একক প্রয়াসকে। মার্কসবাদই তাঁকে প্রেরণা দেয় এই প্রয়াসকে এক মহারূপক বলে পরিগণনা করতে। বিষ্ণু দে-র কবিতার চরিত্রপাত্র ট্র্যাজিক অপরাজেয়তায় বর্তমানের সমস্ত নৈরাশ্য, আঘাত, মনোভঙ্গের মাঝখানে পূর্ণতার আদর্শ খুঁজে পায় একদিকে ধ্রুপদী ও লোকায়ত সংস্কৃতির বহমানতায় এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মতোই—প্রকৃতিতে: নিজের মুক্তি এবং কবিতার মুক্তি তখন তাঁর কাছে এক হয় যায়—

> কবিতা কি শুধু ছাপার হরফে মেলে ?
> কবিতার আদি রূপ কবিতার বাহিরে—
> বাঁচাই কবিতা, রুদ্র সে অবহেলে
> মৃত্যুকে মারে জঙ্গলে গ্রাম শহরে।

"মল্লারে ভেজা সবিতা", 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' বিষ্ণু দে।

কবিতার গভীরে, শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি'

হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।
কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন
কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদে ভরে দেয় শিরা
সমস্ত চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে
ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।

তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।
আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।

'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' শঙ্খ ঘোষের এই কবিতার বইটিতে তিনটি গুচ্ছ—'হেতাল', 'লজ্জা' আর 'জন্মদিন'। আমাদের আলোচ্য 'হেতালের লাঠি' প্রথম গুচ্ছের শেষ কবিতা। প্রথম গুচ্ছের নানা লেখায় কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে নাম না জানা যুবকদের কথা, তাদের রক্তের প্রতি সম্মানের কথা, অনিবার্য হয়েছে সেই সব যুবকদের প্রসঙ্গ— 'কয়েকজন যুবা আমায় ঘুম ভাঙিয়ে বলে, এই-যে, আগুন জ্বালব, নেমে আসুন পথে।' এসে গেছেই কোবালম বীচে দেখা

সেই ছেলেটি যে বলেছিল, 'কিছু একটা করতে চাই, মরব না এভাবে বসে থেকে!'—আর সব শেষে এসেছে 'হেতালের লাঠি'র স্বপ্ন। কাব্যগ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রেও হয়তো ভবিষ্যৎস্পর্শী স্বপ্ন।

সুতরাং 'হেতালের লাঠি' আলোচ্য গুচ্ছের স্বাভাবিক শেষ কবিতা। হেতালের লাঠি— কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভয়াবহ রাত্রির অনুষঙ্গ জেগে ওঠে। বাঙালির কাছে সে অনুষঙ্গ দুর্মর, তার ব্যঞ্জনা নির্ভুল। মধ্যযুগীয় ভাবাকর্ষ থেকে কোনো চরিত্র বা ঘটনাকে চয়ন করে আজকের জীবনজটের গূঢ় রহস্যের চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা কঠিন। লোকায়ত মীথকে কাব্যে প্রয়োগ কালে প্রত্নরিচুয়ালের ধূসর মূর্তি থেকে তাকে মুক্ত করতে হয়— অথচ লক্ষ রাখতে হয়, আধুনিক টেন্‌শনের উপযুক্ত অবজেকটিভ কোরিলেটিভ বা বহিরাধারে তা আজও যেন সক্ষম হয় ব্যক্তির ইমোশনকে, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পকে সঠিক পথগামী করে তুলতে। 'হেতালের লাঠি' বলার সঙ্গে আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে যায় একটা মানুষ, যাকে মাথা উঁচু করে তুলে না ধরলে দেখা যায় না। 'বাবরের প্রার্থনা'র কবি চন্দ্রধরকে নায়ক করবেন, এ তো প্রত্যাশিতই। কিন্তু চাঁদসদাগরকে মুখ্য করে তোলার গভীরতর কারণটিও অনুধাবনীয়। চাঁদবেনে সর্বযুগেই এক প্রতীকী পৌরুষের অধিকারী চরিত্র। সে চরিত্র ভবিতব্যের কাছে মাথা নত করে না। মধ্যযুগের একমাত্র চরিত্র চাঁদবেনে যে দেবচক্র অস্বীকার করতে চেয়েছিল। শঙ্খ যখন লখিন্দরকে নায়ক না করে চন্দ্রধরকে নায়ক করেন, কালরাত্রির রূপক দেখেও চাঁদসদাগরকে করে তোলেন দণ্ডধর অতন্দ্র প্রহরী, তখন সে লোকায়ত মীথ আজকের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা একটা অন্য ধরনের আবেগময় সাড়া সৃষ্টি করে। চাঁদবেনেকে দিয়ে সে আমাদের বলে ভয়কে অস্বীকার করতে, দ্বিধাকে জয় করতে। মানবিক সীমাবদ্ধতার মাঝখানে এক অতিমানবিক সংকল্পকে বহন করে যে সব গল্প, মীথ আমাদের কাছে সেই সব বহুকালাগত নির্জ্ঞানস্তরে সঞ্চিত রক্ষিত উত্তরাধিকার বারে বারে পুনরুজ্জীবিত করে।

> We identify with the hero of myth not only because he acts out our unconscious wishes and fears, but also in so doing he performs a continual rite of service for the rest of mankind.

আঠারো পঙ্‌ক্তির এই কবিতাটি দুটি স্তবকে বিন্যস্ত। প্রথমটি আট পঙ্‌ক্তির, দ্বিতীয়টি দশ পঙ্‌ক্তির—এই দুই স্তবকে কবিতাটি সম্পূর্ণ। প্রথম

স্তবকে 'লোহার সিঁড়ি', চাঁদের সংকল্পের স্মারক, সেই কঠিন রাত্রিরও স্মারক। 'কালরাত্রি' শব্দটির মধ্যে যেমন আছে সেই শঙ্কিল রাত্রির নিষেধ, তেমনি আছে একটা আশ্বাস। আবার একটি চ্যালেঞ্জও বটে। প্রায় আশীর্বাদের মতো উচ্চারিত হয়েছে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'ওরা বাসর জাগুক' কথাটি। প্রেমের প্রহর প্রেমের প্রহরই থাক— এই মুহূর্তে যেন কোনো দুশ্চিন্তা এসে ওদের উদ্বিগ্ন না করে। যে কোনো আধুনিক কবিতাই কোনো না কোনো চরিত্রোক্তি। সেই হিসাবে প্রতিটি কবিতাই একটা কাব্যনাটালভ্য সংলাপের সমতুল। এখানে চাঁদসদাগরের হ্রস্ব স্বগতোক্তিতে একটি চরিত্রের স্বতন্ত্র ভাবনা মূর্তি পায়। সে ভাবনাগতি স্বভাবতই সরলরৈখিক নয়। 'কিন্তু বড় ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন কেবলই জড়ায় চোখে'—এই অংশে আধুনিক কালের ছায়া গাঢ় হতে থাকে? চারদিকে নানা চক্রান্ত, যে কোনো শুভ সংকল্পকে আবিষ্ট ও আনত করে ফেলার ষড়যন্ত্র এখন ক্রমশ কুণ্ডলিত হচ্ছে। আধুনিক মানুষের অনপনেয় অনন্বয়ের মূলে রয়েছে সেই চক্রান্ত। যখন কবিতার ভাষা হয়ে উঠছে এ কারণেই গূঢ় ও অন্তঃসত্ত্ব তখনই স্বসমুখ হল এই জটিল কিন্তু বহ্বর্থসঞ্চারী চিত্রকল্প—'নাগিনী পিচ্ছিল অন্ধকারে।' 'পিচ্ছিল অন্ধকার'-কে আরো বেশী ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে 'নাগিনী' শব্দের প্রয়োগে। সাপের সঙ্গেই ক্লেদাক্ত পিচ্ছিলতার ঘৃণার্হ সংযোগ। কবিতাটিতে অন্ধকার পরিস্থিতিতে সমস্ত পিচ্ছিলতা হয়ে উঠে সাপের মতো ক্রূর। সেই সর্পিল পিচ্ছিলতার ফলে 'ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।' কিন্তু এই নাগিনী পিচ্ছিল অন্ধকারেও স্বপ্ন দুর্মর। 'স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি'— কালঘুম মায়াঘুম তার সব অন্ধকার নিয়ে ফিকে হয়ে যায়। এই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মনের নির্জ্ঞান স্তরের সঙ্গে সেতুবন্ধন শুরু হয়। যারা বাসরে তাদের হাতে উত্তরকালের পৃথিবী। কিন্তু তারা পৃথিবী সুন্দরতর করবে নক্ষত্র বিলাসে নয়। তাদের চলার ছন্দে জেগে উঠবে ধান।

উত্তরকালের উজ্জ্বলতার যারা জনকজননী, এ কবিতার নায়ক তাদেরই প্রহরী। প্রহরীর একটা স্বপ্ন থাকলেও—সে প্রহরায় কোনো স্বপ্ন নেই। তা এক জাগ্রত সংকল্প। যে কালঘুম মায়াঘুম একটু আগে চরিত্রটির চোখ জড়িয়ে ধরছিল, সেই ঘুমঘোর যেন উত্তরকালের পথিককে স্পর্শ না করে। 'যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে।' এবার আর 'নাগিনী' শব্দটির জন্ত কোনো চিত্রকল্পী বিশেষণ নেই। আগের স্তবকে নাগিনী নিজেই হয়েছিল চিত্রকল্পের উপাদান। আলোচ্য স্তবকে নাগশক্তি দুর্বল। তখন আর তাকে

চিত্রকল্পে শক্তিমান করে তোলার প্রয়োজন নেই।

সমস্ত কবিতাটির প্রধান স্বরক্ষেপের মূল কথা উত্তরকালের পথিকদের জন্য মমতা। তাদের যাত্রাপথে যেন কোনো ঘুম ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। লক্ষণীয় যে, বারবার এ কবিতায় 'ঘুম' শব্দটি এসেছে: 'কালঘুম' 'মায়াঘুম' শব্দ দুই স্তবকে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় স্তবকের গোড়ায় বলা হয়েছে একটি বিচিত্র কথা— 'আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি।' এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে কবিতাটিতে এত ঘুম ও ঘুম অনুষঙ্গী স্বপ্নের, বা উল্টোদিক থেকে অবসাদের কথা— কেন? সম্ভবত এর উত্তর এই যে ঘুমে জাগরণে মিশেই আমরা সত্যের কাছে চলে যাই। এটা এক প্রতীকী ব্যাপার। ইয়েট্‌স্‌এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা অবশ্যই এক্ষেত্রে— অন্তত এখানে— বলতে ইচ্ছা করে— the moment when we are both asleep and awake তখনই আমরা সৃষ্টির মুখোমুখি হই। তখনই আমরা সজ্ঞান সত্তার সঙ্গে নির্জ্ঞান সত্তার সমস্ত উদ্বেগ, সমস্ত সংশয়ের মিশ্রণ ঘটাই। ব্যক্তিগতই হোক, অথবা ঐতিহাসিকই হোক, হোক তা বিশেষ অথবা নির্বিশেষ,—তখন অম্বিষ্ট মানবীয় শাশ্বত উপাদান। 'মীথ' সেই পরম বাস্তবতার পথ দেখিয়ে দেয়। 'হেতালের লাঠি' কবিতাটিতে চাঁদসদাগরের চরিত্রপ্রতীক এজন্য অনিবার্য। লখিন্দর বা বেহুলার মীথে আজকে রিয়্যালিটির জট ছিন্ন করা যাবে না তা নয়, কিন্তু চাঁদবেনেকে প্রোটাগনিস্ট করে তুললে শুধু প্রজন্মের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া যে সহজ হয় তাই নয়— এক স্বনির্ভর সংগ্রামীকে সামনে রেখে দুপায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা দুরন্ত হয়। যে ঘুমকে এ কবিতায় চাঁদবেনের এত ভয়, সে ঘুমের অপর নাম 'অদ্ভুত আঁধার'— য সারা পৃথিবী জুড়ে নেমে এসেছে। সে ঘুম কোনো অপশক্তির কুহক—'নাগিনী পিচ্ছিল অন্ধকার' 'নিশীথ নগর' 'কানীর চক্রান্ত' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তা নির্দিষ্ট। 'হেতালের লাঠি' তখন হয়ে ওঠে সক্রিয়তার প্রতীক। সে-ই দেয় নিষ্ক্রিয়তা পরিবর্জনের ডাক।

পৌষ, ১৩৯১

বর্ণভেদের চারিত্র নির্ণয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক

এদেশের সামাজিক কাঠামো— বিশেষ তার বর্ণভিত্তিক শ্রম-বিভাগ-নির্ভর গ্রাম-সমাজ (Village community) কতখানি স্বাতসহ ছিল— সে বিষয়ে নানা প্রশংসাবাক্য আমরা শুনেছি— চার্লস মেটকাফের কথাগুলি বহুল উদ্ধৃত। কিন্তু সেই 'রিজিড' সামাজিক কাঠামো এবং আবদ্ধ (closed) সমাজ যে উনবিংশ শতাব্দীতেই উন্মুক্ত (open) সমাজের দু-একটি লক্ষণকে স্বীকার করে নিচ্ছিল— এটাও ধীরে ধীরে আমাদের চোখে পড়তে শুরু করেছে। আবদ্ধ সমাজ ও উন্মুক্ত সমাজের মৌল পার্থক্যটি এই সূত্রে একটু মনে করে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে। আবদ্ধ সমাজে সামাজিক স্তরন্যাসে বর্ণ, শ্রেণী, ক্ষমতার কোনো হেরফের হয় না। উন্মুক্ত সামাজিক বিন্যাসে তারা একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে সমন্বিত হতে পারে। প্রথাগত ভাগে ধরা যাক বর্ণ, শ্রেণী, ক্ষমতা— এই তিনভাগই কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। সেই স্তরন্যাসে বর্ণ— J_1, J_2, $J_3 \cdots$, শ্রেণী— C_1, C_2, $C_3 \cdots$, ক্ষমতা—P_1, P_2, $P_3 \cdots$ এইভাবে বিভক্ত। আবদ্ধ সামাজিক স্তরন্যাসে J_1, C_1, P_1-এর কোনো নড়চড় হবে না। যেমন হবে না J_2, C_2, P_2-এর, বা J_3, C_3, P_3-র। উন্মুক্ত সামাজিক স্তরন্যাসে এই সমন্বয় ভেঙে যেতে পারে। $J_1C_2P_3$ বা $J_3C_1P_2$। অথবা 'Y' বা 'Z'-এর মতো আরেকটা নতুন স্তরও উদ্ভূত হতে পারে। সাধারণত (ব্যতিক্রমের উদাহরণ অবশ্যই আছে) উচ্চবর্ণের গ্রামীণ ব্যক্তিরা ক্ষমতা, ভূসম্পত্তি এবং বর্ণাভিজাত্যের সুবিধা একই সঙ্গে ভোগ করে এসেছেন[1]। বলা যায় উনবিংশ শতকে শহর অঞ্চলে তো বটেই গ্রামেও এই সামাজিক কাঠামোয় ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে। ফলপ্রসূ না হলেও।

তারাপ্রসাদ মুখার্জির 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এর প্রবন্ধে[2] বলা

---

১. Caster Old & New : Andra Betelle (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

২. 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামে প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। বর্ণভেদ বিষয়ে তাঁর নানা ভাবনার বিশিষ্ট নিদর্শন রয়েছে

হয়েছিল, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন ইংরেজ। মনে করি বর্ণীয়, শ্রেণীগত, ক্ষমতাগত ভূমিকাকে বিচ্ছিন্ন করতে আমরা কত নারাজ ছিলাম একথা তারই সাক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যাপারটি লক্ষ করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণীয় আভিজাত্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যে একস্তরে কেন্দ্রীভূত ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ভূমিকায় ('বিজ্ঞাপন') বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, ঐ বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ তিনি তাঁর লেখা 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে প্রবন্ধ থেকে নিয়েছেন। এই কথা তিনি ঐ দুই পরিচ্ছেদে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতবর্ষে আধুনিক সামাজিক বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্যের ফলই শুধু নয়, বর্ণবৈষম্যের ফলও বটে। এই বিষয়টি তিনি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে, বর্ণবৈষম্যের বিষয়টিতে নতুন কালে কেমন নতুন সমালোচনার উপাদান এসে জমছে।

> "আর এক প্রকারের বড়লোক আছে। গোপালঠাকুর 'কন্যাভারগ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত' বলিয়া দুই-চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড়লোক। কেনন, গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শূদ্র, যত বড়লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র আরো দেখেছিলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র জজ হতে পারেন, ব্রাহ্মণের অপরাধের বিচার করতে পারেন— প্রাচীন ভারতবর্ষে তা পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কিন্তু এই ধরনের বর্ণীয় আভিজাত্যের স্বরূপভেদের পরিচয় পাই না। সেখানে 'মৃণালিনী'র মাধবাচার্য থেকে শুরু করে 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী ঠাকুর পর্যন্ত যে-সব ব্রাহ্মণ চরিত্রের অবতারণা তিনি করেছেন, তারা যতটা না বর্ণীয় নেতা তার চেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন সামাজিক-রাষ্ট্রিক নেতা। কোম্‌তে কথিত পজিটিভিস্ট সমাজের পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে তাদের মিল বেশি। কিন্তু একথা স্বীকার করি বঙ্কিম উপন্যাসে এই বিষয় নিয়ে খুব ভাবিত ছিলেন না। যে বর্ণবৈষম্য নিয়ে একদা তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন— এমনকি একথাও বলেছেন যে, তাঁর কথা শিক্ষিতে না বুঝুন, অশিক্ষিতে বুঝলেও কিছু অঙ্কুর দেখা দেবে— সেটা তাঁর উপন্যাসকে কখনো স্পর্শ করে নি।

'ধর্মতত্ত্বে'র ২২তম পরিচ্ছেদে, 'সাম্য' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে। সে সব সূত্রও এই লেখায় ব্যবহার করা হলো।

দুই

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে কোনো মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পিঠে[৩] সাহেবে পাদুকাঘাত করলে তা হয়ে থাকে অপ্রতিবিধেয়— চাণক্যের মতো সে দ্বাদশ সূর্যের তেজে ফেটে পড়তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন যে, প্রেস্টিজ কর্মনির্ভর। কাল বিগুণ বা সগুণ যাই হোক, নতুন শক্তিবিন্যাসের ফলে ব্রাহ্মণের পুরাতন শ্রেণীবর্ণক্ষমতা-ভিত্তিক প্রেস্টিজ এখন আপোষের ভিতর দিয়ে নতুন চেহারা নেবে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেথরের হাতে জমিদারের নায়েব ব্রাহ্মণ হরকুমারের লাঞ্ছনায় আমরা বুঝলাম, নতুন কালে ব্রাহ্মণের বর্ণীয় আভিজাত্য পোলিটিক্যাল ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধূলাবলুণ্ঠিত। তামাসার বিষয় নয়, এটাই বরং বিড়ম্বনার ব্যাপার যে, সেই বর্ণ-অভিজাত মানুষটিও বিদেশী শক্তির সঙ্গে আপোষের জন্যই ব্যস্ত। হরকুমার এবং তার জমিদারের আচরণে আমরা একথার প্রমাণ পাই।

আপোষের ফলও যে কত বিচিত্র হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ দেখান 'গোরা' উপন্যাসের চরঘোষপুর-ঘটনায়। 'গোরা' উপন্যাসের বাঙালি হিন্দু সমাজের উঁচু নিচু স্তরভেদের পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপারের ওপর লেখকের দৃষ্টিপাত আমাদের মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। তা হলো বিশুদ্ধির অভিমান বা সংস্কার রক্ষা। কার হাতে জল খাওয়া যাবে, কার হাতে যাবে না— 'গোরা' উপন্যাসে এ প্রশ্ন একাধিকবার ফিরে এসেছে। গোরার নিজেরই এ বিষয়ে মানসিক বাধা ছিল কত দুর্মর— কেমনভাবে এ থেকে তার মুক্তি হলো. উপন্যাসের সেই বিখ্যাত শেষাংশ আমাদের সকলের মনে আছে। কিন্তু চরঘোষপুরের ঘটনায় এই বিশুদ্ধির অভিমান ধরে— জল-ভাত কোথায় গ্রাহ্য কোথায় নয়— এই বোধের মীমাংসা করতে করতেই গোরার সামনে এবং আমাদের সামনে সামাজিক নতুন শক্তি-বিন্যাসের স্বরূপটি খুলে যায়। পুরনো '$J_1P_1C_1$'-বিন্যাস ভেঙে যাবার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখালেন শ্রেণীস্বার্থের আত্মরক্ষার তাগিদে তা আবার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে: ব্রাহ্মণ মাধব চাটুয্যে ব্রাহ্মণ বলে বর্ণীয় আভিজাত্যের দাবিদার, সুতরাং 'J_1'। সে নীল কুঠির কাছারির তশীলদার, অতএব তিনি 'C_1' না হলেও তাঁর স্থান সেই শক্তি শিবিরেই। দারোগা এবং ব্রাউনলো সাহেবের সহযোগে তিনি 'P_1'-ও বটে।

---

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের (চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, রবীন্দ্র রচনাবলী) "ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধ।

কিন্তু এ আলোচনা, যেহেতু আগাগোড়া উপন্যাস নামক শিল্পবস্তুর আলোচনা, সেই হেতু আমাদের দেখা দরকার উপন্যাসের উন্মোচিত অংশের এই সমাজদৃষ্টির সাহায্যে উপন্যাসের নিহিত অংশের ব্যক্তিবীক্ষণ কোন্ গূঢ়ার্থের সন্ধান দেয়। এগুলির সাহায্যে গোরার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শহুরে ইংরেজি শিক্ষাসম্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্তের অসম্পূর্ণতার চেহারা। 'গোরা' উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে সে-উপলব্ধির সংযোগ নিবিড়। গোরার কারাবাসের ঘটনা কাহিনীকে—তথা গোরার সর্বৈব অন্বেষা ও এই কাহিনীর প্রেমতত্ত্ব দুইকেই গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। চরঘোষপুরের শ্রেণী-বর্ণ-ক্ষমতার নবীভূত ঐক্যরূপ দেখে তীব্রতা পেল তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা বিস্ফোরিত হতে চায় আশু কর্মে। কারাবাস তার ফল। এ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে গোরার উত্তরণ—জীবনার্থের দিক দিয়ে এবং প্রেমের দিক দিয়ে—হতো লেখকের তরফ থেকে আরোপিত মাত্র। কাহিনী কাঠামোর কোনো অংশে বক্তব্যের মূল সুতো ঠিকমতো জড়ানো না থাকলে গোটা কাঠামোটা নড়বড়ে হয়ে যায় এ জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল।

তিন

ছিল শরৎচন্দ্রেরও। তাই 'পণ্ডিত মশাই' (১৩২১ বাংলা সাল) উপন্যাসের উন্মোচিত অংশে তিনি তৎপরতার সঙ্গে আনেন গ্রাম সমাজের বর্ণ-শ্রেণী-শক্তি বিন্যাসের তৎকালীন হেরফেরের চরিত্র। 'কাস্ট্ ডেস্‌পটিজ্‌ম্' কতখানি ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা ('টেম্পারড্ বাই ম্যাট্রিকুলেশন')[8] সমঞ্জস করিয়ে নেওয়া গিয়েছিল, কতখানি যায় নি—বৃন্দাবনকে দিয়ে শরৎচন্দ্র তার পরীক্ষা করেছেন। এক হিসাবে তা গোরার থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গোরা চরঘোষপুরে বহিরাগত। সেখানকার সকল যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ দর্শক সে। বৃন্দাবনের গ্রামসমাজ তার একান্ত প্রাত্যহিক অস্তিত্বের অংশ। গ্রামে কলেরা শুরু হয়েছে। বৃন্দাবন—বর্ণীয় শাসন নেই—শিক্ষাগত অধিকারে এবং সম্পত্তিগত শক্তিতে সে বর্ণীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে বলে ভেবেছিল। তাই বৃন্দাবন তার পুকুরের পানীয় জলে সারা গাঁয়ের লোকই সেখান থেকে খাবার জল তোলে) ব্রাহ্মণ পরিবারের কলেরা রোগীর কাপড়-চোপড় কাচা

৪. Elite conflict in Plural Society.— Twentieth Century Bengal —J. H. Broomfield (Bengal and the Bhadralok পরিচ্ছেদ থেকে)।

বন্ধ করে দেয়। সে কিন্তু এটা পারে দু পাতা ইংরেজি শিক্ষার জোরেই নয়। সে 'বড়লোক' বলেও বটে। অর্থাৎ 'J_2' হলেও 'C_1' বলে বটে। কিন্তু সে যে 'P_1'-এর মধ্যে পড়ে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটু পরেই। বৃন্দাবনের ছেলের করুণ মৃত্যু তাকে অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করতে হলো। উক্ত ব্রাহ্মণদের বর্ণীয় প্রভুত্বের জোরে কোনো ডাক্তার তার ছেলের চিকিৎসা করতে এল না। শরৎচন্দ্র খুব ভালো করে দেখিয়েছেন, ব্যক্তি বৃন্দাবনের স্বাধীন ভূমিকাগ্রহণের চেষ্টা কিছুতেই তার চারপাশের 'রিয়্যালিটি' পরিবর্তিত করতে পারে না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর বেশি আর কিছু করতে পারেন নি। বৃন্দাবনের অভিজ্ঞতা একটা ভালো মানুষের লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা থেকে গেল মাত্র।

১৩২২ বাংলা সালে বেরুল 'পল্লীসমাজ'। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামা ধরে বিচার করলে এই উপন্যাসের তাৎপর্য একটু আলাদা। এখানে ঠিক শ্রেণী-বর্ণের তারতম্য ধরে সমাজবিন্যাসের স্তরভেদ শরৎচন্দ্র দেখান নি। এ উপন্যাসে তাঁর দেখানোর বিষয়— নিজেদের ভিতরের দ্বন্দ্বে বর্ণীয় উচ্চ শ্রেণীর কেমন অধঃপতন হচ্ছে। ব্রাহ্মণ বেণী আর ব্রাহ্মণ দীনু ভটচাজ বর্ণবিচারে একাসন পেলেও আর্থিক স্তর বিচারে এক জায়গায় মোটেই নেই। রমেশ ও বেণীর লড়াইটা বেণীর দিক থেকে আধিপত্য রক্ষার লড়াই। তার কাছে সম্পত্তি রক্ষা ও আধিপত্য রক্ষা একই ব্যাপারের দুই দিক। উপন্যাসের উন্মোচিত স্তরে এটাই ব্যক্ত হল। ব্যক্ত হল না শুধু চরিত্রগুলির তথা উপন্যাসের নিহিত স্তরে এই বিষয়টির অভিঘাত কী এবং কতটা। পটভূমিতে নায়ক বহিরাগত হবার ফলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াটি পুকুরে ঢিল পড়ার মতো হঠাৎ আলোড়ন তুলেছে। এবং তা আলোড়ন মাত্র। ভেতর থেকে গ্রামসমাজ এবং ব্যক্তি চরিত্রগুলিতে কোন্ ধাক্কা এল, কেমন করে এল, নতুন কোন পোটেন্সিয়াল তৈরি হল কিনা তার বিশ্বাস্য বিবরণ নেই। শরৎচন্দ্রের চিঠি থেকে জানি 'পল্লীসমাজ' বইটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে সমাপ্তিলাভ করেছিল নবম পরিচ্ছেদে[৫]। আমরা যা বললাম নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তার থেকে বেশি কোনো অভিপ্রায় ছিল না। দশম পরিচ্ছেদে তারকেশ্বর-সাক্ষাতের ঘটনা থেকে আবার নতুন করে তাঁকে ছক সাজাতে হল। রমা-রমেশের তারকেশ্বর-সাক্ষাত-ঘটনা যে একটু হঠাৎ মনে হয়, একটু ঝাঁকুনি লাগে, তার কারণ এই পুনরারম্ভের উদ্যোগ। পুনরারব্ধ 'পল্লীসমাজ'-এ

৫. শরৎচন্দ্র ; ৩য় খণ্ড পত্রাবলী : গোপালচন্দ্র রায়।

গ্রামসমাজের বর্ণ-শ্রেণী-ক্ষমতার চাপ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার সজাগ ইচ্ছে শরৎচন্দ্রের ছিল। তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়, তিনি বলছেন, বিষয়গুলো প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে বলার মতো। এ থেকে বুঝি, তিনি সমস্যাটিকে সমীক্ষার স্তরে নিয়ে যেতে চাইছেন। 'পল্লীসমাজ'-এর নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নায়ক-কল্পনার যে-ফ্রেম তাকে দিয়ে সে সমীক্ষা হয় না। হলও না। কাহিনীটি রূপান্তরিত হল রমেশের সংকল্পিত সদিচ্ছা ও রমার অসংকল্পিত প্রেমের গল্পে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ক্রমশই অধিকতর সজাগ হচ্ছিলেন। সমস্ত বিষয়টি যে অন্যদিক থেকে দেখা দরকার তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল 'বামুনের মেয়ে' (১৩১৭) উপন্যাসে। এই উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সমাজপট বিষয়ে লেখকের নিখুঁত জ্ঞান। বর্ণ-হিন্দু ও অ-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষক-শোষিত রূপ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা পরিষ্কার। বর্ণ-হিন্দু সমাজপতির শ্রেণীচরিত্রের ও বর্ণীয় মহিমার যোগসাজসের ফলটিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে গোলোক এবং চোঙদারের সংলাপ ও অভিসন্ধি এখানে স্মরণীয়। এই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবটি আসলে একটি চালানদার ব্যবসায়ী। যুদ্ধে তিনি ছাগল-ভেড়া—তারাও 'কেষ্টর জীব'— চালানের 'কন্ট্র্যাক্টো' নেন। গরুতে আপত্তি আছে বটে, কিন্তু খুব একটা নয়। তিনি সুদখোর মহাজনও বটে। অথচ তিনি 'মুখের কথায় বামুনকে শুদ্দুর শুদ্দুরকে বামুনের দলে' তুলে দিতে পারেন। সমাজপতির সামাজিক শক্তির মূল ভিত্তিটা যে বর্ণ-মহিমার উপরে নির্ভরশীল নয়, সেটা এই উপন্যাসের বহির্মহল ও ভিতরের মহল দুই দিক থেকেই দেখানো হল। ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ী হতে বাধছিল না, জমিদারের বাধল না কনট্রাকটর হতে। কাঞ্চন-তৃষ্ণা কিভাবে প্রাচীন কৌলীন্যের রকমফের ঘটাচ্ছে— বিংশশতকের প্রথম পাদের সেই সমাজ বাস্তবতা এই উপন্যাসে ব্যবহৃত হল। এ গল্প মহেশের গল্প নয়, তাই সন্ধ্যাদের শেষ গন্তব্য হয় না শিল্পাঞ্চল— হয় বৃন্দাবন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ক্রমশই উপরতলার সদিচ্ছুকদের তরফ থেকে দেখার ভঙ্গিটা পরিহার করে নিচের তলার মানুষদের জীবনের প্রত্যক্ষ ভূমিতে নেমে আসতে চেয়েছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সখ্য ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছিল। ১৩২৮-এ তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হয়। রাজনীতিতেও তিনি প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। এই সময়ের গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'। 'মহেশ' আগে বেরোয়— 'বঙ্গবাণী' / আশ্বিন ১৩২৯, 'অভাগীর স্বর্গ' বেরোয় ঐ বছরই ঐ পত্রিকায় মাঘ মাসে। বর্ণবৈষম্য এবং জমিদার-প্রজার সম্পর্ক এই

দুটি গল্পেরই ফ্রেম। বর্ণহিন্দু জমিদার এবং একটিতে মুসলমান ও অন্যটিতে 'দুলে'— প্রকৃত প্রস্তাবে ভূম্যধিকারবিহীন বাঙালি প্রজার সম্বন্ধ-স্বরূপটি এই গল্প দুটিতে উন্মোচিত হয়েছে। দুটি গল্পের সাদৃশ্য অবিস্মরণীয়। দুটি গল্পেই বর্ণীয় স্বৈরাচার এবং শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারকে এক মোড়কের ব্যাপার বলে দেখান হয়েছে। দুটি গল্পেই জমিদারের কাছারির আমলাদের ছবি একরকম। তর্করত্নকেও তার মধ্যে ধরে নেওয়া হল। কারণ তিনি আমলা না হলেও জমিদারের অন্যতম স্তাবক। দুটি গল্পেই বিষয় কতকটা এক মানবিক দুর্দশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও গফুর এবং কাঙালীচরণ দুজনেই, যে-ভালবাসা শুধু মানুষই বাসতে পারে, তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে। সে চেষ্টার ব্যর্থতার ফলে কম বেশি দুজনেই গ্রাম থেকে ছিঁড়ে যাবার পথে পা বাড়াল। মিল আরো আছে। একটা করে সজীব গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভূমি-স্বত্ববিহীন গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণ কাহিনী। গোচারণ জমি— যা গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত— তা জমিদার বিলি করে দেয়। নিজের উঠোনের গাছে কুড়ুল বসাবার হক্ প্রজার নেই। বর্ণীয় আভিজাত্যের শীর্ষাসনটি জন্মসূত্রে দখল করে তারই বাবদে শ্রেণীগত ও ক্ষমতা-গত আধিপত্য এক করে ঘুলিয়ে নেওয়া— শরৎচন্দ্রের এই দুটি গল্পে কিছুই বাদ যায় নি। গফুরের মহারানীর দোহাই, সাশ্রু কাঙালীচরণের অধিকার ঘোষণা —এই ন্যূনতম সিভিল লিবার্টির সাধ— '$J_1 C_1 P_1$'-এর ধাক্কাতে গুঁড়ো হয়ে গেল— মিল এখানেও। কিন্তু একটা গুরুতর অমিলও আছে বটে। 'মহেশ' গল্পে গফুর প্রথম থেকেই পরাস্ত, পর্যুদস্তচিত্ত। মহেশের সঙ্গে তার, দুঃখ-দুর্দশা মেনে নেবার ব্যাপারে প্রায় কোনো তফাত নেই। কিন্তু কাঙালীচরণের গল্প তা নয়। সমানাধিকারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ গল্পের মূল কথা এবং সে আকাঙ্ক্ষা কোনো ইংরেজি পাঠশালা থেকে কেতাবী বুলি মারফত আসে নি। সেটা এসেছে একান্ত ভারতীয় জীবনের নিজস্ব অন্ধিসন্ধি থেকে। শুধু যে আকাঙ্ক্ষাটা এসেছে তাই নয়— আকাঙ্ক্ষাকে সফল করার জন্য মায়ের ব্যগ্রতা এবং ব্যাটার প্রাণপণ চেষ্টা দুটোই লক্ষ করার বিষয়। কাঙালীচরণ বয়সে কাঁচা বলেই অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— ভাবে নি প্রতিকূলতা কত কঠিন। কত নিষ্ঠুর! বিষয়টি নিয়ে এক-একটি ভাবনা-সংহত মুহূর্ত রচনা করেন শরৎচন্দ্র এইভাবে—

"কুটির প্রাঙ্গণে একটি বেলগাছ, একটি কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে

ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল ; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস ?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ, দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন ?"

এই গোলমালে একটা ভীড় জমে গিয়েছিল। তারা কাঙালীর ব্যাপারে দরদী হয়েও বলল, বিনা অনুমতিতে গাছ কাটতে যাওয়া ঠিক হয় নি।

প্রজাস্বত্বের এমন চেহারা বাংলা গল্পে-উপন্যাসে আমরা আরেকবার দেখেছি। তা হলো তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে। ঐ উপন্যাসেও এমনই একটা গাছকাটার বর্ণনা রয়েছে। ঈদ সামনে। রহম শেখ একটা তালগাছ কেটেছিল, বিক্রি করে দেবে বলে।

"গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তাহার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল। ...এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনোদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকায় ঠেকিয়াছে। ...একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। ওই গাছটার স্বামিত্বের কথা। তিন পুরুষের মধ্যে স্বামিত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই।...তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুযে বাবুকে। ...রহমের বাপ জমি বিক্রি করিবার পর বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য বন্দোবস্ত লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে, রহমও চষিতেছে। কোন দিন একবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই যে, জমিটা তাহাদের নয়।"

'গাছটা তাদের নয়' এ কথা রসিক বা কাঙালীরও মনে হয় নি। ঘটনাংশের এই সামান্য মিলটুকু মনে রেখে একটা কথা এখানে বলার আছে। তারাশঙ্কর এ জাতীয় ঘটনা-চিত্রণের বেলায় ব্যাপারটিকে দিতে চেয়েছেন 'বাবু' এবং 'অ-বাবু'-দের সংঘাতের রূপ।[৬] গ্রামীণ উচ্চশ্রেণী আর শহুরে উচ্চশ্রেণী তাঁর জনতার কাছে 'বাবু' অভিধায় মধ্যে এক হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র যেমন 'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে গ্রামীণ-পুরোধা (রুর‍্যাল এলিট)-দের শ্রেণী ও বর্ণীয় ভূমিকা দুয়ের ওপরই সমান জোর দেন—তারাশঙ্কর সেক্ষেত্রে 'বাবু' 'অ-বাবু'-র প্রশ্নকেই সামনে আনেন। এতে তারাশঙ্কর কিছু ভুল করেন না। শুধু

৬. অ-বাবু না বলে 'অ-বর্ণহিন্দু' জাতি, যেমন বলেছেন মহাশ্বেতা দেবী, তাও বলা যায়।

সওয়ালের তীক্ষ্ণতা একটু কমে যায় বলে মনে করি। ছেলে বলদের সঙ্গে বাঙালি চাষির সম্পর্ক কতটা বাস্তব মানবিকতার ওপর স্থাপিত, ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে সে-সম্পর্ক যে মাত্র প্রথাগত সংস্কার— 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র সেটাও দেখিয়েছেন। আমাদের মনে পড়েই 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের তিনকড়ি-রহমশেখের গরুর ঘটনা। তিনকড়ির গরু কঙ্কণার বাবুরা ধরে বেঁধে রেখেছিল। তিনকড়ি আর রহমশেখ দুজনে ছুটেছিল সে গরু ছাড়িয়ে আনতে। রহম বাবুকে বলে—'গরুটাকে মেরা্যা জখম কর‍্যা দিছ শুনলাম? হিন্দু বেরাম্ভন তুমি?' কিন্তু উক্ত বাবুদের ব্রাহ্মণত্বের বিষয়টিকে সামনে আনার চাইতেও তারাশঙ্কর রহম আর তিনকড়ির সামনে আনতে চাইছেন এক নতুন ব্যবসায়ী চরিত্র— আরো চতুর, আরো নাগরিক পরিশীলনে দুরস্ত, কিন্তু আরো বিচ্ছিন্ন। এঁরা কলকাতায় থাকেন। ধান বেচে দিতে মফস্বলে এসেছেন। সুতরাং গরীব গ্রাম্য চাষির কাছে কসুর কবুল করতে তার বাধে না। তা বলে তিনি চাষিদের ধান ধারও দেবেন না—সুদ পেলেও না— 'ওসব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি'। চাষি হিন্দু-মুসলমান অবাক হয়ে যায় নতুন এই বাবু মানুষকে দেখে। বাবুর উপকারের পুণ্যে লোভ নেই, সুদের টাকায় লোভ নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মণটির মতো বাবুটির কোনো রূপলও নেই— 'ভালোতেও সে নেই, মন্দতেও সে নেই।' এই ভদ্রলোকই ক্ষতিকর বেশি। 'গণদেবতা'-অংশে জেনেছি আলিপুরের রহমৎ শেখ আর কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্জে একযোগে ভাগাড় দখল করেছে চামড়ার ব্যবসা করবে বলে। 'বামুনের মেয়ে'-তে গোলোক চাটুয্যে গরু চালানের ব্যবসায়ে টাকা খাটানো সঙ্গত হবে কিনা একথা দুঃখের সঙ্গে বিবেচনা করেছে— তার এক দশক পরেই 'রমন্দ চাটুজ্জে'-রা চামড়ার ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। বর্ণীয় মহিমা নয়, শ্রেণী-মহিমাই তখন হয়ে উঠেছে কাম্য ও লভ্য। এবং তারা আর গ্রামবাসীও থাকছে না। 'গণদেবতা'-র অনিরুদ্ধ কামারদের অনেক আগেই তারা-ই বেরিয়ে পড়েছে গ্রাম ছেড়ে, শহরের দিকে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্যাটার্নের রূপ-বদলের ব্যাপারে তাদের ভূমিকাও কম নয়।

আগেই বলেছি তারাশঙ্করের গল্পে বর্ণাভিমানের বিষয়টি সামনে আসে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু পটকে সেটাই মুখ্যভাবে অধিকার করে না। তারাশঙ্করের গল্পে প্রধান হয় নিচের তলায় মানুষের একক ব্যক্তির আত্মমর্যাদার অভিমান। এটাকে তার ব্যক্তি-অভিমান বলা যায়—তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ-রূপও বলা যায়। তাই 'আপনি-তুমি-তুই'-এর

ব্যাপারটিকে তারাশঙ্কর খুব চমৎকার ব্যবহার করেন। এতদিন পর্যন্ত 'আপনি-তুমি'-র হেরফের বাংলা গল্পে প্রেমের ঘনীভবন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেই কাজে লেগেছে— তারাশঙ্কর এটাকে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যে প্রয়োগ করলেন। প্রেমের ঘনীভবনে আপনি থেকে তুমিতে অবতরণ কাহিনীকে কতখানি ভেতরের দিক থেকে গতিশীল করে তোলে, কতখানি তা নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে 'গোরা' উপন্যাসের সাতান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদটি তার নিদর্শন। তারাশঙ্করের 'আপনি-তুই'-এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া যায় 'গণদেবতা' উপন্যাসে দেবুর সঙ্গে সেটেলমেন্টের কানুনগো 'তুই তোকারি' করেছিল। এর জবাবে দেবুও কানুনগোকে 'তুই তোকারি' করে জুতসই জবাব দেয়। কানুনগো সরকারি কর্মচারী, হয়তো ইংরেজি শিক্ষিত— দেবু গ্রাম্য পণ্ডিত হলেও চাষির ছেলে। কানুনগো ইংরেজি শিক্ষিত এবং শহরবাসী বলে দেবুর ঘরে জল খেতে পারে— কিন্তু দেবুকে সে 'আপনি' বলতে পারে না। গাঁয়ের 'বাবু' ক্লাসটাই পারে না। দেবুই কি পারে গ্রাম্য পুরোভাগীদের 'বাবু' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে? কানুনগো-ঘটনাই তো তার অভিজ্ঞতায় প্রথম দাগ ফেলে নি। তার আগে পুলিশের এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর তাকে 'তুই তোকারি' করেছিল। 'চাষির ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম'— কাজেই সে তার ব্যক্তিত্বের অধিকারে সমানাচরণ দাবি করে— পায় না। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো ম্যাজিস্ট্রেট তাকে 'আপনি' বলে বটে— কিন্তু সেটাও ব্যতিক্রম। কিন্তু এ বিড়ম্বনার বীজ তো দেবুর মনের মধ্যেই। সে যখন নিজের চাষি-বাবার জমিদারের হাতে লাঞ্ছনার কথা ভাবে, তখন সে জমিদারকে 'বাবু' বলেই অভিহিত করে। অর্থাৎ সে বিশ্বনাথের সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও— ইংরেজিতে দরখাস্ত লিখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে জানে জমিদার—এবং হয়তো ব্রাহ্মণ— 'বাবু' অভিধার জন্মগত অধিকারী এবং সে আর সকলের মতো অ-বাবু।

তবু আত্মসম্মানের দাবিতে মাথা চাড়া দিচ্ছিল গ্রাম-সমাজ। কিন্তু সেটাও পুরোনো আর্থিক বাঁধন ছিঁড়তে পারার আগে নয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র করালী-হেদো মণ্ডল ঘটনা এখানে স্মরণীয়। হেদো মণ্ডল যেই বলেছে করালী সম্বন্ধে 'তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে'— 'করালী ভুরু কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হলে হয়তো ভুরু কুঁচকেই মাথা হেঁট করে চলে যেত, কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল— উ কি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দর নোকের উ কি কথা!' বনওয়ারীর নিজের ভাষাতেই করালীর এই প্রকার বিস্ময়কর আচরণের

চূড়ান্ত ব্যাখ্যাটি মেলে—'ওই চন্নপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ দিলে।'

তবু 'বাবু' একটা অর্থনৈতিক পরিচয়ই বটে। শ্রীহরি পাল 'ঘোষ' হবার জন্ত সচেষ্ট ছিল—বাবুত্বের দিকেই ছিল তার অভিলাষ। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ন্যায়রত্নের কাছে শ্রীহরি ঘোষ গিয়েছিল দেবুকে পতিত করার ব্যাপারে—ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলেছিলেন—'কঙ্কনার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহামহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো একজন উপাধ্যায় হে!' ন্যায়রত্ন সামাজিক মর্যাদায় কোনো 'বাবু'র চেয়ে নিচে নন। কিন্তু তিনিও নতুন কালের গ্রাম-নাগরিক এলিটদের প্রসঙ্গে 'বাবু' শব্দটিই ব্যবহার করেন। পৌত্র বিশ্বনাথ একটু কটুভাবে হলেও এক দিক দিয়ে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা মন্দ দেয়নি—

> 'দেশে' নতুন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হলো, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজপতির বংশ বলে আমাদের, তখন যাত্রাদলের রাজার কথা মনে পড়ে।

কিন্তু পুরো ব্যাখ্যা বোধ হয় মেলে না ন্যায়রত্নের ট্রাজিক প্রস্থানের মধ্যে। তারাশঙ্করের ট্রাজিক চেতনা আরিস্ততলীয় ট্রাজেডি চেতনার ফল। তা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে অনুধাবনের ফল নয়। তবু তারাশঙ্করের পক্ষে একটা কথা বলার আছে। শরৎচন্দ্রের গ্রাম-সমাজ অনুধাবনের অপূর্ণতা কোথায় ন্যায়রত্ন চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তা দেখিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক-সামাজিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে তার খাপ খাওয়াতে না-পারার-বিষয়ও পরিষ্কার করে তুলে ধরা হলো। গোড়া কেটে দেওয়া বটগাছের অথবা নিজ বাসভূমে নির্বাসিত রাজার আত্মস্থঅন্তরাগ মূর্তি ধরেছে ন্যায়রত্নে। নিঃসন্দেহে প্রস্থানের করুণ অর্থগৌরবে লেখক সে মূর্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অথচ এ অভিযোগ আমাদের যায় না যে, তারাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' (এবং পূর্বগ রচনা 'গণদেবতাতে'ও) ন্যায়রত্ন উপবৃত্তকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন নি। শ্রীহরি ঘোষ দেবু-বৃত্তই এ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রধান বৃত্ত। ন্যায়রত্ন-বিশু-বৃত্ত বেশ খানিকটা দূরগত এবং পরোক্ষও বটে। সে বৃত্তটা দেবুকে মাঝে মাঝে গিয়ে ছুঁয়ে আসতে হচ্ছিল। তবে কি তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন, সে বৃত্তটা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারণ সংযোগে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক?

চার

আবার মনে হয়, বুঝিবা তারাশঙ্কর বর্ণ এবং শ্রেণীর ভিতরকার জটিল সম্পর্কটি ভেদ করার জন্ত মোটেই ব্যস্ত নন। তার চেয়ে বোধ করি তাঁকে বেশি টানে বর্ণীয় স্বাধিকারের ও মর্যাদা-আদায়ের প্রশ্ন। তখন আবার 'বাবু' কথাটি শ্রেণীবাচক না হয়ে বর্ণবাচক হয়ে যায়। 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫) উপন্যাসটিতে তার প্রমাণ আছে। প্রথমত লক্ষণীয় বর্ণীয় ডিটারমিনিজমের বিরুদ্ধে সীতারাম পণ্ডিতের লড়াই। 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে'র দেবু এবং 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম— এই দু'জনেরই 'পণ্ডিত' উপাধি কর্মবাচক। কিন্তু এই উপাধিটির জন্ত দেবুর পরোক্ষ এবং সীতারামের প্রত্যক্ষ বাসনা ছিল। সীতারামের পাঠশালা প্রতিষ্ঠার লড়াই প্রকৃত প্রস্তাবে তা নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াই। এর সঙ্গে সে যুক্ত করে নিয়েছিল গ্রামীণ ভদ্রলোক শ্রেণীর বর্ণীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অসম্মানিত 'অ-বাবু'দের পক্ষের মর্যাদা আদায়ের প্রশ্নটি। পাঠশালা বসানোর ব্যাপারে জ্যোতিষ সাহাকে রাজি করানোর জন্য সীতারাম যে-সব যুক্তি দিয়েছিল, তার সব শেষেরটি ছিল সব থেকে লক্ষ্যভেদী—'তা ছাড়া এ হবে আপনাদের ছেলেদের জন্তে পাঠশালা. বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে আপনাদের ছেলের তফাত থাকবে না। অসম্মান হবে না আপনাদের।' বর্ণীয় স্বৈরাচারের সম্বন্ধে তিক্ত স্মৃতি রয়েছে জ্যোতিষেরও, সুতরাং সে 'চকিত হয়ে মুখ তুললে. স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রথমে সীতারামের মুখের দিকে, তারপর সামনের দিকে ওই আলো-ঝলমল পুকুরের দিকে।' কিন্তু জ্যোতিষও জানে, আমরাও জানি, এই সমস্ত আবেগ শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক হবার আবেগ। ইংরেজি লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে 'এডুকেশনাল মিড্‌ল ক্লাশ' গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা তাদের মধ্যে প্রবল। জ্যোতিষ লক্ষ করেছে, তাদের ঘরের ছেলে এম.বি.বি. এস. পাশ করলে আর 'জল-অচল' থাকে না— সুতরাং পাঠশালা দরকার লেখাপড়ার পথে অগ্রসর হবার জন্ত, গ্রামের এস্‌টাব্‌লিশমেন্ট বাধা দিলেও দরকার। তারাশঙ্কর অবশ্য তাঁর কাহিনীকে এই আবর্তের মধ্যে ফেলে রাখেন নি। বৃহৎ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা-তরঙ্গের তাড়নায় সে আবর্তকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু 'বাবু'দের স্কুল বনাম 'অ-বাবু'দের পাঠশালার ব্যাপারটি উপন্যাসের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে। 'ন চাষা সজ্জনায়তে'— এই কুৎসিত ছড়াটি উচ্চারণ করেছিল গ্রামের বাবুরা। মাতাল ভদ্রলোক বলেছিল— 'চাষা পণ্ডিত অ্যাণ্ড শৌণ্ডিক ছাত্র! কাগজং কলমং খরচং মাত্র।' সীতারামের উচ্চারণ-রীতির গ্রাম্যতা বাবুদের কাছে বিদ্রূপের

বিষয় হয়। সীতারামের পাঠশালাকে 'ইতরতম উপায়ে ময়লায় পরিপূর্ণ করা' হয়েছে। গ্রাম্য দরখাস্ত ছাড়া হয়েছে রাজনৈতিক অভিযোগ সৃষ্টি করে তার পাঠশালা অচল করে দেবার জন্য। এ সবই বাবুদের স্যাবোটেজ অ-বাবু-দের আত্মোন্নয়ন প্রয়াসে।

কিন্তু এটুকুই সব নয়। প্রচ্ছন্নভাবে তারাশঙ্কর প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন একটা মধ্যবিত্ত অভিমানকেই। সদ্‌গোপ শিক্ষকমশাইকে দেখে বাবুদের ছেলেরা নমস্কার করলে তা হয় অনুপ্রেরণার বিষয়। ধীরাবাবুর মা সীতারামকে প্রথম অভ্যর্থনার দিন ভূম্যাসন পরিহার করে জমিদার প্রজার সম্পর্ক ভুলতে নির্দেশ দিলে, অথবা দেবু, শ্যামু, সীতারামকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে আবহাওয়ায় একটা বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি হয়— নানা ঘটনা বিপর্যয়ের পর দেবুকে মা সীতারামের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলে, অথবা মণিবাবু তার পৌত্রকে সীতারামের কাছে লেখাপড়া শেখার জন্য নিয়ে এলে সেটা সীতারামের জয়ের দিন বলে প্রতিভাত হয়। এ-সমস্তের কোনোটাই 'ভদ্রলোক' জীবন-বৃত্তের গড়ন ভেঙে ফেলার ব্যাপার নয়— ভদ্রলোকের বিকার সংশোধনান্তে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর আয়োজন। বর্ণীয় অভিমান থেকে মুক্ত হবার জন্য তারাশঙ্করের ব্যস্ততা কম নয়। তাই উপন্যাসে তিনি বারবার আনেন তৎপ্রাসঙ্গিক ঘটনা। ধীরাবাবু কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করেন, বামুনের বাড়ির ঝিয়ের ছেলে জয়ধর বৃত্তির পর বৃত্তি পেয়ে প্রবল ভদ্রলোক বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মানুষ হয়ে যায়। কোতাল ঘোষার কায়স্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক বংশের বালক ছাত্রকে অশিক্ষকোচিত ব্যঙ্গ করলে সেটা ব্রাহ্মণ কায়স্থের ব্যাপার হয়ে যায়। পুলিশ সাহেব বৈদ্যবংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সন্দীপন মুনির নাম জানে না দেখে সীতারাম বিস্মিত হয়— ভাবে না, বোঝেও না যে এর সঙ্গে বৈদ্যবংশের সন্তান হওয়া না-হওয়ার কোনো প্রশ্ন জড়িত নেই— ওটুকু পুলিশ সাহেবের সমাজ লক্ষণ! বইটা শেষও হল সীতারামকে ধীরানন্দের নমস্কার করার ভিতর দিয়ে।

অথচ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের প্রশ্নটি ব্যবহৃত না হলেও গরীব-বড়লোকের ব্যবধান-চেতনা এই উপন্যাসের চরিত্রদের মুখ থেকে শোনা গেল। পলাশবুনির বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই ব্রাহ্মণ হয়েও চমৎকার ব্যঙ্গে বর্ণ এবং শ্রেণীর ভেদাভেদের জটিলতা ধরে দেন—'শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণঃ গতি! বাবু-ব্রাহ্মণ আর পাঠশালার পণ্ডিত ভিখারী ব্রাহ্মণ তো এক নয়।' সীতারামও সেই ভেদের কথা জানে না এমন নয়। ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে তার বলে উঠতে ইচ্ছে

করে— 'ওরে তোরা বাবুদের ছেলে, তোদের ঘরে ভাত আছে, সিন্দুকে টাকা আছে। মান-ইজ্জত দালান কোঠার ইঁটে-চুণে চাপা হয়ে মজুত আছে, তোদের এতে দরকার কি? কেন গরীবদের ছেলের পড়ায় ব্যাঘাত করিস?' কিন্তু এ চেতনা কখনোই যে পূর্ণ একটা আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ, সীতারামের সাধনার লক্ষ্যও তো 'বাবু' তৈরি করা!

'সাঁওতালরা ক্রীশ্চান হয়ে লেখাপড়া শিখে ডেপুটি হয়েছে, সে শুনেছে। এই সব ছোট জাত বলে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গবর্নমেন্টের ঘরে ভাল চাকরি পায়। কোনরকমে একজনকেও যদি সে সেই রকম করে তুলতে পারে, তবে তার আশা পূর্ণ হয়।'

সীতারাম নিজে বাবু হয়নি, কিন্তু বাবু সৃষ্টি করার লোভ সে সংবরণ করেনি, করতে চায়নি— বাবুত্বের হাতছানি কত দুর্মর এ তারই এক প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের থেকে তারাশঙ্করের পটজ্ঞান অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ, অনেক বেশি ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ[১]— কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিষয়জ্ঞান স্পষ্টতর। বিশেষ ক্ষুদ্র পরিসরে তা তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী। পরিবর্তনের মোচড়গুলি গ্রামের কোন্ অংশে কেমন ভাবে লাগছে— তারাশঙ্কর তা সবচেয়ে ভাল বলেন। কিন্তু সে পরিবর্তমান শিবির সন্নিপাতে 'আমার স্থান কোথায়' এটা বলতে শরৎচন্দ্রের কোনো দ্বিধা ছিল না।

পাঁচ

তবু মনে হয় বাঙালি ঔপন্যাসিককে তথা তার চরিত্রপাত্রকে ১৯৫৪ সালে এস্টেট এ্যাকুজিসন এ্যাক্ট পাশ হবার অনেক পরে এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় পারিবারিক জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশক আইন তৈরি হবার পরেও অবস্থাটার পুরনো জট ছাড়াতে সমান বেগ পেতে হচ্ছে। একদিকে 'সানা বাউড়ির কথকতা'র মতো গল্পে সমরেশ বসু অব্যর্থভাবে দেখান 'বাবু-অ-বাবু' কোন বিস্ফোরণমুখী অবস্থার মুখোমুখি, অপর দিকে বিপ্লবী কালী সাঁতরার (অগ্নিগর্ভ / মহাশ্বেতা দেবী) জীবনের গোধূলিবেলার চিন্তা এই জটের সামনে

১. তারাশঙ্করের সমাজবীক্ষার সঙ্গে মার্কসবাদের সামীপ্য থাকলেও ব্যবধান যে দুস্তর— সে সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ পেয়েছি শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের 'সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস: চৈতালী ঘূর্ণি' নামক আলোচনায় (এক্ষণ / পূজা সংখ্যা—১৩৮২)।

দাঁড়িয়ে দিশাহারা— 'ব্লকের কুয়ো থেকে ডোমরা জল নিতে পারে না দেখলে, অথবা বিধবা সহকর্মিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম্য স্কুল থেকে নিত্যজীবন দলুইকে বিতাড়িত হতে দেখলে (বিধবাটি বামনী) কালী সাঁতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলোই বিফল হয়েছে' অথবা 'মনে হচ্ছে, জাতিভেদ ও ছুত-অছুতের মতন মৌল সমস্যার সমাধানই করা হয়নি যখন, তখন বিপ্লব ও সমাজবাদ বড্ড বড় কথা, বড্ড দূরের স্বপ্ন. তার আগে নিজের জেলায় সকল জাতের জন্যে বহু কুয়ো দেখতে পেলে শান্তি হত।' ভারতীয় উপন্যাসকে বারে বারে নতুন নতুন তাগিদ নিয়ে ও তাগদ নিয়ে[৮] এই জটের মোকাবিলা করতে হবে।

৮. 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্য এবং নানা উপন্যাস, গল্প।

পুতুলনাচের ইতিকথা, পুনর্বিবেচনা

পঁচিশ/এগারো/উনষাট দিনাঙ্কে বিষ্ণু দে-র বর্তমান লেখককে লেখা একটি চিঠিতে দেখতে পাই মৃদু তিরস্কারের ছায়া— শশী কি অতখানি প্রতিভূস্থানীয় ? তাঁর এ মন্তব্যের কারণ, যতদূর মনে পড়ে, কোনো পূজা সংখ্যায় লেখা আমার একটি প্রবন্ধ। সময়ান্তরে কিছুকাল পরে পরে প্রায় মনে হয়েছে আমার বক্তব্যটিকে আরেকটু বিস্তারিত করি, শশী কতখানি তখনকার বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি, সে বিষয়ে ভাবনার ভগ্নাংশগুলি গেঁথে ফেলি। মাঝখানে ইচ্ছেটা আরো জোর পেয়েছিল শ্রীঅশ্রুকুমার শিকদারের তেরশ উননব্বই-এর শারদীয় 'মহানগরে' লেখা মানিকবাবু বিষয়ে প্রবন্ধটি পড়ে। তারপর মণীন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছ থেকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র বিষয়ে লেখার জন্য যখন ডাক পড়ল তখন বুঝলাম শশী আজও আমার কাছে একই সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ও আমন্ত্রণের বার্তাবহ। আজ আর আমি শশীকে তিনের দশকের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক মন্থরতার তথা অমীমাংসার ও সর্বৈব দ্বিধার প্রতিনিধি বলে ততটা মনে করি না। আজ আমি একালের তরুণদের সঙ্গে এই কথায় সায় দেব যে শশীর সার্বিক অমীমাংসক বিমুখতা একান্তই প্রাতিস্বিক ঘটনা। শশীকে কিছুটা প্রত্যাখ্যানের কারণ হয়তো এখানে। কিন্তু তাই বলে শশীর আকর্ষণও কিছু কম নয়। শশীর দুরবগাহ গহীনতাই সেই টানের কারণ।

উনিশশো ছত্রিশে যখন শশী-কল্পনা মানিকবাবুর প্রেক্ষাপটে পূর্ণতা পেয়েছে, তখন তিনের দশকের স্রোতসঙ্কট কাটেনি। বত্রিশের আন্দোলনের মূষিকপ্রসবের ফলে মধ্যবিত্ত স্বপ্নের ভাঙা ডিম যে জোড়া লাগতে ব্যর্থ, তার প্রমাণ রয়েছে ঠিক সেই সময়ের বাংলা উপন্যাসের নায়ক ব্যক্তিত্বের আয়তনদৈন্যে। এই আয়তনদৈন্যের ক্ষতিপূরণ ঘটতে পারতো যদি চরিত্রপাত্রগুলির অন্তর্গূঢ় আততির জটিলতায় বস্তুবিশ্বের জটিলতার পাঠ-নির্দেশের কোনো দার্শনিক ইঙ্গিত থাকতো। এই সময়ের সমস্ত উপন্যাসের ভিত্তিতে যদি কোনো ন্যূনতম

উপন্যাসতত্ত্বও রচনা করতে হয় তাহলে বলতেই হয়— কর্মৈষণা ব্যতিরিক্ত ভাবনালীনতার বিড়ম্বনা এ যুগের উপন্যাসের চরিত্রপাত্রে ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে এ যুগের কোনো ঔপন্যাসিক এই অনিবার্য অসঙ্গতির দায় এড়াতে পেরেছেন সেখানে প্রকৃতির মতো কোনো নিত্য সজীব নিরাময়তাই হয়েছে তাঁর আশ্রয়। কিন্তু প্রকৃতি যত বড় আশ্রয়দাত্রী হোক না কেন, সে তো আর আশ্রয়প্রার্থীর শিবির নয়— উপন্যাসও নয় আশ্রয়প্রার্থীর ইতিকথা। তাই ঔপন্যাসিককে ব্যক্তি ও সমাজপটের সম্বন্ধে সংঘাত খুঁজতে হয় উপন্যাসের চরিত্রপাত্রের যাথার্থ্যে। অপু এবং শশীর রচনাকালের মধ্যে কিছু কম প্রায় এক দশকের ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি চরিত্রের অন্তত একটি সাদৃশ্যসূত্র লক্ষ করতেই হয়। আমার কথিত চরিত্রপাত্রদের যাথার্থ্য নির্ণয়ের পক্ষে সে সাদৃশ্যসূত্রটি ও সেই প্রসঙ্গেই বৈসাদৃশ্যের বিপুলতা অনুধাবন বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিণত অপু আর যুবক শশী কেউই নিশ্চিন্তপুর ও গাওদিয়ায় আটকে থাকতে চায়নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে বাঙালি যুবকের আত্মপ্রতিষ্ঠার নানা বাসনাকে একটি সংক্ষিপ্ত কথায় ব্যক্ত করা যায়— মুক্তি-পিপাসা। ভাবনা ও দিনযাপনের ঊনবিংশ শতকীয় বাবু-ছকগুলি যে ব্যক্তির সঠিক আত্মাভিজ্ঞান সন্ধানের পথে বাধা, এ ব্যাপারটা ইংরেজের ভারতবর্ষের নানা অভিজ্ঞতায় তখনকার যুবকের কাছে স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছিল। প্রেমে প্রকৃতিতে অথবা বাস্তব কর্মৈষণায় প্রতিহত ও বন্ধ্যাদশাগ্রস্ত উপনিবেশের বাবুরক্তের গঞ্জনা তখন ক্রমশ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। 'বেরিয়ে পড়তে হবে', আমাদের চেতনে-অবচেতনে তখন একথাটিই গূঢ় ও গাঢ় হতে থেকেছে। অপু যাকে পথের দেবতা বলেছে তিনি আসলে বন্ধনমুক্তির দেবতা। শশী যাকে ভেবেছে গাওদিয়া থেকে মুক্তি, সেও আর কিছু নয়, বৃহত্তর জীবনপিপাসা।

কিন্তু এখানেই আবার গভীর হয়ে ওঠে দু'জনের ব্যবধান। অপু যে বৃহৎ বিশ্বের ডাক শুনেছিল, তার পিছনে ছিল না জীবনের নেতির ধাক্কা। বরং নিশ্চিন্তপুরের প্রকৃতি-জীবন থেকেই অপু সংগ্রহ করেছিল বৃহত্তর জগৎজীবন সম্বন্ধে গভীরতর বিশ্বাস। জীবনের বিস্ময়ের পাঠগ্রহণ শুরু হয়েছে নিশ্চিন্তপুরে, তার প্রথম বর্ণ পরিচয় ও তার বোধোদয় সেখানেই— কিন্তু আরো অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে পথের মোড়ের আড়ালে। সুতরাং নিশ্চিন্তপুরের মাটিতে অপু শিকড় মেলতে চায়নি বা পারেনি বলে সে পথের দেবতার ডাকে সাড়া দিয়েছে— অপুর সম্বন্ধে একথা বলা যাবে না। কিন্তু শশী সম্বন্ধে একথা

বলা যাবে। বলা যাবে যে, তার গাওদিয়া ছেড়ে যাবার অলীক অভিপ্রায়ের পিছনে ছিল এক সাবিক নেতির ধাক্কা। গাওদিয়ায় তার অস্তিত্বের বহুগ্রন্থিল জট সে-সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের বহু অমীমাংসার প্রতীক। তার এই জটগুলির পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। 'জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে'— এই মোক্ষম উপমাটির মধ্যে জীবনের যে স্বরূপ ফুটে ওঠে, তা শুধু শশীর জীবনের ব্যাখ্যা নয়। কলকাতা যাদের কপট হাতছানি দিয়েছে কিন্তু গ্রামের অষ্টপাশ বন্ধন যাদের ঘিরে থাকলোই, এ তাদের সকলের ইতিকথা। বন্ধুর বিবাহের বাজনা-র চিত্রকল্পে বরযাত্রীর গুপ্তছবিটি খুবই অর্থবহ। এ বাজনা, এ সমারোহ মনে শুধু দাগ কাটে, ছাপ ফেলে না। প্রথম পরিচ্ছেদে ঘটনারম্ভের পর উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পূর্বকথনের কেতাবী রীতি ধরে শশীর পরিচয় সম্পূর্ণ বলতে গিয়ে লেখক শশীর গোটা সত্তা আমাদের কাছে অনাবৃত করেছেন। তার স্বপ্নে রয়েছে নাগরিক জীবন, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য-বিলাস, আর তার বাস্তবে রয়েছে গ্রামীণ আর্থনীতিক কাঠামোয় ধৃত এক দুশ্ছেদ্য পিতৃতান্ত্রিক বশ্যতা। 'এ সুদূর পল্লীতে হয়তো সে-বসন্ত কখনো আসিবে না, যাহার কোকিল পিয়ানো, সুবাস এসেন্স, দখিনা ফ্যানের বাতাস'— শশীর স্বগত চিন্তার এই প্রতিফলনে নিঃসন্দেহে ফুটে ওঠে নাগরিক জীবনের জন্য ব্যগ্রতা। সে যখন ভাবে, 'একদিন কেয়ারি-করা ফুলবাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে,— আলো গান হাসি আনন্দ আভিজাত্য— কিসের অভাব তখন থাকিবে শশীর'— তখন শশীর সে স্বপ্নে ছায়া ফেলে নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মকেন্দ্রিক পুরুষার্থ। শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকানের সামনে বাঁশের মাচায় জটলায় শশী যে গল্পগুজব শোনে তা পীড়িত করে— 'এতগুলি মানুষের মনে মনে কি আশ্চর্য মিল। কারো স্বাতন্ত্র্য নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি এক সুরে বাঁধা। সুখদুঃখ এক, রসানুভূতি এক, ভয় ও কুসংস্কার এক, হীনতা ও উদারতার হিসাবে কেউ কারো চেয়ে এতটুকু ছোট অথবা বড় নয়।' শশী এদের কথাবার্তা 'আধখানা মন' নিয়ে 'শান্ত অবহেলার' সঙ্গে শোনে। শশী যেটা বোঝে না, সেটা হল এখানেই শশীর আত্যন্তিক অসঙ্গতি। আমাদের শশীকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে— কিসের জন্য তোমার এ অর্ধমনস্কতা, তোমার এ অবহেলার স্পর্ধা বাপু? এই কথার কোনো সঠিক উত্তর শশীর জানা নেই।

ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনে ধনতন্ত্রের অতি অসম বিকাশের অর্ধস্ফুট কিন্তু বর্ণবাহার ফুল কলকাতা নগরী। শশী তারই ক্ষণিক গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে দেশকাল পাত্রের জ্ঞান হারিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল তার পটভূমির যাথার্থ্য। বণিক সভ্যতার কাছ থেকে কিছু পেতে গেলে কিছু বিনিময় মূল্য ধরে দিতে হয়। সে তা দেয়নি। অথচ কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকালে তার আকাশে চাঁদের দিকে তাকাতে লজ্জা করে। তার বাস্তবতা কলকাতা নয়— গাওদিয়া, একথা যে সে মুহূর্তে ভুলে যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি ভুলে গেলে শশী একটা ডাইনামিক চরিত্র হতো সে সহজেই আপোষ করে ফেলে তার প্রতিবেশের সঙ্গে। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায় তার গাওদিয়া ভাবনায় একটা পরিবর্তন এসেছে— 'জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাসা ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আর মশাভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়।' এই উপলব্ধি থেকে সে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করে। শশীর কাছে 'শান্ত' শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় সে এই বোধ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে যে, পরিবেশ পরিবর্তনের দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। সে বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করে, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সঙ্গে লড়তে চায়। কিন্তু তার এই প্রয়াস অচিরে প্রতিহত হয় এক বহুকালাগত অসামঞ্জস্যের শক্ত দেওয়ালে মাথা ঠুকে। শশী যেটা বোঝেনি সেটা হল, পটভূমির সঙ্গে তার আত্মীয়তা নেই। তার গাওদিয়া বাস অগত্যা। সে গাওদিয়াতেও প্রবাসী। তাই দেখতে দেখতেই 'গ্রাম্য জীবনে শশীর আবার বিতৃষ্ণা আসিয়াছে' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। আমরা আজ একথা বলতে পারি তার তৃষ্ণার চেহারা যেমন 'শোনা কথা' মাত্র, তার বিতৃষ্ণার চেহারাও তেমন আবছায়ায় অর্ধসত্য। একটা কথা তাহলেও বোঝা যায়, শশী বাংলা উপন্যাসে প্রথম নায়ক, গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে যার কোনো আবেগই নেই। কলকাতা তাকে আকৃষ্ট করুক, কিন্তু প্রত্যাশিত ছিল— বাংলা উপন্যাস ও গল্পের তখনো পর্যন্ত নায়ক প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রত্যাশিত ছিল— কলকাতাপ্রবাস তার মধ্যে গ্রামের জন্য বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার জন্ম দেবে। প্রত্যাশিত ছিল কলকাতায় গিয়ে সে ফিরে পাবে গ্রামের নিসর্গ প্রকৃতির জন্য ব্যাকুলতা। শশীর ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। কলকাতা থেকে ফিরে এসে সে গ্রামে হয়ে গেছে আগন্তুক। বস্তুত সে কলকাতায় যেমন ছিল প্রবাসী, গাওদিয়াতেও তেমনই থেকে গেল আগন্তুক। শশী ট্রাজিক চরিত্র নয়, অসঙ্গতির প্রতীক। তার

চরিত্ররহস্যের মূল কথা হচ্ছে, সে কোথাওকার কেউ নয়। এই অর্থেই সে প্রতিভূ-স্থানীয় চরিত্র যে সে কোথাও অন্বিত নয়।

শশী যে-সময়ের চরিত্র-প্রতীক সে-সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবক তার বিড়ম্বিত অস্তিত্বের অসঙ্গতিকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, কিন্তু এস্টাবলিশমেন্ট বা অথরিটি কাউকেই চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো ক্ষমতা অর্জন করেনি। এর কারণ শশীরা সকলেই ছিল গোপালদের দ্বারা দমিত। আমার এক বন্ধু ছিল, তার স্বদেশী করতে খুবই আগ্রহ ছিল, পুলিশকেও সে পরোয়া করতো না, কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের ভয়ে সে কিছু করে উঠতে পারতো না। গোপালকে শশী কিছুতেই অতিক্রম করতে পারতো না। শশীর জীবনবিধির এই প্যাটার্ন শুধু গোপাল সম্পর্কেই মূর্ত হয়নি— মূর্ত হয়েছে যাদব প্রসঙ্গে, মূর্ত হয়েছে যামিনী কবিরাজ প্রসঙ্গেও। অর্থাৎ যেখানেই তার সংঘর্ষ বেধেছে পিতৃ-প্রতিমার সঙ্গে সেখানেই আশৈশব বদ্ধমূল সংস্কারে ফাদার ইমেজ তার ওপর আধিপত্য করেছে। স্বাধীন ইচ্ছা বা 'ফ্রি উইল' ব্যাপারটি তার শোনা আছে হয়তো, কিন্তু তাকে সে কার্যকর করে তুলতে পারেনি। তার অমীমাংসা এবং দ্বিধার মূল হয়তো এখানে। গাওদিয়ায় জীবনকে স্বাস্থ্য-শ্রী দানের চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়ে যায়, যামিনী কবিরাজের বৌয়ের রূপলোক তার যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও তেমনই ধ্বংস হয়ে যায়— সবই শশীর অযথা পশ্চাদপসরণের ফল।

গোপাল, যামিনী কবিরাজ, যাদব— এদের সঙ্গেই শশীর সম্পর্ক-সংঘাতের পরিচয় উপন্যাসটিতে সব থেকে বেশি উপাদান জুগিয়েছে শশীর পটভূমি নির্মাণে। সেদিক থেকে এ উপন্যাস আধুনিক ভাষায় যাকে আমরা বলি প্রজন্মগত ব্যবধান বা 'জেনারেশন গ্যাপ'—সেই থীম্-এর প্রারম্ভিক উপন্যাস।

'শশীর শৈশব কৈশোরের যমটি'কে (শশীর নিজেরই ভাবনা / তৃতীয় পরিচ্ছেদ) শশী কী চোখে দেখেছে, দেখা যাক। গোপালের গ্রাম্য সম্পত্তি-সংকীর্ণ চিত্তদৈন্যের সবটুকু পরিচয়ই তো শশী জানে। শশী তো 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ব্রজেশ্বর নয়, তাহলে কেন সে গোপালের তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টির সামনে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কেন পারে না তার ব্যাখ্যাটাও পাওয়া যায় গোপালের দিক থেকে। 'ছেলে বড়ো হইলে কি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, ওপরওয়ালা নয়, কি যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের ভগবান জানেন?' এটা শুধু গোপালের অনুভূতিই নয়। শশীর অনুভূতিতেও এরই ছায়া। উপরে উক্ত

সম্পর্কগুলির যে কোনো একটির ক্ষেত্রেই যে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু সম্পর্ক যেখানে ছেলেবেলা থেকে শুধু ব্যবধানের রচয়িতা, সেখানে কিছু করে ওঠা মুস্কিল। 'রাগও হয়, মমতাও বোধ করে শশী।' গোপালের সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক ভূমিকা শশীর অজানা নয়। কিন্তু শশী গোপাল সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য পোষণ করে তা তার কাছে দুর্লঙ্ঘ্য। শশী নীরব উপেক্ষা ও মৌন আনুগত্যের বিমিশ্র প্রতিক্রিয়ায় যেখানে পৌঁছল, সেখানে সত্তার অবৈকল্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেই শশীদের ব্যর্থতা। গোপালের পুত্রস্নেহ আর সম্পত্তিবোধ অপৃথক। পুত্রকেও সে লব্ধ ও লগ্নীকৃত সম্পত্তি বলে ভাবে। সেই মনোভাব নিয়েই সে পুত্রের ওপর দখল বজায় রাখল। শেষ কৌশলে তার বেহাত হওয়া আটকালো। সম্পত্তি বেনামী করে সম্পত্তি স্বাধিকারে রাখার ঘটনার সঙ্গে তা তুলনীয়।

আর শশী? সেই কি গোপালের বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ভোলা ব্রহ্মচারীকে যেকথা সে বলেছিল, বাপকে ভক্তি শ্রদ্ধার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই— সেটা তার অবচেতনের উক্তি নয়— অভ্যাসের ফল।

> 'গোপালের প্রতি একটা অন্ধ ভয় মেশানো ভক্তি আজও তার মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে— হয়তো চিরদিনই থাকবে। গোড়ার দিকে অনেকগুলি বছর ধরিয়া তার মনের সমস্ত গাঁথনি গাঁথিয়াছিল যে গোপাল, সেগুলি ভাঙিতে পারিবে কে?' (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

এবং, গোপালের গাঁথনি সে ভাঙতে পারেনি বলেই যাদব সম্বন্ধেও সে তার উপলব্ধিকে উচ্চারণ করতে পারেনি। গোপালের মহাজনি, যাদবের সূর্যবিজ্ঞান আর যামিনীর কবিরাজী তার কাছে একই পুরাতন প্রজন্মের সংকীর্ণতা অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির প্রাচীর। এর বাইরে যাওয়া দরকার— কিন্তু প্রাচীর তো আসলে শশীর মনের মধ্যে ভিত্ গেড়েছে। তাই যাদবের উক্তি ও আচরণের অসঙ্গতি (সাপের ভয়ে লাঠি ঠুকে পথ চলা) টের পেয়েও শশী নীরব। এখানেও তার রাগ এবং 'অপরিত্যাজ্য সংস্কার' সহাবস্থায়ী। যাদবের মৃত্যুদিবস ঘোষণায় শশী বিচলিত হয়েছে, সে মৃত্যুর রহস্যও শশী ডাক্তারের চোখে প্রচ্ছন্ন থাকেনি— কিন্তু যে গাঁথনি গোপাল ছোটবেলা থেকে গেঁথে দিয়েছে, সেই গাঁথনি এখানেও ভাঙা গেল না। জীবনের দিক থেকে পরিবেশ-নিয়তির শিকার যাদব। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে পরিবেশ-নিয়তির শিকার শশী। যামিনী কবিরাজের বৌয়ের বেলাতে তার শেষ পর্যন্ত হার হল— কবিরাজকে সে মাঝে মাঝে কড়া কথা দুটো বলেছে বটে, কিন্তু তা কেবল

প্রফেশন্যাল এথিক্স থেকে। সুতরাং শশীর পরাজয় তার চরিত্রের কাছে।

শশী-কুসুমের সম্পর্কের জট আমাদের কাছে নয়, শশীর নিজের কাছেই দুর্বোধ থেকে গেছে। সে যেমন গোপাল বা যাদব কারো সম্বন্ধেই মনস্থির করতে পারেনি, কুসুমের সম্বন্ধেও সে মনস্থির করতে পারেনি। গাওদিয়া যেমন তার সকল নাগরিক স্বপ্নের শ্বাসরোধ করতে চায়, কুসুমও তেমনি তার সাধের ফুলচারা মাড়িয়ে দেয়। গাওদিয়ার ভাষা, অর্থাৎ গাওদিয়ার আশা-সাধ-আহ্লাদ-স্বপ্ন যেমন শশী বোঝে না, কুসুমের ভাষার ব্যঞ্জনার্থও শশী বোঝে না, অন্তত প্রথমটা বুঝতে চায়নি। 'এমন চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু'— এ কথার অর্থ শশী বুঝতে পারেনি বলেই, সময়ের ব্যবধানে সে যখন কুসুমকে বলতে গেল— 'আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ', কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে, 'না'। এই দিন অর্থাৎ, তালবনের এই চূড়ান্ত সাক্ষাতের দিনে শশী কি তার সার কথাগুলো কুসুমকে জানাতে পারল? উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় বৎসরের হিসাবে ন' বছর চলে গেছে। ন' বছর তো এক আধদিন নয়। কিন্তু এই ন' বছরেও শশী কি কুসুমের কথা ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছে? নাকি তখনো সে বাইরের জগতের বর্ণাঢ্য নাগরিকতার সেই অমূল এবং অলীক স্মৃতির পটভূমিকায় রেখে কুসুমকে বিচার করতে চেয়েছে? ন' বছর আগে যে কুসুম শশীকে বলেছিল যে শশীর কাছে দাঁড়ালে তার 'শরীর কেমন করে', যার জবাবে শশী মনে মনে ভেবেছিল 'শরীর, শরীর— তোমার কি মন নাই কুসুম', আজও শশীর কুসুম-চিন্তা তার থেকে বেশি এগোয় নি। শশী কুসুমকে দেখিয়েছে পুরুষের কাজের জগতের তাগিদ— "সময়ে কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমি রইলে আমিও রইলাম।" এরই উত্তরে কুসুম যখন বলেছিল 'সে তো ন' বছর ধরেই আছি।' তখনই শশীর বোঝা উচিত ছিল, কুসুম এইবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তখনো শশী নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে— "এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম; গৃহস্থের গোবরলেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নাই কেশে নাই সুগন্ধি তেল, তার জন্য বিবর্ণমুখে এত কষ্ট পাইতে নাই! ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ, জগতে সাগরতরঙ্গ আছে।" যে শশী গাওদিয়ায় থেকেও গাওদিয়ার কেউ নয়, সেই শশী কুসুমের প্রেমাস্পদ হয়েও কুসুমের কেউ নয়। আমি আগে যেমন বলেছি গাওদিয়াতেও শশী শেষ পর্যন্ত আগন্তুক, এখনো বলছি কুসুমের কাছেও সে আগন্তুক মাত্র। সে যখন কুসুমকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে তখন সে একদিকে

আবিষ্কার করেছে গাওদিয়ায় তার কোনো বৃন্ত নেই, আর অন্যদিকে আবিষ্কার করেছে গাওদিয়ায় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অথচ পরিবেশ-নিয়তির অনিবার্য প্রতাপে তাকে এ কথাও বুঝতে হয়েছে যে, গাওদিয়া তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে। এই সময়ই সে একবার মাত্র গোপালের ছেলে না হয়ে শশী হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু পুতুলনাচের ইতিকথায় আমরা দুটো মানুষের দেখা পেয়েছি— একজন কুসুম, যে পরাজিত হয়েও আপন স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। আর একজন মতি, যে বিজয়িনী হয়েছে গাওদিয়াকে পরিহার করে।

এইখানেই শশীর বুঝতে ভুল হয়েছিল যে, কুসুম পুতুল নয়। পুতুল ন' বছর ফেলে রাখলেও পুতুলই থাকে— যা ছিল তাই থাকে। কিন্তু সজীব ব্যক্তি-মানুষের কথা স্বতন্ত্র। কুসুমের এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। এ উপন্যাসে সে-ই একমাত্র চরিত্র যে শশীর কাছে কোনো উপকারের সূত্রে আবদ্ধ নয়। সে-ই একমাত্র চরিত্র শশী যাকে সমীহ করে। শশীর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারে একমাত্র কুসুম। বাকি সকলের কাছেই শশী হয় নবাগত, নয় দুর্বোধ্য, অথবা সুদূর। একমাত্র কুসুম শশীর সঙ্গে প্রথম থেকে সহজে অন্তরঙ্গ। শশী একবার মতিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কুসুম সে কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি। যে আবেগ নিয়ে শশী তার পোষ্য আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েদের দাঁত মাজার ব্যবস্থা করতে চায়, আঁতুড় ঘরে সুব্যবস্থা করতে চায়, সেই রকম 'লোকের ভালো করতে হবে' এই মনোভাব নিয়েই শশী মতিকে বিয়ে করবার ক্ষণস্থায়ী প্রস্তাবটি পেশ করেছিল। দুয়ের কোনোটার সঙ্গেই শশীর গোটা অস্তিত্বের যোগ ছিল না। আজ আমার একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে শশী যদি গাওদিয়া ছেড়ে যাবার কথা আদৌ ভেবেছিল, তাহলে সে একথা বুঝল না কেন কুসুমই হতে পারতো তার গাওদিয়া ছেড়ে যাবার যথার্থ প্রেরণা। সে বাস্ মিস্ করেছিল, সেদিন— যদি ধরেই নিই বাস্ ধরবার বাসনা তার কোনোদিন ছিল— যেদিন কুসুমের গাওদিয়া ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব সে কানে তোলেনি। কেমন করে চলে যেতে হয় কুমুদ ও মতি জানতো। এই ইতিকথায় এদের কথা এ কারণে প্রাসঙ্গিক যে এরা— বিশেষ করে মতি দেখালো পরিবেশ-নিয়তিকে কী করে খণ্ডিত করতে হয়। মতির মধ্যেই ছিল কপিলার বীজ। আর, কুমুদ যেন 'কল্লোলে'র পাতা থেকে উঠে-আসা-চরিত্র। কিন্তু মতির অসমসাহসিকতার উপাদান সেই জুগিয়েছে। কুসুমের সে সাহস ছিল। কিন্তু শশী কুমুদ নয়। যাযাবরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অনিকেত স্বভাব কুমুদেরই ছিল। 'কুমুদ হিসাব করে পা

ফেলে না। শশী হিসাব জানে। সে একদিকে গোপালের যথার্থ উত্তরাধিকারী। কিন্তু গোপালের হিসাব যেমন পাকা, শশীর তেমন পাকা নয়। সে তার নাকের সামনের বড় অঙ্কটাকে দেখেও দেখেনি। কুসুমকে সে ভেবেছিল পড়ে পাওয়া। তারপর কুসুম যখন উপসংহারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে তখন শশী নতুন করে উপক্রমণিকা ফাঁদতে গেছে।

শশীকে তাহলে আমি কেন এক সময়ের বাঙালী মধ্যবিত্তের ভাবনা ও আচরণের প্রতিভূস্থানীয় চরিত্র বলেছিলাম? তার কারণ, সে ছিল সেই সময়ের উপলব্ধি ও অসিদ্ধান্তের, সংকল্পের ও পশ্চাদপসরণের, বাসনা আর বিমুখতার, আসক্তি এবং উদাসীনতার বিমিশ্র ব্যক্তিপ্রতীক। তার নৈঃসঙ্গ্যের এবং অনন্বয়ের সঙ্গে সংগ্রামের চেহারা উপন্যাসে যে স্পষ্ট হয়নি— তার পটভূমি যে পূর্ণতা পায়নি তার একটা কারণের হদিস এখানে মেলে। আর একটা হদিস মেলে এইখানে যে, সে সবকিছুকে বাইরে থেকে আলগোছে ধরেছে। সে কোনো কিছুর সঙ্গে ভিতর থেকে জড়িত নয়। তাই কুমুদের সাহসও শশীর থাকার কথা নয়। তার নিগূঢ় মনোলোকে গোপালের দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া দুর্মর। গোপাল তার মধ্যে যে হিসাবী সত্তা সঞ্চারিত করে দিয়েছে, সেই সত্তার চূড়ান্ত দান সব কিছুকে হিসাবের অঙ্কে সমমূল্যে গ্রহণ— রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ-না-সারানো সমান— রোগীর পক্ষেও, শশীর পক্ষেও। এ কার কথা? এ তো কর্মৈষণা-চঞ্চল আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী যুবকের কথা নয়। এ হল তার কথা যে প্রতিহতবাসনা, হতস্বপ্ন মানুষ। এবং অবশ্যই তার এ মানসতার মূলে রয়েছে গোপাল-জট। তার একদিনের একটা বিশেষ অনুভূতির কথা এখানে উল্লেখ করি। সেদিনও শশী তালবনে টিলার উপর উঠেছে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। সেদিন তার মন শান্ত। আপন শক্তিতে সাহসী সে সেদিন। 'কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশী ভীত হইয়া পড়িল। ছেলেবেলা মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক-একদিন তাহার কেমন ভয় করিত, তেমনি ভয়। শশীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কয়েক মিনিটের ভবিষ্যতও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর।' এরপর কয়েকদিন সে আবার নিক্ষিপ্ত হল বিষণ্ণতায়। তার এই জট শেষ পর্যন্ত থেকে গেল অমোচনীয়।

আমরা লক্ষ না করে পারি না, গোপাল-সেনদিদি সম্পর্কের মতোই শশী-কুসুম সম্পর্ক হয়ে উঠতে পারতো একটা বদ্ধ ডোবা, যা কোনো কাজে লাগে না, কেবল দিয়ে যায় একটা সংশয়াচ্ছন্ন উত্তরাধিকার। হল না কেবল

কুসুমের যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। এতে অন্তত অতীতটা বাঁচল। শশীর কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রস্তাব শুনলে কুসুম পরিণত হত একটা ধ্বংসস্তূপে।

শশী কোনো কিছুই ঠিক করে শুরু করতে পারেনি। এ উপন্যাসে আমরা শশী কুসুমের সম্পর্কটার চড়াই দেখতে না দেখতেই তাদের সম্পর্কের উৎরাই পর্ব শুরু হতে দেখেছি। কিন্তু শশী গোপাল যেমন সেনদিদির কুসুম হবার ক্ষমতা আদপে ছিল না। কানা চোখ সারিয়ে দেবার জন্য শশীকে সেনদিদির মিনতির মধ্যে যে স্থূল দৈন্য তা থেকে কুসুম মুক্ত ছিল বলেই সে শশীর সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎটা বিসর্জন দিয়ে হয়তো অতীতটা রক্ষা করল। এইভাবে চলে গিয়ে কুসুম তার স্বাতন্ত্র্যকেও প্রতিষ্ঠিত করে গেল। আর শশী? কুসুম চলে যাবার পরে, গাওদিয়া ছেড়ে যাবার কল্পনায় যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সেনদিদির মরণোত্তর পুত্রদায় গোপালকে তুলে নিতে দেখে যে বিরক্ত হয়েছিল, সে গাওদিয়াতেই আটকে থাকলো গোপালের বিষয়ী কৌশলে। শশী অনন্ত দাসকে বলেছিল পুতুল যে নাচায় তাকে একবার দেখতে পেলে সে যেন কী করত! হায়— পুতুলের কি সে ক্ষমতা থাকে? তবে আর সে পুতুল কেন?

জুলাই, ১৮৭৪।

'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের শিল্পরহস্য

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলির কথা একসঙ্গে মনে করলে চমৎকৃত হতে হয় তাদের বিষয়-ভাবনা ও প্রকরণের অনন্যতায়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি লেখক সতীনাথের মতো এমন করে টেকনিক ও বিষয়ের অভেদ ধ্যান করেননি। বিষয় নিরীক্ষায় বরঞ্চ সতীনাথ আরো বেশী স্বনির্ভর— বলা যায় বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে একটু বাইরে গিয়েই তিনি প্রসঙ্গ সন্ধান ও ধ্যান করেছেন। তাঁর এই প্রসঙ্গ-সন্ধানের অনন্যতার সঙ্গে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা-পট এমন শ্লিষ্ট হয়ে আছে যে, যখন আর এই পণ্ডিতী প্রশ্ন নিরর্থক— কেন সতীনাথ পূর্নিয়া-অঞ্চল-সীমার বাইরে এসে বৃহৎ মেট্রোপলিট্যান পটভূমিতে তাঁর প্রসঙ্গ খোঁজেননি। বৃহৎ মেট্রোপলিট্যান পটভূমিতে নাগরিকদের উপর কোনো একটা বিশ্বধারণা চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে অনীহা থাকে এবং urbanisation means a structure of common life in which the diversity and the disintegration of tradition are paramount— অথচ সতীনাথের বিশ্বতত্ত্বে ট্র্যাডিশনেরই পরীক্ষা ঘটেছে নানাভাবে— তার বিপন্নতার মধ্যেও তার পরমায়ুর রহস্যকে লেখক কখনো উপেক্ষা করেননি। সুতরাং 'Polis' থেকে দূরে জেলা শহর তার মফস্বলীয় মন্থরতায় যেখানে ট্র্যাডিশনকে বিদায় দিতে পারেনি কিন্তু নানা দিক থেকে, অথবা ভিতর থেকেই এদিকে ওদিকে মুচড়ে গেছে— সেখানকার সামাজিক স্তরবিন্যাস ও পরিবার জীবন সতীনাথের নিরীক্ষার বিষয় হয়েছে। সে জন্যই বলা যায়, তার উপন্যাসগুলির পট পটবিধৃত প্রসঙ্গ অভিনব এবং অন্বেষী, দুঃসাহসী এবং সম্পূরক।

এই নিরীক্ষার কালে সতীনাথের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিমানসের অন্তর্গূঢ় টেন্‌শন্। 'জাগরী' থেকে শুরু করে 'দিগ্‌ভ্রান্ত' পর্যন্ত লক্ষ করা যায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত ও প্রতিক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিমানসের নিগূঢ় অন্তর্গতির রূপায়ন— তাঁর উপন্যাসের ভাষা তাই মনোলোকের ভাষা। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' স্মরণে রেখে, তার

মহাকাব্যিক কাঠামোর প্রসঙ্গ ভেবেও বলছি সতীনাথের সব উপন্যাসসম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে। এবং সেই মনোলোক মেট্রোপলিট্যান মানুষের মনোলোক নয়। যেখানে ট্র্যাডিশন ম্রিয়মান এবং নিস্তেজ, সেখানকার ভাষা এ নয়, কেননা সেখানকার চেতনাও এ নয়। একটা ছোট মফস্বল নগর, যার সামাজিক স্তরবিন্যাস ঠিক 'রিজিড' হয়ে ওঠেনি, যেখানকার সার্বিক কাঠামো থেকে গ্রামীণ জের এখনো ঘুচে যায়নি, সেই শহরের মানুষগুলির মানসিক অখণ্ডতায় যে সব বিপর্যয় ঘটে, বাইরের ঘটনা তত নয়, সেই মানস বিপর্যয়— তার জটিল আঁকাবাঁকা স্রোত সতীনাথের বিষয়। একটা পরিবার-জীবনে নানা ভাঙচুর ঘটে যায়, এটা একটা আধুনিক মেট্রোপলিসে বড় কথা নয়— কিন্তু পূর্ণিয়া বা অনুরূপ কোনো মফস্বল টৌনে যেখানে এদেশীয় ট্র্যাডিশনাল পারিবারিক প্যাটার্ন তখনো আঁটসাঁট ছিল, সে জায়গায় রিলেশন বা সম্পর্কসূত্রগুলির টানা হেঁচড়ায় যে টেন্‌শন্ সৃষ্ট হয় সেটার আকর্ষণও লেখকের কাছে স্বতঃই অনতিক্রম্য। সতীনাথের দুই ধরনের উপন্যাসেই এই সম্পর্কসূত্রগুলির টেন্‌শনের পরীক্ষা হয়েছে। দুই ধরনের উপন্যাস বলতে আমি বোঝাতে চাইছি 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসের একটা শ্রেণী, আর 'অচিন রাগিণী' 'দিগ্‌ভ্রান্ত'-এর মতো উপন্যাসের আর একটা শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে সময়ের ইতিহাস নির্দিষ্ট গতিবেগের ধাক্কায় 'রিলেশন'-গুলির আত্মপরীক্ষা— আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ইতিহাস-নিরপেক্ষ ব্যক্তিজীবনগুলির আত্মমোচন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', আলাদা দাবী তার। ফ্রেমটুকু সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে নেওয়া, বিষয় নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে— লেখকের একমাত্র প্রচলিত অর্থে প্রেমের উপন্যাস। সেখানেও কিন্তু চরিত্রগুলির আত্মমোচনই লেখকের অভিপ্রেত।

দুই

যখন তিনি 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস লিখছেন, ততদিনে তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমরা বাংলা কথাসাহিত্যে যাকে 'চরিত্র' বলি, তিনি সে-অর্থে চরিত্র সৃষ্টি করেন না। ব্যক্তি চরিত্র নয়, ব্যক্তি চেতনার নানা রূপ, তাদের অভিজ্ঞতা যা চেতনারই অঙ্গ নাম, তার স্মৃতিলোকের নানা তরঙ্গ তাঁর মুখ্য অঙ্কনীয়। অর্থাৎ চরিত্র বলতে তিনি বুঝতেন চেতনা। চেতনাগুলি কখনোই পরস্পরের সঙ্গে মেলে না— তাদের স্বাতন্ত্র্যই কৌতূহলের

বিষয়। 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর এই পরীক্ষা চরমে উঠেছে। 'অচিন রাগিণী'তে'-তে বোঝা গিয়েছিল পাত্রপাত্রীর সম্পর্কসূত্রগুলি তিনি ছক বা পরিচিত বিন্যাসের বাইরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান। 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে বোঝা গেল তিনি পরিচিত পারিবারিক ছকের মধ্যে তার সম্পর্ক-সঙ্কটের সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনাকে তিনি পরীক্ষা করতে প্রয়াসী। চেতনার আবর্তসঙ্কুল উদ্‌ভ্রান্ততা নয়— তাদের ভেদ-বৈষম্যকেই তিনি বুঝে নিতে চান।

এ উপন্যাসের প্রারম্ভে রয়েছে একটা গাছ— শেষেও রয়েছে সেই গাছটাই।[১] এই যজ্ঞডুমুরের গাছটা কাটবো কাটবো করেও কাটা হয়ে ওঠে না। এই গাছটার ছায়া অনেকদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। গাছটা থেকেই হরিদাস ব্রহ্মচর্য-পোষক রস সংগ্রহ করে, গাছটা থেকেই সে পড়ে গিয়ে পা ভাঙে, গাছটার ডালেই সে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে। গাছটার সঙ্গে হরিদাসের মিল আছে-- সে শুধু ছায়া বিস্তার করতে পারে, সে সুবোধবাবুর বাড়ির কটকের বাইরের অস্তিত্ব, তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়াটাই দরকার ছিল —সেটা হয়ে ওঠেনি। হরিদাসের আত্মহত্যার পর সেটা আপনিই সম্পন্ন হবে। গাছটা আমার, কি আমার নয়, গাছটা কাটার হক্ আমার আছে কি নেই— এমন নানা জট নানা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের অভিমান আমাদের জীবনে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। সুবোধবাবুর সংসারে হরিদাস সমস্যাও তাই। হরিদাসের ওপর কার এক্তিয়ার— সুবোধবাবুর, না, অতসীবালার— সুবোধ-বাবু সেটাই ঠিক করতে পারলেন না। সুতরাং গাছটা একটা অনাত্মীয় অথচ আত্মীয়তালিপ্সু অস্তিত্বের প্রতীক— উপন্যাসের চরিত্রপাত্রগুলির মধ্যে হরিদাসের অস্তিত্বের প্রতীক— যজ্ঞডুমুরের গাছের মতোই তারও বড়ো বড়ো পাতার বাক্যজালে ঢাকা আড়ম্বর— ব্রহ্মচর্যের কৃত্রিম কিংবদন্তী, শিকড়ের জোর নেই— বস্তুত ভূমিকাবিহীন। হরিদাসের মৃত্যুর পরেই যেন গাছটাও তেজ হারিয়ে ফেলল— এবার তার ছায়া ছোট হয়ে আসবে। লক্ষণীয়, হরিদাস থাকলেই গাছটা সকলের নজরে আসে— হরিদাস সরে গেলে গাছটিও 'রিয়্যালিটি' হারিয়ে ফেলে।

গাছটির প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো গাছের ভূমিকা নেই। হরিদাস যা প্রতীয়মান হতে চায় তা সে নয়, চিত্রাসখী যা নিজেকে মনে করাতে চান তা

---

১. শ্রীপার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে এবিষয়ে চিন্তান্বিত হয়েছি এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মহৎ লেখকের শেষ উপন্যাস' ('সতীনাথ স্মরণে') প্রবন্ধটিতেও গাছটির প্রতীকী ইঙ্গিতের কথা বলা হয়েছে— ব্যাখ্যা করা হয়নি।

তিনি নন—এ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়্যালিটির এই কাটাকুটি খেলা এই উপন্যাসের মূল বিষয় ও আশপাশের বিষয়কে একত্র অন্বিত করে রেখেছে। 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি চলছিল যখন সেই সময়ের বিচিত্র ভাবনার নানা ইঙ্গিতবহ লেখকের ডায়েরি[২] থেকে এই অংশটি পাওয়া যায়—

> The ambiguity of truth, the conflict of appearance and reality, the rival claims of secret and social life— these are now integral to modern fiction in its major manifestation.

এই উপন্যাস সেই মেজর ম্যানিফেস্টেশনের দুটি স্তর। একটি হল সুবোধবাবুর পারিবারিক জীবন— যে সংসারে কর্তার নাম সুবোধ হলে ছেলের নাম হয় সুশীল— একেবারে ছকে বাঁধা— অপরটি হল বৃন্দাবনের আশ্রমজীবন —চিত্রাসখী যেখানে কাঁচুলিতে বাঁধতে চান অলীক স্তন। দুটি ক্ষেত্রে কিন্তু সেই এ্যাপিয়ারেন্স ও রিয়্যালিটির প্রশ্নটাই আসল ব্যাপার। একটা ভাঙলে আরেকটা কি যথাপূর্ব থাকে?

তিন

সুবোধ-অতসী সম্পর্ক এ উপন্যাসের প্রধান বৃত্ত। চিত্রাসখী-বৃত্ত এ উপন্যাসে এসেছে সেই প্রধান বৃত্তের টানে। সুতরাং প্রথমে এই উপন্যাসের পারিবারিক বৃত্তটি ভাঙা গড়ার ব্যাখ্যা জেনে নিতে হয়। সুবোধবাবুর পারিবারিক প্যাটার্নে একটা আত্মসন্তুষ্টি ছিল। এই পারিবারিক প্যাটার্ন পুরোমাত্রায় ছোট শহরের বুর্জোয়া পরিবার প্যাটার্ন। তার 'মেটিরিয়াল' স্তরের সঙ্গে তার 'স্পিরিচুয়াল' স্তরেরকোন ব্যবধানরেখা প্রথম নজরে পড়েনি। নজরে পড়ল অতসীর দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। হরিদাস এবং অতসী দেওঘরে সুবোধবাবুর ব্যক্তিত্বের বৃত্তের বাইরে গিয়ে যে যার নিজের মতো করে স্বাধীনতা পেল। দেওঘরের জীবনে অতসী একটা মুক্তির স্বাদ পান। 'খাবারের দোকানে দাঁড়িয়ে পেঁড়া খাবার পর অনুভব করলেন অতসীবালা যে, মনের দিক দিয়ে এত স্বাধীনতা দেওঘরে আসবার আগে কখনও পাননি।' 'বুঝেসুঝে চলবার প্রয়োজন নাই।' অতসীবালার দাম্পত্য-জীবনে 'বুঝেসুঝে' শব্দটির গুরুত্ব খুব বেশি ছিল। এই স্বাধীনতা-হরণকারী

২ শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত সতীনাথ গ্রন্থাবলীর (চতুর্থ খণ্ড) পরিশেষে প্রদত্ত 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ' থেকে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা ৫৮৯।

শরজুটিকে পরিচর্যা করেই অতসীবালার দিন কেটেছে। দেওঘরে 'রেখাকুঞ্জে'র বাড়িতে অতসীবালা চিত্রাসখী-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার কাছে স্বাধীনভাবে নিজেকে সঁপে দিলেন। জীবনে এই তাঁর প্রথম মনে হল, স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। পরাধীনতার মোহ থাকে— স্বাধীনতার মাদকতা। সেই মাদকতায় অতসীবালা আত্মবিস্মৃত হলেন। একটু পরে আমরা সে আত্মবিস্মৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করবো।

দেওঘরে এসে হরিদাসও মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। তবে সে মুক্তির স্বাদ আলাদা। হরিদাস হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যে নিজের মুক্তির জন্ম ততটা ব্যস্ত নয়, যতটা ব্যস্ত অপরকে নিজের তাঁবে আনতে। সুবোধ ডাক্তারের বাড়িতে তাঁকে একটু— একটু কেন বলি— বিলক্ষণ— সঙ্কুচিত থাকতে হত। দেওঘরে তিনি হলেন সহজ ভাবে নিজের অধিকারে বাড়ির কর্তা। স্মরণ রাখা দরকার হরিদাস অতসীবালা-সুবোধ ডাক্তারের সম্পর্কের সেতুতে ফাটল ধরাবার উপলক্ষ মাত্র— হেতু নয়। হেতুটা হরিদাস-নিরপেক্ষভাবে এঁদের দাম্পত্য জীবনে সুপ্ত ছিল। তা হল বুর্জোয়া পরিবার-জীবনের মৌল ফ্যালাসি। একতরফা আধিপত্য ও একতরফা আত্মসমর্পণ সেখানে দাম্পত্য তথা পারিবারিক শৃঙ্খলার নিয়ামক। হরিদাস সেটাকে রেখাকুঞ্জে নিয়ে গিয়ে ত্বরান্বিত করে দিল। এই কাহিনীকাঠামোর একটা অভিনবত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। দাম্পত্য সম্পর্ক-সঙ্কটের বিষয় নিয়ে বাংলা উপন্যাস এর আগেও লেখা হয়েছে। কিন্তু 'যোগাযোগ' উপন্যাসের একক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলতে পারি, সে উপন্যাসগুলিতে বিদ্রোহী প্রেম বা 'নিষিদ্ধ' প্রেম প্রধান সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। স্বামীর বা স্ত্রীর অপারিবারিক প্রেম সে সব ক্ষেত্রে এক বিধ্বংসী সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। সে উপন্যাসে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রী-যুগল নিঃসন্তান। সতীনাথ তাঁর উপন্যাসের বীক্ষণাগারে যে দম্পতিকে নিষ্করুণ পরীক্ষা করেছেন তারা কেউ কোনো অপারিবারিক প্রেমের দ্বারা পীড়িত নয়। অতসীবালা এই সংসারে যে সঙ্কট সৃষ্টি করলেন তা তাঁর ধর্মমোহের জন্ম; এবং আরো লক্ষণীয় এই দম্পতি সন্তানবান। এই দুটি কারণে সতীনাথের এই নিরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠল সম্পূর্ণ নতুন। আরো একটি কারণে এই নিরীক্ষা অভিনবত্বের দাবিদার হতে পারে। চরিত্রঘটিত কোন সংঘাতের জন্ম এই পরিবারের সমস্যা আবর্তসঙ্কুল হয়ে ওঠে নি। মানুষ হিসাবে সুবোধবাবু ও অতসীবালা এমন কোনো আতিশয্যে দুষ্ট ছিলেন না, যার অনিবার্য ফল ছিল এই সঙ্কট। অর্থাৎ কারো কোনো স্বাভাবের অতিশয়তার জন্ম এই পরিবারের

ভারসাম্য বিস্মিত হয়নি— যে-তেত্রিশটি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের কথা আচার্য ভরত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে দম্ভ এবং অভিমানের একটা মিশ্রভাব এখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সে মিশ্রভাবও ইংরাজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা বিশিষ্ট জীবনচর্যার দান। সুবোধবাবুর স্বাতন্ত্র্যের দম্ভ, মানসিক শিক্ষালব্ধ অভিজাত্যের অভিমান মধ্যবিত্ত মানসের শ্রেণীগত সম্পদ। পরিবার এবং মিউনিসিপ্যালিটি বিনাবাক্যব্যয়ে এই রাশভারি, নিয়মনিষ্ঠ, চাপাস্বভাবের মানুষটিকে মেনে নিয়েছে। তাঁর সেই নিরঙ্কুশ অধিপতি-জীবনে অতসীবালা আর সকল কিছুর মতো একটা অংশমাত্র ছিল— তাঁর নিয়মের জগতের অংশ। এটা যে 'ইল্যুশন', 'রিয়্যালিটি' নয়— অতসী সেটা প্রমাণ করে দিলেন দেওঘর থেকে ফিরে আসার পরের ঘটনায়—যার পরিণতি ঘটল তাঁর বৃন্দাবন যাত্রায়, আশ্রমবাসিনী হবার সঙ্কল্পে। আবার অতসীবালা যেটাকে মুক্তি মনে করেছিলেন সেটাও যে মুক্তি নয়— মুক্তির 'ইল্যুশন', তাঁর বৃন্দাবন-জীবন থেকে সে-কথা তিনি জানলেন। যদিও তাঁর জানার পালা আগেই শুরু হবার কথা। দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে সুবোধ-অতসী-সম্পর্কে প্রকাণ্ড চিড় ধরল আমিষ-নিরামিষ বিসম্বাদে। এই আমিষ-নিরামিষ-বিসম্বাদের সহায়তায় সতীনাথ অনেক কিছু দেখানোর সুযোগ পেলেন। অতসীবালা 'ভগবানের কাছে কথা দিয়েছেন' তাই 'সংসারে তিনি কোণঠাসা'। সুবোধবাবু এই বিসম্বাদের ভিতর দিয়ে বুঝে গেলেন আরেক কথা— 'সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে তাঁকেই কোণঠাসা করে আনছে'। দুজনেই নিজেকে ভাবছে 'কোণঠাসা' ইংরেজিতে যাকে বলি 'আইসোলেটেড', বাংলায় 'বিচ্ছিন্ন'। তখনই বোঝা যায় সতীনাথ কেন এ গ্রন্থের নাম 'নির্বাসিতের দল' রাখতে চেয়েছিলেন। যে-যার নিজের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুতি, (আমরা মনে রাখি এ গ্রন্থের আরেকটি সম্ভাবিত নাম ছিল 'কেন্দ্রচ্যুত'), যে-যার নিজের জেদ বা অভিমানে লীন। 'সুবোধবাবুর এতকালকার সযত্নলালিত আত্মম্ভরিতায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল'— অতসীবালার আচরণে। আঘাত অতসীবালারও কিছু কম ছিল না। তাই দেখা যায় সুশীলকে মা হিসাবে নিজের দখলে টানার চেষ্টা অতসীবালার নৈঃসঙ্গ্যের হাত থেকে আত্মরক্ষারই চেষ্টা। তার পরিণতি হল সুবোধবাবুর ফলের রসের গ্লাস ভেঙে ফেলার ঘটনায়। সুবোধবাবুর নিজেকে উদাসীন রাখার সমস্ত প্রয়াস, অপরের ইচ্ছাকে সম্মান জানাবার সৎ শিক্ষাভিমানী ভদ্রলোক-সম্ভব অভিপ্রায়— এবং সর্বোপরি এঁদের সংসারের তখনো পর্যন্ত রক্ষিত ভারসাম্য— সব কিছু কাচের

গ্লাসের মতো ভেঙে গেল। অতসীবালার বৃন্দাবন প্রস্থান, মণির বিবাহে তাঁর সুবিপুল নিরাসক্তি— এই সব দেখে মনে হয় সম্পর্ক বুঝি শেষ— অথচ নিয়মিত মাস পয়লায় মনিঅর্ডার প্রেরণে তারপরেও সম্পর্কের জের বা মায়া ধরে রাখতে চেয়েছেন সুবোধবাবু— অর্থাৎ যা কিছু ভেঙে গেল বলে মনে হল, তা ভেঙে গেল না ; কারণ যা যা ঘটেছে তা তো ভাঙন নয়,অনেকগুলি ফাটল। অতগুলি ফাটল সত্ত্বেও ইমারতটা ভেঙে পড়ছে না— এটাই বিস্ময়।

সতীনাথ সমাজতত্ত্বের সূত্র ধরে এই বীক্ষণকর্ম সম্পন্ন করতে চান নি। কিন্তু তা হলেও দাম্পত্য সম্পর্কের ফাটলের ফাঁক দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষাভিমানের সমস্ত পর্দা ছিঁড়ে এই সূত্রটি বেরিয়ে পড়ে যে এ সংসারে স্বামীই মালিক। গহনা এবং সোনার মেডেলের ঘটনায় সুবোধবাবুর চেতনায় বারবার অতসীবালার অধিকারসীমা সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে। 'যোগাযোগ'-এ কুমুও একদিন জেনে ফেলেছিল তার স্বামীর সংসারে সামান্য কিছুও স্বামীর বিনানুমতিতে কাউকে উপহার দেবার ক্ষমতা তার নেই। মধ্যবিত্তের সম্পত্তিচেতনা ও স্বামীত্বচেতনা কত একাকার থাকে এসব তার নিদর্শন। আমিষ নিরামিষের ব্যাপারে সুবোধবাবুর মনোভাবও সেই অবশ্য মালিক মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। এটা কোনো ব্যাপারই নয়, সহজেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারত— গেল না একজনের অধিকারবোধ ও আর একজনের স্বাধীনতাবোধের জন্য। ঘটনা হিসাবে এরা তুচ্ছ। মোটেই গৌণ হল না এর প্রতিক্রিয়া। অথচ আমিষ নিরামিষের বিসম্বাদ একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেল মণির বৈধব্যের নিষ্করুণ হেতুবশত। সুতরাং আমিষ নিরামিষের প্রশ্নটাও 'রিয়্যালিটি' নয়, 'রিয়্যালিটি' অন্যত্র।

চার

সে-রিয়্যালিটি খুঁজতে হবে অতসীবালার জীবন-বৃত্তে। অতসীবালার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার 'ধর্মমোহ'[৩] কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অতসীবালার ব্যাপারটা শুধু 'ধর্মমোহ' নয়, জীবন সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি। রেথাকুঞ্জে অতসীবালা নিজের স্বাধীনতা প্রথম উপলব্ধি করলেন। এর পূর্ব

৩. 'সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' শ্রী গোপাল হালদারের লেখা বই থেকে বলছি। ৯৬ পৃষ্ঠায় 'দিগ্‌ভ্রান্ত' আলোচনাকালে লেখক কথাটি বলেছেন। 'মোহ' কথাটি ভবানী বাবুও পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন।

পর্যন্ত তিনি নিজে ইচ্ছা করে কিছু কখনো করে উঠতে পারেন নি। কিছু নিজে নিজে করা যায়, নিজেকে যে নতুনভাবে আস্বাদন করা যায়— তাঁর সারা-জীবনে এর আগে তা তিনি জানেন নি। অন্য নারী হয়তো এ কথা জেনে নিতো অপারিবারিক প্রেমের ভিতর দিয়ে। এবং, সে তাঁর স্বাধীন প্রেমের কারণেই হয়ে উঠত সংশ্লিষ্ট সকলের সমালোচনার বিষয়। অতসীবালা সেটা হলেন তাঁর ধর্ম-পথের জন্য। প্রেম, ধর্ম অথবা রাজনীতি যাই হোক না কেন, বিবাহিত নারীর স্বাধীন পদক্ষেপ যে পুরুষ-শাসিত সমাজে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে— এটাই সতীনাথের দেখানোর বিষয়। এই দেখানো এই উপন্যাসে গবেষণাগারে পরীক্ষার মতো নির্মম অথচ জীবন্ত হয়েছে। তার একদিকের কারণ অবশ্য এই যে, সুবোধবাবুর যন্ত্রণা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের মতো তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হয়নি— হবার কথাও ছিল না। নিজের চাপা আত্মম্ভরিতা ও বেদনার মিশ্রণে তাঁর সমস্ত ব্যাপারটা হয়েছে অত্যন্ত বাস্তব। অত্যন্ত সাবয়ব তাঁর অস্তিত্ব।

অন্যদিকের কারণ অতসীবালা। কিন্তু অতসীবালার ব্যাপারটি একটু দুর্বোধ্য। অতসীবালা তাঁর দাম্পত্যজীবনে কী পাননি, আশ্রমের জীবনে তিনি কী পেলেন— সেটা উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। একটা বিষয় বোঝা গেল— অতসীবালা শক্ত মেরুদণ্ডের মেয়ে। সেটা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি— সুবোধবাবু পারেননি— এমনকি অতসীবালা নিজেও পারেননি, সেটা হল দরকার হলে তিনি কতটা যেতে পারেন। সহস্র সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত নারীজীবন। প্রেমের অস্তিত্বগ্রাসী আকর্ষণেও এই সম্পর্কসূত্রগুলি সহজে ছিঁড়তে চায় না। অতসীবালা কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের মুহূর্তে একবারের জন্য পিছু ফিরে তাকান নি। অতসীবালারই মেয়ে যে মণি সে কথা বোঝা যায় মণির মধ্যে অতসীবালার ধাতুপ্রকৃতির বিদ্যমানতায়। সে কণ্ঠি ছিঁড়ে ফেলে পারিবারিক বিভেদের শক্তি-বিন্যাসে পিতার পাশে নিজের স্থান বেছে নেবার সিদ্ধান্ত যেদিন ঘোষণা করেছে, সেদিন থেকে আর পুনর্বিবেচনা করেনি। মণির আচরণটা যেমন মোহ নয়, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত— অতসীবালার আশ্রম-জীবন-গ্রহণ কোনো মোহ নয়, সিদ্ধান্ত। তিনি একবারই জীবনে স্বাধীন আচরণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন— তাতে ব্যাঘাতের সম্ভাবনায় তিনি নির্মমভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন। সুশীল যদি তাঁর অনুগামী না হত তাহলে তিনি সুশীলকেও ত্যাগ করতেন, এ প্রমাণ কাহিনীতে দুর্লভ নয়। কাজেই এটাকে মোহ বলে আখ্যাত করা ঠিক হবে না। কিন্তু তা হলেও একথা জানতে ইচ্ছে করে—কী তিনি

পেয়েছিলেন? অবশ্য আগের কথাটা সেক্ষেত্রে এই হয়, সুবোধবাবুর সংসারে কী তিনি পান নি। যখন দেখা যায় এই দুটোরই কোনো সদুত্তর নেই— তখন জানতে ইচ্ছে করে অতসীবালা কি শূন্যের বিনিময়ে শূন্য বেছে নিলেন? এ কি লেখকের দিক থেকে অতসীবালা-কল্পনার ত্রুটি, না, এটাই অতসীবালার নিয়তি!

কোনো বৃহত্তের সম্মুখে দাঁড়ালে, অথবা, কোনো মুক্তির মুখোমুখি হলে ব্যক্তি বুঝতে পারে তার অসম্পূর্ণতাকে, তার বদ্ধতাকে। অতসীবালা 'রেখাকৃষ্ণ'-পর্যায়ে কোন বৃহত্তর সম্ভাবনার আভাস পেলেন? সে কি শুধুই রাসপূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রালোকে কৃষ্ণমূর্তি বিভ্রমে নিঃশেষিত? অনুষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠানের আড়ম্বর সম্পর্ক ভেদে অক্ষম অতসীবালা অন্তত একটা আধ্যাত্মিক উন্নীত অবস্থা অনুভব করবেন এটা তো প্রত্যাশিত! অতসীবালার সেরকম কোনো উন্নয়ন আমরা দেখিনি। তার পরবর্তী কার্যক্রমে বোঝা গেল দাম্পত্য-সংসারের বদলে তিনি আশ্রম-সংসারের ভূমিকা বেছে নিয়েছেন। বিনিময়-হেতুটা তাঁর নিজের কাছেও কি স্পষ্ট হল? এই অস্পষ্টতা তাঁর চরিত্রেরই অস্পষ্টতা। বিস্মিত হই একথা ভেবে, সতীনাথ কেন এই অস্পষ্টতাকে প্রশ্রয় দিলেন! ভগবানকে কখনো বোঝা যায় না, আমরা নাস্তিকেরা যদি তাঁকে কখনো বুঝেই থাকি তবে তা ভক্তের ভিতর দিয়ে। ভক্ত অস্পষ্ট হলে ভগবান নিরর্থক। অতসীবালার ক্ষেত্রে তাই হল। চিত্রাসখীর না হয় সখ্যরস— না হয় তাঁর সখীভাব; অতসীবালার দাস্যভাবরসে স্থিতি কি ঠিক বৈষ্ণবীয় প্রতীতির দ্বারা বিশিষ্ট? অতসীবালা কি কোনো ভাবেরই ভাবয়িত্রী? তা মোটেই মনে হয় না। আশ্রম জীবনের শৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি নিজেকে যেভাবে মিশিয়ে দেন সে ব্যাপারেও তাঁকে কোনো ভাবরসসিদ্ধ বলে মনে হয়নি। কিন্তু এই শৃঙ্খলার সঙ্গে তার পূর্ণ লীন হওয়ার ভিতরে একটা শক্তির পরিচয় রয়েছে। আবার বলছি, সেটা তাঁর সিদ্ধান্তের অনমনীয়তার প্রমাণ। সুবোধবাবুর সংসারে এই শক্তি প্রকাশের অবকাশ তিনি পাননি। এখানে দুই স্বামী-স্ত্রীর প্রভেদটাও আমাদের নজরে পড়ে। সুবোধবাবুর ক্রোধ অবশ্যই গৃহস্বামীর ক্রোধ— গৃহবিনষ্টির ক্রোধ। কিন্তু সেই ক্রোধের ভিতরে একটা ক্ষোভও ছিল। এই ক্ষোভটা অন্তার্থে অভিমান। আর তা তো তাঁর ভালবাসারই ছায়া। অতসীবালার কিন্তু কোনো ক্ষোভ বা ক্রোধ ছিল না। তখনই সন্দেহ জাগে তা হলে কি অতসীবালা সুবোধবাবুকে আবেগের সঙ্গে ভালবাসেননি। তাঁর কন্যার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম— পুত্র সম্বন্ধেও কি তাঁর কোনো আবেগ

ছিল ?— ধর্মজীবন তাঁকে কোন্ মূল থেকে টেনে নিয়ে গেল, এ কথা পরিষ্কার করে বলা হল না। আবার, এটাও পরিষ্কার করে বলা হল না— অন্তত তাঁকে দেখে তা জানা গেল না, কোন্ আকাশ তিনি পেলেন। এখানেই এই তাৎপর্যপূর্ণ নিরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। বৃন্দাবনের আশ্রম-জীবন কী অর্থে সত্য, অতসীবালার জীবন-দর্পণে সেটা প্রতিফলিত হল না। তাই কি লেখককে এমন মন্তব্য করতে হয়— 'এবার শ্রীরাধারানীর রাজ্যে এসে অতসীবালা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলেন বলা শক্ত ?' যার অর্জন নয় সুপরিস্ফুট, তার বর্জন কীভাবে অর্থপূর্ণ হবে। তাই তাঁর প্রত্যাবর্তনের মধ্যেও নেই পরাভবের মহিমা— তিনি শুধু সময়ের হাতে নিঃশেষিত হয়ে পরিত্যক্ত হলেন আশ্রম-বাসীদের দ্বারা।

পাঁচ

এই উপন্যাসে চিত্রাসখী রেখাকুঞ্জে রাসপূর্ণিমা যতখানি রহস্য-ঘন করে তোলেন বৃন্দাবনে দেখা গেল সে রহস্য অনেকখানি সংবৃত। বৃন্দাবনে চিত্রাসখী-সুশীল-সম্পর্ক-সূত্রের প্রয়োজন কিছুটা হয়েছে আশ্রম-রহস্যভেদের জন্য। আর কিছুটা তা কাজে লেগেছে সুশীলের 'বড় হয়ে ওঠা'-র ওপর আলোকসম্পাতের জন্য। আশ্রমরহস্য তৈরি হতে না-হতেই তার ভেদ ঘটানোর জন্য লেখক ব্যস্ত হয়েছেন— ঠিক একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সতীনাথ ধর্মীয় আশ্রমের মোহাবেশের প্রতিরূপ গড়ার দিকে তত মনোযোগী ছিলেন না, যত মনোযোগী ছিলেন তার প্রাতিষ্ঠানিক টাকা আনা পাইয়ের বস্তুরূপের ছবিটি তুলে ধরার ব্যাপারে। একটা এহেন আশ্রমজীবনের পরিচালনগত খুঁটিনাটি, তার প্রাত্যহিক বিধিনিষেধ— এসব কিছুর বাস্তব বিবরণ উপন্যাসে এসেছে, কিন্তু সে-আশ্রমজীবন কোন্ আধ্যাত্মিক গূঢ় আবেগের ধাক্কায় চলে— সতীনাথ ইচ্ছে করেই যেন সেটা বললেন না। সেটা তাঁর 'পয়েন্ট' নয়। লক্ষ্যণীয় মাত্রাবোধে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। যে কথা তিনি বললেন না তা বলতে গেলে তাকে একবাঁধাই'য়ে দুটো উপন্যাস ছাড়তে হয়। তিনি দেখাতে চাইলেন এই জাতীয় আশ্রমজীবনের উল্টোপিঠ —অথচ তা দেখালেন তিনি ন্যারেশনের অনিবার্য লজিক ধরে— সুশীলের বয়ঃক্রম ও চেতনা বিকাশের সূত্র অনুসরণ করে।

সুশীল অতসীবালা নয়। সে আশ্রমজীবনে যা পেয়েছে তা কোনো

লোকোত্তরের ইশারা নয়। সে এখানে একটা সজীব ছেলের মতো গাঢ় মানবিক সম্পর্কের উত্তাপ অনুভব করে— স্নেহ, প্রীতি, প্রশংসা— অপরের কাছে মূল্যবান হবার আনন্দ— যা সে সুবোধবাবুর নারীসঙ্গবর্জিত সংসারে আর পাচ্ছিল না। আশ্রম তার ভালই লাগে তার মা সেখানে আছে বলে— আর— 'গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসতে পারার নেশা, চিত্রাদির কাছে পড়বার নেশা ছাড়াও আরও একটা জিনিসের মাদকতার স্বাদ এই সময়টায় সে পেতে আরম্ভ করে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে তার ভাল লাগে বেশি।' এইভাবে সুশীল আত্মসচেতনতার পথে পা বাড়ায়। এটা আশ্রম-নির্দিষ্ট বাঁধা সড়ক নয়— এ তার নিজের রাস্তা। ঠিক এই সময়েই সুশীল দুটো ধাক্কা খেল একসঙ্গে: শাশির ছায়ার ঘটনায় ভজনসিদ্ধ গুরুদেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব সুশীলের কাছে চুপসে ছোট হয়ে গেল। এবং, তাকে আশ্রমের চালক হিশাবে ভিড়িয়ে নেবার ব্যাপারে সংগঠনকর্তা গুরুদেবের হিশাবী সংসারী বুদ্ধিটি তাকে বঞ্চিত করে তুলল। আমরা বুঝি, আশ্রমের 'ইল্যুশন' এবার ভাঙছে। সে ভাঙন পূর্ণ হল চিত্রাসখীর ফাইলেরিয়া জ্বরে এবং সব শেষে হারচুরির ঘটনায়। চিত্রাসখীর সখীত্ব পরিহার করে জীবনে প্রত্যাবর্তন আর আশ্রমের সঙ্গে সুশীলের সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা একই ঘটনার এপিঠ ওপিঠ।

'রিয়্যালিটি' আর 'ইল্যুশন' যেখানে জড়িয়ে থাকে সেখানে 'ইল্যুশন' ভেঙে গেলে 'রিয়্যালিটি'র স্বরূপ-সংক্রান্ত অনুভূতিও পাল্টে যায়। সুশীলের তা-ই হল। কিন্তু অতসীবালার? আমরা সে কথা জানতে পারলাম না। চিত্রাসখীর বুক ভাঙা জীবননাট্য ও মর্মস্রাবী শেষোক্তির। 'সলজ্জ, ভীরু একটি মুখের ছবি অনেক সময় আমার মনে পড়েছে। তারপর সেটা মনের তলায় কোথায় চলে গিয়েছিল তার খোঁজ আর করিনি। মনের তলায় থিতিয়ে পড়া সেই ছবি এতকাল পর আবার কিছুদিন থেকে মনে পড়তে আরম্ভ করেছে।' পাশে আমরা যখন অতসীবালার মৌনকে প্রত্যক্ষ করি তখন সেটাকেই মনে হয় সব থেকে করুণ। অতসীবালার পরাভূত প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কোনো ট্র্যাজিক মহিমার কথা সতীনাথ ভাবেন নি। মুমূর্ষু অতসীবালার চারপাশে সমবেত পরিজন শুধু একথাই প্রমাণ করল সবকিছু কত নিরর্থক হয়ে গেছে। সময় আমাদের অসহায় করে ফেলে, আবার সময়ই আমাদের ক্ষোভ অভিমান সব ভুলিয়ে দেয়।

হরিদাসের আত্মহত্যার পরে আর কাহিনীর অগ্রসরণ প্রয়োজন হল না। একটা closed ending বা সংবৃত সমাপ্তি এ কাহিনীর অবশ্য প্রাপ্য ছিল।

সকলেই একটা অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞতার পথে দীর্ঘকাল হেঁটেছে— এবার শান্তি— না হোক, বিরাম। জীবনের প্রান্তে এসে, পরিণতিতে এসে নির্মোহ অবস্থায় পৌঁছে 'ইল্যুশন' এবং 'রিয়্যালিটি'-র মীমাংসা বুঝি সম্ভব হল। চিত্রাসখী একজন যথার্থ ভদ্রলোক— এ উপন্যাসে প্রধান প্রতীকী চরিত্র। কোন্‌টা 'ইল্যুশন' কোন্‌টা 'রিয়্যালিটি' এই দ্বন্দ্বে তিনি যখন 'রিয়্যালিটি-কেই স্বীকৃতি দিলেন তখনো 'ইল্যুশনে'র জন্য তাঁর বেদনা তিনি অস্বীকার করেননি কেননা, সেটাও তো তাঁরই একটা অংশ— তাই আশ্রমের দেওয়া ছদ্মবেশ তিনি আশ্রম-দ্বারেই রেখে গেলেন— যমুনায় বিসর্জন দিলেন না। এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের রহস্যময় চরিত্র চিত্রাসখী। এ-জাতীয় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নেই। আইডেনটিটির যে-যন্ত্রণা পিরানদেল্লোকে নাটক লেখায় সেই যন্ত্রণাই শেষদিকে চরিত্রটিকে পেয়ে বসেছিল। তবে একথাও ঠিক যে, চরিত্রটি নিয়ে সতীনাথ মুশকিলে পড়েছিলেন। এ চরিত্রকে প্রত্যক্ষ আনার সুযোগ এ উপন্যাসে ছিল না— একমাত্র শেষ আটচল্লিশ ঘণ্টাই চিত্রাসখীর চরিত্র প্রত্যক্ষতা পেয়েছে।

ছয়

শ্রীযুত গোপাল হালদার ঠিকই বলেন যে, 'যথাসম্ভব অন্তর্মুখী দৃষ্টি, অন্তরালাপ, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নেপথ্যে রেখে সতীনাথ রচনা করেছেন চিরায়ত আধারে একটি গল্প— স্তঁদাল, তলস্তোয় প্রভৃতির ধারায়— প্রুস্তের নয়'[৪]। কিন্তু তা হলেও একটা বিষয়ে কোন ভুল নেই, সতীনাথের এই অনন্ত বিষয়ের ন্যারেশন-গত লজিক অনন্ত বলেই এর আঙ্গিক-রীতি— বিশেষ এর ভাষা-রীতিও অনন্ত। আমরা আগেই বলেছি স্ব-তন্ত্র চরিত্র নয়, ব্যক্তি পাত্রগুলির স্ব-তন্ত্র চেতনাই সতীনাথের রূপায়নের মুখ্য বিষয়। সেই চেতনার রূপায়নের জন্য নিশ্চয় তাঁকে একটা টেক্‌নিক খুঁজতে হয়েছে। ১৩৬২-৩০শে আষাঢ়-এর 'দেশ'-এ প্রকাশিত তাঁর 'পড়ুয়ার নোট থেকে' নামে লেখাটিতে দেখা যায়, তিনি একটা বিষয় নিয়ে ভাবছেন। নিছক বিশ্লেষণ নয়, আবার শুধু ভাবানুষঙ্গ-গুলোকে প্রকাশ করাও নয়— এই দুইকে অধিগত করে একটা সমগ্রকে তিনি সন্ধান করছিলেন। প্রুস্ত যদি কোথাও তাঁকে প্রভাবিত করে থাকে তবে তা

৪. শ্রীগোপাল হালদার লিখিত 'সতীনাথ ভাদুড়ী: সাহিত্য ও সাধনা' নামক গ্রন্থে 'দিগ্‌ভ্রান্ত' আলোচনা।

এখানে ; কিন্তু এই বইয়ে তিনি খুঁজছিলেন আরেক রীতি— 'যেখানে লেখকের দেওয়া বিবরণ, পুস্তকের কোনো চরিত্রের মনে মনে ভাবা কথা, ও সেই চরিত্রের মুখে প্রকাশিত কথা সবগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে যান। স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না কোনটা কী, আভাস ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। একটা থেকে আরেকটায় যাবার সময় যাতে পাঠক হোঁচট না খায়,—এমন একটা রীতিই এই উপন্যাসের ন্যারেশনের যুক্তিসম্মত রীতি।[৫] যেমন :

অতসীবালার এ যুক্তিই বা ধোপে টেঁকে কই। মণিকে হয়তো তিনি সত্যি ভুলতে চান ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, ছেলেকে তিনি আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন। জপ ও আশ্রমসেবার স্থান সবচেয়ে উঁচুতে, কিন্তু তারপরই আসে ছেলে। আটপৌরে সংসারের সঙ্গে শেষ বন্ধন-সূত্র হয়ে ছেলে থাকুক চিরকাল। এ ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো কাম্য নাই ; ছেলের জন্য তিনি গর্বিতা।

এই অনুচ্ছেদে 'মনে হত' এই ক্রিয়াপদটি একবার মাত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় সবটাই অতসীবালার 'চিন্তন'। কাহিনীকথকের কথা আর ভুক্তভোগীর কথা এখানে এক সঙ্গে মিলেমিশে আছে। 'অতসীবালার এ যুক্তিই বা ধোপে টেকে কই'— এ কাহিনীকথকের উক্তি আবার অতসীবালার আত্মবিশ্লেষণ। সুবোধবাবুর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার :

সুবোধবাবু লাঠি নিয়ে বার হলেন গেট পর্যন্ত ঘুরে আসবার জন্য। কখন সুশীল বা অনিল চা খেয়ে গিয়েছে— এখনও পেয়ালাটা এখানেই পড়ে আছে। এই অগোছালো ভাবটা ছেলেমেয়ে পেয়েছে অতসীবালার কাছ থেকে। এস্বভাব চিরকাল তাঁর অপছন্দ। তাই চায়ের পেয়ালা, জলের গ্লাস, তেলের বাটি, ওষুধের শিশি যেখানে-সেখানে পড়ে থাকতে দেখলে তিনি থাকতে পারেন না আজকাল। হাতে করে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দেন। মুখে কিছু বলেন না ; করে দেখিয়ে শেখাতে চান বাড়ির লোকদের। পেয়ালাটা ভেতরে কলতলায় রেখে তিনি লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে বার হলেন গেটের দিকে। এই অগোছালো ভাবটা সুশীলের মায়ের ছিল অতিমাত্রায়। পয়সার অভাব নাই কিন্তু সব জিনিস আগে থাকতে ভেবেচিন্তে গুছিয়ে রাখা, সে ক্ষমতা ছিল না কোনোদিন।…যে যত অগোছালো ছিল সে দিনের পর দিন আশ্রমের ওই বাঁধা বিধিনিয়মের

৫. সতীনাথ গ্রন্থাবলীর চতুর্থখণ্ডের অন্তর্গত পড়ুয়ার নোট।

শৃঙ্খলের মধ্যে কাটায় কি করে ভেবে তিনি অবাক হন। মানুষের আসল স্বভাব কি বদলায়? এ লোকটা এতকাল পরে এখানে এসে আবার সেই যজ্ঞডুমুরের রসসেবন আরম্ভ করছে।

এই উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যটি লেখকের প্রদত্ত ঘটনা-বিবরণ। আর একটি ঘটনা-বিবরণ-বাক্য— 'পেয়ালাটা ভেতরে কলতলায় রেখে তিনি লাঠি ঠকঠক করতে করতে বার হলেন গেটের দিকে'। বাকি সবটাই সুবোধবাবুর অতসী-চিন্তন। সবকিছু তখন অনুষঙ্গময়। এমন কি হরিদাসের কথাও তাঁর মনে অতসীবালার সঙ্গেই বিজড়িত। তাই পন্টুর কথা শুনে— ('সন্ন্যাসী দাদু গাছে উঠে হাঁড়ি বাঁধছেন') হরিদাসের বাস্তব উপস্থিতি অতসীবালার স্মৃতির দরজা খুলে দেয়। 'মানুষের আসল স্বভাব কি বদলায়'— এই সূত্র ধরে সুবোধবাবুর চিন্তা আবার ফিরে গেল হরিদাস-প্রসঙ্গে— কিন্তু অতসীবালা-ব্যতিরিক্ত হয়ে নয়। 'যজ্ঞডুমুরের রসসেবন'— এই কথার মধ্যে যে ধিক্কারপূর্ণ ব্যঙ্গ তাও হরিদাস সম্বন্ধে সুবোধ ডাক্তারের চিন্তার প্রতিক্রিয়া।

এই ভাষা-রীতি পরিহৃত হয়েছে দুবার। দুবারই বাইরের ঘটনা তখন তুঙ্গে উঠেছে। একবার চিত্রাসখীর আশ্রম ত্যাগের সময়ে আর শেষবার হরিদাসের আত্মহত্যার পর। চিন্তা নয়, ঘটনাই তখন প্রবল বলে। সমাপ্তি-সূচক চারটি ছোট-বড়ো অনুচ্ছেদে কাহিনীকার স্বয়ং কথা বলেছেন। ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় টেনশন, চিন্তন-জট এই সবের বাইরে দাঁড়িয়ে লেখক যা প্রত্যক্ষ করলেন, তা আর চরিত্র নয়, চেতনা নয়— জীবন। সে শুধু নিজের পথ ধরে চলে। সতীনাথও কি নিজের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে সে কথাই অনুমান করছিলেন?

তার গলা ভাল নয় ভাঙা গলা, কিন্তু তাই শুনে বিভূতিভূষণ বলছেন—

সরাটির চরে ঝিঙেফুল ফুটেছিল সেবার, ঝিঙেফুলের হলুদ ক্ষেত, আর পাগলঠাকুরের গানের ব্যাপারে সুর একতারে বাঁধা। ধু ধু সরাটির চরে, নির্জন সরাটির চরে ঘুলিঘুলি আধ অন্ধকারে কেউ ঝিঙের ফুল ফুটতে দেখেছিল ত্রিশ বছর আগের এক ভাদ্র সন্ধ্যায়? তাহলে পাগলঠাকুরের গান বুঝতে পারবে।

বিভূতিভূষণ ছাড়া এমন কথা এমন করে কেউ বলতে পারেন না। কথাটি আপাতবিচারে একটি সরল অভিজ্ঞতার দান। কিন্তু গভীর বিচারে একটি কাব্যতত্ত্বসংক্রান্ত গূঢ় কথার দিকে ইঙ্গিত করে। প্রত্যেক কবিতা, এমনকি, ক্ষুদ্রকায় নিরঙ্কুশ লিরিকও আসলে এক চরিত্রভাষা। যে গল্প থেকে একটি আমরা ঐ উদ্ধৃতিটি দিলাম[১] তাতে গল্পের মূল চরিত্র পাগলঠাকুর একটি গান গেয়েছিল। সেই গানে এই সব কলি ছিল—

তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাখার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো
দেখতে এলাম তাই।

এই গানকে, এর শব্দ-উপাদানের অতি তুচ্ছ হেরফেরকে, এর ছন্দকে ঐ চরিত্র থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। যেমন ব্যক্তিপাত্রটি তার পটভূমির সঙ্গে প্রবলে গভীরে অন্বিত, তেমনি ব্যক্তিপাত্রটির মুখের ভাষা— যাকে চরিত্র-ভাষা বলছি— সেই পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। কোনো কবিতার চিত্র বা চিত্রকল্প সেই কবিতার শাব্দ উপাদান ও ছন্দোভূমির অন্বয়ে পুষ্টি পায়, এইটুকু বলা মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের বলার কথা আরেকটু আলাদা। ধ্বনিগত উপাদান ও ও ধ্বনিগত এক বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সে চিত্রকল্পের

১. পিথিবের নিচে : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অরাজ্য। অন্তত্র তার উপাদানসাধ্য থাকতে পারে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে না। এটাই চিত্রকল্প বিচারে শেষ কথা যে, কবিতার ধ্বনির জগতে সে জন্মেছে। সে ধ্বনির জগতের বাইরে সে অন্তত্র হতে পারে। কিন্তু তার সাক্ষাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'অরূপ রূপের পাথার পাড়ে'— এই ভাবপ্রতিমা পাগলঠাকুরের যে গাঢ় অভিজ্ঞতার দান, বলার ছাঁদটিও সেই অভিজ্ঞতার দান। সন্নাটির চয়ের হাওয়ার সেই বলার কথা আর বলার ছাঁদ পুষ্ট— ভাবপ্রতিমাটিকে সেখান থেকে আলাদা করা যাবে না।

সুতরাং শুধু ভেহিক্‌ল ও টেনরের সম্পর্কেই চিত্রকল্পের গূঢ়ার্থভাষণ বিচার্য নয়। তাকে অনুভব করতে হয় তার অর্জিত নিজস্ব সজীবতার পরিমণ্ডলে। সেইজন্ত কেবল অভিনবত্ব বুঝিয়ে চিত্রকল্প বিচার সম্পূর্ণ হয় না। প্রাক্ত সমালোচকও ওরিজিন্যালিটির সঙ্গে আরেকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন 'ফোর্স'। এই 'ফোর্স' আসে কবিতাটির সমগ্র পরিমণ্ডল থেকে —ওরিজিন্যালিটি কবির অভিজ্ঞতার দান। পাখির নীড় কবির কাছে চোখের উপমান পেয়েছে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কাছে :

পান্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে।[২]

কিন্তু একথা বলতে বাধা রিক্ত কুলায় প্রতীক্ষায় উৎসুক চোখের ছবি জাগিয়ে তুললেও, তা অভিনব হলেও, তা 'ফোর্সফুল' হয়নি। সজীবতায় তা স্পন্দিত হয়নি। সে সজীব স্পন্দন অবশ্যই অনুভব করা যায় বহু উচ্চারিত জীবনানন্দীয় চিত্রকল্পে—'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'। একটা কারণ তো বটেই— রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে চিত্রকল্পটি সহসা উদ্‌ঘাটিত, তার কোনো প্রস্তুতি নেই। অথচ চিত্রকল্পটি অত্যন্ত সাহসিক। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতায় চিত্রকল্পটি দেখা দিয়েছে কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের শেষতম পঙ্‌ক্তিতে। সাহসিকতার জন্ত নয়, অনিবার্যতার জন্তই এই চিত্রকল্পটি প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের লিরিকটিতে— যদি কবিতা হিসাবেই একে আমরা ধরি— তাহলে বলতেই হয় দলবৃত্ত ছন্দের এই চালে ঐ প্রকৃতির চিত্রকল্প ফুটি ফুটি করে উঠতে পারে; ফুটে উঠতে পারে না। তার জন্ত দরকার ছিল মিশ্র কলাবৃত্তের মন্থর সক্ষমতায়। যে-কথা বিশেষ ভাবে এখানে বলবার কথা তা হল— একটি বিশেষ কবিতার চিত্রকল্প ঐ বিশেষ কবিতার ছন্দের প্যাটার্ন বা কাঠামোর বাইরে কোথাও

২. অখণ্ড গীতবিতান—প্রেম—১৯৬ সংখ্যক গান।

নেই। চিত্রকল্পের পদার্থ থাকতে পারে, কিন্তু থাকে না চিত্রকল্পের বহু-মাত্রিকতা। 'পাখির নীড়ের মতো' এই চিত্রকল্পে পদান্তিক কম্পন জুটির মাত্রামূল্যের গৌরবে নীড়ের জন্য পাখির আকুলতা তো মূর্তি পেলই, পাখির জন্য নীড়ের প্রতীক্ষাও রূপ পেয়েছে। 'এতদিন কোথায় ছিলেন' এই অনুযোগে একাধিক অর্থ ব্যঞ্জিত হয়েছে বলে প্রতীক্ষার অন্তদিক মূর্ত হল।

কবিতার ধ্বনিমূল্যের সঙ্গে তার অর্থমূল্যের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। 'পাখির নীড়ের মতো' একথা বলার আগে 'এতদিন কোথায় ছিলেন' এই সংশয়ী প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে। 'এতদিন কোথায় ছিলেন' বাক্যাংশটিকে শুধু যে জিজ্ঞাসাত্মক করা যায় তাই নয়, বিস্ময়াত্মকও করা যায়। 'এতদিন কোথায় ছিলেন' তিনভাবে পড়া যায়:

ক. এতদিন কোথায় ছিলেন ?

খ. এতদিন কোথায় ছিলেন ?

গ. এতদিন কোথায় ছিলেন ?

নিম্নরেখ শব্দগুলি এক একবারে এক একরকম অর্থাধিপত্য সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রথমটির মধ্যেই আছে পরের চরণের পাখির নীড়ের চিত্রকল্পের অনিবার্য প্রণোদনা। তখন প্রতীক্ষক নারীর সেই ব্যাকুলতার ছবি ফোটে যে ব্যাকুলতা পাখির জন্য নীড়ের। আর নীড়ের জন্য পাখির ব্যাকুলতার কথা তো আছেই। একেই বলছি চিত্রকল্পের চারপাশ।

অর্জিত বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে উপলব্ধ বিষয়ার্থের যা প্রভেদ ঘটায় সেটাই, বা সে সব কিছুই কবিতার টেক্‌নিক্। 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা'—এখানকার চিত্রকল্পটি শুধু যে কবিতাটির বাইরের কোথাও নেই তাই নয়—এই ছন্দোগত কাঠামোর বাইরেও সে কোথাও থাকতে পারে না। তখনই বুঝি 'আর' এই সংযোজক অব্যয়টি কত দরকারী! এই অব্যয়টির সহযোগে আলো ও বুলবুলি পরস্পরের বিকল্প হয়েছে, সগোত্র হয়েছে। যদি ছন্দটা পাল্টাই তাহলে 'আলো বুলবুলি করিয়াছে খেলা হিজলের জানালাতে'— মাত্রাবৃত্তের এই চালে অর্থটা থাকতে পারে। আসল কবিতার ধ্বনিকাঠামো ও ধ্বনিমূল্যের অভাবে চিত্রকল্পটা থাকবে না। 'আলোর নাচন' এই চিত্রকল্পে মূল ইঙ্গিতটি নিহিত। পাখির আভাস আছে। পাখি নিজে নেই। কবিতায় ফোনেটিক্ কর্ম্ অবশ্যই অভিব্যক্তির প্রধান উপায়। এ নিয়ে কোনো বিবাদ কেউ কখনো করেছে বলে শুনিনি। কিন্তু এর সঙ্গে আরো একটি কথা সংযোজনযোগ্য। কবিতায় ফোনেটিক কর্ম্

কবির সুনির্দিষ্ট অর্থমূল্যের, তথা মূল্যবোধেরও অভিব্যক্তি। মেঘনাদ বধ কাব্যের ছন্দই রাবণ। রাবণই অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই ছন্দের মাত্রাবৃত্তে রূপান্তর ঘটলে রাবণ— দুর্বলতা ও সরলতায় মেশানো যে রাবণ, শুধু মেঘনাদ বধেরই রাবণ— সে রাবণ আর থাকে না।

একটা বিশেষ শব্দের অনড় অধিষ্ঠান শুধু কবিতাটির অবিকল্প আসনেই নয়, সেই ছন্দের কাঠামোর কথাটাও সেখানে সমানভাবে বিবেচ্য। অছন্দিত বাক্যে ব্যবহৃত একটা শব্দকে আমরা যে দাম দিই, তার যে ধ্বনিমূল্য, ছন্দের আধারে ধৃত হলে সে ধ্বনিমূল্য একটা অন্তরতর অভিজ্ঞানের অধীশ্বর হয়। সে কারণেই বলা যায়, কবিতার ছন্দকল্পনা মূল কল্পনার সহজাত। তারও একটা নৈতিক তাৎপর্য আছে। এই নৈতিক তাৎপর্যের কথা আমরা বলছি কবিতার আবেগগত ভূমির সঙ্গে ছন্দের আন্দোলনের সম্পর্কটি অচ্ছেদ্য বলে। মধুসূদন থেকে আমি একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করব :

> মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি
> কে বাঁচিতে চাহে আজি এ কর্বুর কুলে,
> কর্বুর কুলের গর্ব মেঘনাদ বলী।

এখানে 'কর্বুর' মাত্রাগণনায় যে মূল্য পাক্‌ না কেন, দুবার উচ্চারণে তার গুরুত্ব দুরকম। দ্বিতীয় 'কর্বুর' শব্দ উচ্চারণে বক্তা তার সমস্ত আবেগ ঢেলে দিচ্ছেন কুলের কারণে, কুলচূড়ামণি মেঘনাদের কারণে। প্রথম 'এ কর্বুর' চারমাত্রা পেয়েও যেন হ্রস্ব উচ্চারণ পায়। দ্বিতীয় 'কর্বুর' শব্দে তিন মাত্রা পেয়েই বিস্তারিত উচ্চারণ পায়। ছন্দের নৈতিক তাৎপর্য কত সক্রিয় এগুলি তার প্রমাণ। 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে'— এই চরণে সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে বিদীর্ণ তটভূমির যে চিত্রকল্প ফুটে ওঠে তার রহস্য ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে।[৩] প্রথম আটমাত্রায় দুটি বিসর্গধ্বনির ধাক্কায় যে দীর্ঘশ্বাস আটকে থাকে, তা যেন 'চলোর্মি'তে এসে মুক্তি পায়, বেদনায় বিস্তারিত হয়। 'চলোর্মি' পদমধ্যস্থিত রুদ্ধ দলে একমাত্রা পেয়েও আমাদের টেনে পড়ায়। ইমেজের টানেই দুরূহ শব্দগুলি চলে আসে— মধুসূদনের একথা মান্য— সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিবেচ্য, শব্দের কাঠামো ইমেজগুলিকে বিশিষ্টার্থ দেয়। সে বিশিষ্টার্থ শুধু ভেহিকল আর টেনরের দান নয়। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে এগুতে এগুতেই আমরা বুঝে নিই— মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আর রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্যটা শুধু অন্ত্যমিলের অস্তি নাস্তির তফাত

---

৩. শ্রীভবতোষ দত্তের 'উপমা মধুসূদনস্য' শীর্ষক প্রবন্ধ।

নয়। মিল্টন যেমন তাঁর ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের জন্য, সেই ছন্দ, সেই ধ্বনিকাঠামো ছাড়া যেমন 'প্যারাডাইস লস্ট' লিখিত হতে পারত না— মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর জন্যই তেমনি তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনা। সে বিশেষ অনুভূতিটি থাকলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি কাঠামোয় বিশেষ বিশেষ চিত্রকল্প মুঞ্জরিত হতে পারে, 'তিলোত্তমা সম্ভবে' তা ছিল না বলেই সেখানে চিত্রকল্প এলিয়ে গেছে। আবার 'বীরাঙ্গনা'র 'মেঘনাদবধে'র প্রাণবস্তুটুকু নিয়েই— অর্থাৎ বীর্যের সঙ্গে কারুণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েই এই ছন্দের বাক্‌স্পন্দ এত সজীব হয়ে উঠল। দৃষ্টিকোণের যে দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ থাকলে একটি লিরিক নাটকীয়তা পায়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ তার দান। সেজন্যই মধুসূদন যখন 'মেঘনাদবধে'র পঞ্চম সর্গে লেখেন :

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে

তখন সেই পঙ্‌ক্তিটিতে এমন কিছু পাই যা মধুসূদনের বা মেঘনাদবধের অনুষঙ্গবহ নয়। এ জন্যই শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ের কাছে ঐ পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রপ্রসাদের স্মৃতিসঞ্চারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধুসূদনের দিক থেকে এই পঙ্‌ক্তিটি কেবলমাত্র অভিধার্থকে বহন করছে। কিন্তু 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি' এই চিত্রকল্পে 'পঙ্কজ' শব্দটি মধুসূদনের মাত্র অসামান্য শব্দজ্ঞানেরই পরিচায়ক নয়। একে তিনি শুধু ছেকানুপ্রাসের অনুরোধেই ডেকে আনেন নি। 'পঙ্কজ' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লঙ্কাপুরী, রক্ষোবংশ ও মেঘনাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মধুসূদনের নৈতিক সচেতনতা। 'কর্বুর' শব্দটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ 'গর্ব' শব্দটিকে ঠাঁই দেবার জন্যে।

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সে-পরিমাণে ড্রামাটিক নয় যে পরিমাণে লিরিকাল। 'চিত্রাঙ্গদা' পড়লেই সে-কথা প্রমাণিত হয়। 'চিত্রাঙ্গদা'র নারীত্ব, ব্যক্তিত্ব ও আত্মমোচনের বিবদমান দৃষ্টিবিন্দুগুলিকে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় মূর্তি ততটা দিতে চাননি— তিনি তার ভেতর থেকে খুঁজে নিতে চেয়েছেন শান্তলতাকে। 'বিদায় অভিশাপ'কে তিনি যে 'বীরাঙ্গনা'র আদর্শে দেবযানীর পত্রে রূপান্তরিত করেন না তারও কারণ সেটাই। এইজন্যই যে-কোনো বড়ো কবির চিত্রকল্পের মূল অর্থ খুঁজতে হয় তার পরিপার্শ্বের মধ্যেও। ভিতর বাহির মিলিয়েই সে সত্য। ধ্বনি কাঠামোর বিচার সে জন্য এত জরুরী হয়ে পড়ে।

এগুলো আমাদের বলে দেয় চিত্রকল্পের আশেপাশের রহস্য। সে রহস্যটিই তো চিত্রকল্পের প্রাণস্পন্দনের মূলকথা।

কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি ললাটে, আহা, তারারত্ন যথা !

উদ্ধৃত এই অংশে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির গুরু অক্ষর তথা যুক্ত ব্যঞ্জনের গৌরব তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটিতে সম্বৃত। গুরু অক্ষরবিরল এই পঙ্‌ক্তিটি নিজেই যেন হয়ে উঠেছে সর্বালঙ্কার বিবর্জিত সীতা। চিত্রকল্পটির চিত্তজয়ের মূল রহস্যটি মধুসূদনের সীতা সম্বন্ধীয় নৈতিক ও হার্দ্য অনুভূতির দান।

উপযুক্ত ছন্দাধার ও ফোনেটিক্ ফর্ম্ না পাওয়া পর্যন্ত শুধু 'টেনর' ও 'ভেহিক্‌ল' মাত্রকে অবলম্বন করে একটা চিত্রকল্প সার্থক হয় না। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'বিদ্যুৎ সর্প মেঘ' চিত্রকল্পটির কথা স্মরণ করা যায়। 'ছবি ও গান'-এর "আড়ম্বর" কবিতায় আমরা চিত্রকল্পটির প্রথম দেখা পেলাম—"জলন্ত বিদ্যুৎ-অহি | ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি | অন্ধকারে করিছে দংশন"— এখানে চিত্রকল্পটি কেবল একটি আলঙ্কারিক প্রসাধন মাত্র। 'উৎসর্গে'র "মরণ মিলন" কবিতায় চিত্রকল্পটি উন্নীত হল অন্য এক ভাবলোকে—"যদি বিদ্যুৎ-ফণী জ্বালাময় | তার উদ্যত ফণা বিকাশে।" কিন্তু এই চিত্রকল্পটি যথার্থ প্রতিমা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'পূরবী'র "তপোভঙ্গ" কবিতায় :

"নির্জন প্রান্তর তলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।"

এখানে মহাজাগতিক চেতনায় এক মহীয়ান পটভূমিকা কল্পিত হয়েছে। ৮+১০ মাত্রার মিশ্র কলাবৃত্তে যে শব্দবিন্যাস বা ফোনেটিক্ ফর্ম্ গড়ে উঠেছে তাতেই চিত্রকল্পটি বহুমাত্রিক হয়ে উঠল।

কবিতার ছন্দ পরিবর্তিত হলে সে হয়তো নতুন চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাক্তন চিত্রকল্পকে বিদায় দিতে হয়। কবিতার ছন্দাধারের সঙ্গে চিত্রকল্পের সম্পর্ক এমনই নিবিড়। প্রসঙ্গত আমরা "রাহুর প্রেম" কবিতাটির কথা আলোচনা করতে পারি। 'ছবি ও গান'-এর "রাহুর প্রেম" নামে যে কবিতাটি 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছে তা বহুলাংশে পরিবর্তিত। মূল কবিতাটি প্রথম থেকেই বারেবারে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ) প্রথম খণ্ডে 'ছবি ও গান' অংশে আমরা যে "রাহুর প্রেম" কবিতাটি পড়ি তা প্রাঙ্‌মানসী যুগের মাত্রাবৃত্ত রীতিতে লেখা। কিন্তু পরিবর্তিত সংস্কৃত পাঠে দেখা যায়, কবি 'মানসী'র যুগে বাংলা মাত্রাবৃত্ত রীতিতে যে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেই ধারাকে মান্য করেছেন। অর্থাৎ

যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা দিয়েছেন। এর ফলে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত "রাহুর প্রেম" কবিতায় ছন্দের সাবলীলতা এসেছে। কিন্তু পুরাতন "রাহুর প্রেম" কবিতায় অনেকগুলি ছবি বিসর্জন দিতে হয়েছে। যেমন :

"চিরভিক্ষার মতন দাঁড়ায়ে রব সম্মুখে তোর।
'দাও দাও' বলে কেবলি ডাকিব ফেলিব নয়নলোর।"

কোন সন্দেহ নেই, আধুনিক মাত্রাবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার নিখুঁত চাল সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু মূল কবিতায় এই ছবিটি হারিয়ে গেছে :

"বিশীর্ণ-কঙ্কাল চিরভিক্ষা সম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
দাও দাও বলে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়ন-লোর।"

বিশীর্ণ-কঙ্কাল চিরভিক্ষার ছবিটি পরিবর্তিত ছন্দে প্রতিফলিত হল না। এই ভাবেই হারিয়ে গেছে মূল কবিতার :

"গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃতদেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে।"

এই ছবিটি পরিবর্তিত সংস্কৃত পাঠে নেই। এই জন্যই বলা যায় কবিতায় চিত্রকল্প কবিতার সব কিছুর মতোই তার ছন্দোস্পন্দনেরও দান বটে। 'ছবি ও গান'-এর "রাহুর প্রেম" কবিতায় অবশ্যই বিশৃঙ্খলা ছিল। 'সঞ্চয়িতা'র মার্জিত ও পরিবর্তিত পাঠে ছন্দে ও বিন্যাসে শৃঙ্খলা এসেছে। কিন্তু মূল কবিতার আপাত বিশৃঙ্খলা ও অবিন্যাসের মধ্যেই ছিল কবিতাটির শিকড়। "রাহুর প্রেম" কবিতার আবেগভূমিতে সে শিকড় পুষ্টি পেয়েছে। তার এলোমেলো হাওয়াতে তার বিচিত্র পাপড়ি ফুলগুলি ফুটেছে। হাওয়া পালটে দিলে ফুলগুলি ঝরে পড়ে। শব্দধ্বনির সঙ্গে— যদি তা ছন্দোবদ্ধ হয়ও তাহলেও তার সঙ্গে আবেগের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সত্বর বলা যাবেনা। কিন্তু কীর্তনের 'মা' বা 'বঁধুহে' শব্দে স্বরধ্বনির ঊর্ধ্বগ গতি নিশ্চয়ই আবেগের বার্তাবহ। আদিকালে ধ্বনির সংগীতময় ব্যবহারে একদা ধ্বনি ও অনুভূতির

সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। আজও তার উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি শুধু সংগীতে নয়, কবিতাতেও। ছন্দোবদ্ধ বাণী সংগীতের বিকল্প নয়। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বাণীর সঙ্গে সংগীতের এক জায়গায় মিল আছে— তা হল তাল বা চালের ক্ষেত্রে। ছন্দোস্পন্দনে তথা কবিতায় ধ্বনিবিন্যাসের সঙ্গে কবিতার সামগ্রিক অর্থের সুগভীর যোগ আছে বলেই এই মিল। সেই জন্ত মর্মর ধ্বনিতে যে পুষ্পিত হয়, মন্ত্রের হুতাশে তার দেখা মেলেনা। হাওয়ার যে দোলায় বকুল ফোটে, শিউলি ফোটাতে হাওয়া আর পাতার অন্ত মিতালি দরকার।*

---

* বলা প্রয়োজন এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের জন্ত আমার ভাবনা-চিন্তাকে সনজীদা খাতুনের একটি চিঠি বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে এক দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ আলোচনাও আমাকে উদ্দীপিত করেছে। এ প্রবন্ধের মতামতের দায়িত্ব আমার—কিন্তু সনজীদার কাছ থেকে তাড়া না পেলে এটি লেখা হ'ত না—এ কথা বলতেই হয়।—লেখক।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গণনাযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথের সুবিধা ছিল দুটি। এক, তিনি 'বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ান'দের স্থায়িত্ব, সাধনার অন্তঃসারশূন্যতা ও নিরর্থকতা বিষয়ে ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। দুই, বঙ্গভঙ্গ-পর্বে তিনি প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞতাকে গাঢ় ও তন্ময় করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'ঘরে বাইরে' বা 'চার অধ্যায়' তো পরের কথা এমন কি 'গোরা' লেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি না পূর্বোক্ত দুটি ব্যাপার একটার পরে একটা তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যেত। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক-সমাজের কৃত্রিম সাফল্যবিলাস রবীন্দ্রনাথকে কখনো স্পর্শ করেনি। তিনি ইংরাজ অধিকারে ভদ্রলোকের সম্মান ও শ্রমজীবী গ্রামীণ জনতার অসহায়তা দুইকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। "মেঘ ও রৌদ্র" গল্প এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কোন্ কোন্ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কোন্ কোন্ স্তর পার হয়ে বাঙালি যুবক উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকেছিল এ গল্পটি তার আশ্চর্য নিদর্শন— একথা বর্তমান প্রবন্ধকার বহু পূর্বে অন্যত্র বলেছেন। গল্পটি ও 'গোরা' উপন্যাসে শিক্ষিত, সজাগ বাঙালি ভদ্রলোকের রাজনৈতিক হতাশা, জাতিগত (Racial) হতাশা ও অর্থনীতিক হতাশার ত্রিমুখী চাপকে কমবেশি প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। চরঘোষপুর ঘটনা তারই পরিণতি। সুতরাং একথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সমীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। সুতরাং তিনি যখন রাজনৈতিক পট-পরিবেশকে মূলত উপন্যাসে ব্যবহার করতে চাইলেন 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'-এ, তখন আমরা ন্যায়ত আশা করতে পারি তিনি বাঙালি একসট্রিমিস্টদের রাজনৈতিক, জাতিগত ও অর্থনৈতিক ক্রোধের সামগ্রিক চেহারা তুলে ধরবেন। রাজনৈতিক উপন্যাসে তত্ত্বের বাড়াবাড়ি ঘটলে তা তত্ত্ব-কথায় পর্যবসিত হয় বটে— কিন্তু তত্ত্বকে স্বরূপে উপস্থিত না করলে উপন্যাসের ব্যক্তিকথাও অস্পষ্ট হয়ে যায়। আরও বলতে হয়, তত্ত্ব-

স্বরূপ মূর্তি ধরা চাই চরিত্র-পাত্রের ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে— যেমন ধরেছিল টুর্গেনিভের বাজারভ চরিত্রটির অভিপ্রায়ে ও বেদনায়। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাসে তা হয়নি। তাঁর ব্যর্থতা এখানে। সংকল্পের যন্ত্রণা-রক্তিম রূপ ব্যক্তিজীবনে কখনো এপিকের উপযুক্ত পটভূমি পেয়ে ট্র্যাজেডিকে এড়িয়ে যায়— যেমন গোর্কির 'মাদার', হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'ফ্রিডম রোড'। আবার একটা জীবন্ত তত্ত্বমূর্তির ঐতিহাসিক নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকারও ট্র্যাজিক ইতিবৃত্ত রূপে উপস্থাপিত হতে পারে— যেমন 'ফাদারস অ্যানড সনস'। বাজারভের অন্তিম উক্তি— 'রাশিয়ার আমাকে দরকার নেই'— শুধু ব্যক্তি-বাজারভের নয়, তত্ত্ব-নিহিলিজমেরও শেষ কথা। সন্দীপকে দিয়ে তো রবীন্দ্রনাথ একাজ করাতে পারেন নি— অতীনকে দিয়েও যে পারলেন না, এটাই বিস্ময়ের বিষয়।

তত্ত্বের যন্ত্রণা আর ব্যক্তির টেনশন, তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তির উদ্বেগ এক হলে পলিটিক্যাল নভেল শৈল্পিক রূপ পায়। 'চার অধ্যায়ে'র অতীন-চরিত্রকল্পনায় তার সম্ভাবনা ছিল। এলার কাছে অতীনের আত্মবিশ্লেষণে সে সম্ভাবনার আভা ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু অতীন যতখানি একক ব্যক্তি, ততখানি একটা কালখণ্ডে ধৃত বিপন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধি নয়। প্রথম থেকেই সে এই মতাদর্শের অনাত্মীয়। সে এর অসঙ্গতি এবং উদ্দেশ্য ও উপায়ের বিষমতার সমালোচক। সে এই দলের বীর্যবান অপব্যয়ের গৌরবের দিকটি দেখেইনি। তার মুখে আমরা যে হাহাকার শুনতে পেলাম, তা একটা আইডিওলজির বিফলতা বা ফ্রাসট্রেশনজনিত হাহাকার নয়— একান্তই ব্যক্তিগত অনুশোচনা। মনে হয় ব্রহ্মবান্ধবকে দু'ভাগ করার পরিকল্পনাটা ভাল হয়নি। তাঁর লক্ষ্য যদি হত ইন্দ্রনাথ, তথা ব্রহ্মবান্ধবের উদ্যম এবং ব্যর্থতার আলেখ্য রচনা, তাহলেই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তিনি সুবিচার করতেন— রবীন্দ্রনাথের নিজের উৎকণ্ঠাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেত না। কবি রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা অতীনে এবং ভাবুক রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা ইন্দ্রনাথে দু'ভাগ হয়ে যাবার ফলেই উপন্যাসটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবু যে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'চার অধ্যায়' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তার একটা কারণ আছে। ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক গুপ্তসমিতির প্রাতিমুখ্যকে খুব তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র আকারে উপন্যাসে স্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তির যে স্বাধীনতা পলিটিক্যাল পার্টি নামক প্রেসার গ্রুপের কাছে লাঞ্ছিত হচ্ছে— শেষবার য়ুরোপ ভ্রমণে, বিশেষত ইতালি প্রভৃতি দেশের ফ্যাসিস্ট পার্টি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ তা অবহিত

হয়েছিলেন। অতীন সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার জন্যই বেদনার্ত। সে একজন সৎ অথচ সংবেদনশীল ব্যক্তি। পার্টিকর্মীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি কিন্তু সে নয়। কেন না তার পার্টির সঙ্গে যোগ ঘটেছে মতাদর্শের টানে নয়— এলা টেনেছে তাকে প্রেমে, সেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এখানে তার সঙ্গে সন্দীপের তফাত। সন্দীপ সৎ নয়, সংবেদনশীল যদিবা। কিন্তু সে অগ্নিযুগের যুবকদের এক স্তরের মানসিকতার প্রতিনিধি। তার আবেগমত্ততা, চঞ্চলতা তাৎক্ষণিক সিদ্ধির জন্য চিরকালীন মূল্যকে অস্বীকার— তার সময়ের রক্তিম রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যায্য পলিটিকস এবং পাত্রপাত্রীর নৈতিক দীর্ণ জগৎ দুইয়ে মিলে যে জটিলতা রচনা করে সেটা তার নয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সেটা বরং বিমলার— 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেটা অতীনের। অতীনের নৈতিক জগতের আক্রান্ত অবস্থার পরিচয় এ উপন্যাসের প্রধান কথা। সেই আক্রান্ত অবস্থাতে সে আত্মহননের দিকে ছুটে চলে— এখানে রবীন্দ্রনাথের আর্কেটাইপ জয়সিংহ। সে পূর্ণাঙ্গ পার্টিকর্মী হোক বা না হোক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কেউই যে রাজনৈতিক চরিত্র অঙ্কনের উপযুক্ত ছিলেন না এ ব্যাপারটা বেশ ভাল বোঝা যায় সব্যসাচী ও ইন্দ্রনাথ চরিত্রের ভিতর দিয়ে। দু'জনেই নিজ নিজ স্রষ্টার সারটিফিকেট পাওয়া অতিমানব— একটা রাজনৈতিক দল চালানোর উপযুক্ত দলপতি নন। দু'জনেই এই কথাটা বোঝাতে সর্বদা ব্যস্ত যে, তাঁদের মত দলকে ছাড়িয়ে মাথা তোলে এবং দলের সদস্যরা সেখানে শুধু 'লোকগুলো'। 'যুগান্তর' বা 'অনুশীলন' যে কোনো একটা দলের সঙ্গে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে দলপতি-চরিত্র দুটি এমন হত না। কিন্তু এর মধ্যেও ইন্দ্রনাথ ও সব্যসাচীর প্রভেদটি অস্পষ্ট থাকে না। সব্যসাচীর দাম্ভিক আত্মপ্রত্যয় যেখানে হাস্যকর শোনায়, ইন্দ্রনাথ সেখানে নির্মোহ ইতিহাস-চেতনায় একটা অনিবার্য পরিণামকে অনুভব করেন। তখন তিনি ব্যক্তিগত ফ্রাসট্রেশনের ঊর্ধ্বে উঠে যান। গলায় লাগে বিষণ্ণতার সুর।

'কালান্তর' গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পলিটিক্যাল উগ্রপন্থীদের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাতে তাঁর শ্রদ্ধা ও সমালোচনা দুই-ই সমমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু উপন্যাস লেখার সময় তিনি তাদের সে প্রাপ্য গৌরব দেননি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অমূল্যকে বাদ দিলে বাংলাদেশের অগ্নিযুগের কোনো বীরোচিত আত্মদান তাঁকে উপাদান যোগাল না এটাই সত্য কথা। সব থেকে

সম্ভাবনাময় চরিত্র ছিল অতীন এবং এলা। কিন্তু তারা দুজনে মরে শুধু এটুকুই দেখিয়ে গেল রাজনীতি, মতাদর্শ জীবনে কত অপ্রাব্য। সে-হিসাবে এলার দ্বন্দ্বটা যদিবা পলিটিক্যাল বাতাবরণ পুষ্ট, অতীনের দ্বন্দ্ব বা অমীমাংসা কোনোটাই রাজনীতির মতাদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে উদ্ভূত নয়। তার এলাকে নিবেদিত সমস্ত উক্তিপুঞ্জের নির্গলিতার্থ একটাই— রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে সে আসলে কবি— এই গুপ্তসমিতির পথ তার পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি।

সে তুলনায় 'পথের দাবী'-তে শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক বাতাবরণটি আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন। রামদাস তলোয়ারকরের কারণে উপন্যাসের একাংশে সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তনমুখী পরিচয়টিও ফুটে উঠেছে, যদিও সব্যসাচীর কারণে এই সমিতির মধ্যবিত্ত শ্রেণীতত্ত্বের চেহারাটাও গোপন থাকেনি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অচরিতার্থতার বেদনাই যে সব্যসাচীর বেদনা একথাও গোপন থাকেনি। অথচ এই উপন্যাসে অবকাশ ছিল যথেষ্ট। সুমিত্রার মতো রাজনৈতিক কর্মী এর আগে বাংলা নভেলে দেখা দেয়নি। কিন্তু সুমিত্রার মতাদর্শগত স্বরূপ ও তার ব্যক্তিস্বরূপ উপন্যাসে সমন্বিত হয়নি। গল্পাংশে ও রাজনীতি-অংশে সুমিত্রা সমবন্টিত হয়নি। তার সুযোগ নিয়ে শরৎচন্দ্র আর একবার রহস্যময়ী নারী-চরিত্র সৃষ্টির খেলায় মেতেছেন। এক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়েছে— সুমিত্রার একদিকের দুর্বোধ্যতাকে আর একদিকের অস্পষ্টতা দিয়ে ঢাকতে চাওয়া!

ব্যক্তির আত্মনিগ্রহ রাজনৈতিক উপন্যাসের একটা বড় ব্যাপার। কেন না দলীয় যান্ত্রিকতার মাঝখানে ওই আত্মনিগ্রহই ব্যক্তির নিজস্ব জগৎরূপে মূর্তি পায়। 'চার অধ্যায়ে' অতীন সেই আত্মনিগ্রহের দীপ্তিতে বিশিষ্ট। তবে একথাও আগেই বলেছি, সে-আত্মনিগ্রহ কোনো রাজনৈতিক কর্মীর আত্মনিগ্রহ নয়। কিন্তু সে না হয় রাজনৈতিক চরিত্র নয়— এলা? সে তো জীবন শুরুই করেছে বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। ইন্দ্রনাথ তাকে বৈপ্লবিক তত্ত্বে ঠিক ভাবে দীক্ষিত করে নিয়েছিলেন— এরূপ অনুমানের কারণ আছে। অতএব তার যে ক্রাইসিস, তা দ্বিস্তর বা দ্বিমাত্রিক হওয়া প্রয়োজন ছিল। একটি তার মতাদর্শজনিত সংকট, অপরটি তার প্রেমের সংকট। তার প্রেমের সংকটের ছবি যদিবা ফুটেছে, তার মতাদর্শের তীক্ষ্ণ সংকটের ছবি একেবারেই ফোটেনি। ফোটা উচিত ছিল। তার বয়সের দিক থেকে সে এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যেখানে মতাদর্শের সংকট আসলে ব্যক্তিত্বের সংকট

হওয়ার কথা। তা না হয়ে উল্টোটা ঘটেছে— ব্যক্তিজীবনের সংকট থেকে মতাদর্শের সংকট দুজনকেই বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেল। লক্ষ করি— টুর্গেনিভের মতো রবীন্দ্রনাথের নায়করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র। ফলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়কেরা মতাদর্শের ঘূর্ণিবাত্যায় আলোড়িত হয় বেশি। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যেই দেখা যায় তারা ছাত্র-নমনীয়তা পরিহার করে আঘাতে অভিঘাতে একটা অনমনীয় ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। বয়ঃক্রমের দিক থেকে অতীন এলা ছাত্রমনস্কতা অতিক্রম করে গেলেও, তাদের আচার-আচরণে একটা ব্যর্থ ছাত্রের বিক্ষোভ কাজ করে চলেছে। শচীভূষণ, গোরা, সন্দীপ, অতীন এমন কি অমিতও যেন একথাই বলে গেল, তারা পড়াশুনা করে বুঝেছিল একরম, আর জীবনটা প্রতিপন্ন হল আর-একরকম। বিহারীকেও এ থেকে বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। অতীন এবং এলার মৃত্যুবরণ তাদের অভিজ্ঞতার পূর্ণায়ণের প্রমাণ। তাদের দলীয় আদর্শ ও তার যন্ত্র-বদ্ধতার দায় একদিকে, আর তাদের প্রেমের দায় আর-একদিকে। এ অভিজ্ঞতা নতুন কালের অভিজ্ঞতা। এইরকম একটা আধুনিক আত্মহত্যা এর আগে বাংলা নভেলে দেখা যায়নি। এই স্বেচ্ছামৃত্যু এখানে ব্যক্তির স্বাধীন পদক্ষেপের অন্য নাম।

দুই

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যে ধরনের রাজনৈতিক উপন্যাস লিখলেন তাকে রাখা চলে এই শিরোনামায়— 'রাজনৈতিক মতাদর্শ বনাম শাশ্বত নীতি'। তারাশঙ্কর যে রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেন তার শিরোনামা হতে পারে 'সাধুসংকল্পের আলোকে ব্যক্তির মতাদর্শ'। সতীনাথ ভাদুড়ী নামেন আরও গভীরে— 'মতাদর্শ ও চরিত্র-নিয়তি'। আর সমরেশ বসু যে-ধরনের রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেন তার জন্য শিরোনাম স্থির করা চলে 'মতাদর্শের প্রতিমুখে ব্যক্তি'। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলিকে বলা যাক— 'ইতিহাসের আলোয় মতাদর্শের যাচাই'। এইসব ধরনের মধ্যে আছে নানা অর্জন-বিসর্জনের রক্তাক্ত নাটক, আছে আবাহন এবং প্রত্যাখ্যানের দ্বিবিধ গভীর মন্ত্রপাঠ— আছে বাঙালি মধ্যবিত্তের তিন যুগের বিস্ময়ের স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভাঙার ইতিবৃত্ত। তাই দেখি— কোনো ভারতীয় লেখকের পক্ষেই রাজনীতিকে অদ্ভুত বলা সম্ভব নয়— এখানকার

মানব-নিয়তি ও কিম্ভূতকিমাকার সমাজকাঠামোর জন্যই সম্ভব নয়। অসীম রায় সম্প্রতি ভারতীয় লেখকদের সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন— "আউটসাইডার'দের নকলে রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তার ছুঁচিবাই নেই। সম্ভাবনা ও সম্ভাবনার মৃত্যুর সে নীরব সাক্ষী; সাক্ষী মানুষের বিরাট যন্ত্রণার।' তিরিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালি লেখকেরা ইডিওলজির মারকাট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

তিন

তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' রাজনৈতিক মতাদর্শকে পটভূমিকায় রেখে ব্যক্তি-জীবনের বিবর্তনের প্রথম সার্থক রচনা। যেটা তারাশঙ্করের ছিল সেটা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ছিল না— একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সন্ত্রাসবাদ থেকে গণ-আন্দোলনের দিকে ভারতীয় ইতিহাসের মোড় ফেরার ব্যাপারটি তারাশঙ্কর নিজ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েই বুঝে গিয়েছিলেন। সেই জন্য সন্ত্রাসবাদের করুণ গম্ভীর ট্র্যাজেডি অপেক্ষা ভারতীয় গণ-আন্দোলনের প্রথম উদার অভ্যুদয় শিবনাথের জীবনকথার মাধ্যমে অধিক অভিনন্দিত হয়। কিন্তু এটাই 'ধাত্রীদেবতা'র রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে সার্থকতার দাবিতে প্রধান পয়েণ্ট নয়। তার সে দাবি অন্যত্র। 'ধাত্রীদেবতা' আসলে শিবনাথের জীবনকথা— সেই সূত্রে তার পারিবারিক জীবনকথাও বটে। মায়ের মৃত্যুর পর শিবনাথ-পিসিমা-গৌরীর জীবন সংহতিসূত্র ছিঁড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে গেল। তারও মূলে অনেকটাই আছে শিবনাথের স্বোপার্জিত কঠিন মতাদর্শ। কিন্তু ভারতব্যাপী প্রথম গণ-আন্দোলনের জোয়ারে সেই বিচ্ছিন্ন পরিবার আবার পুনর্মিলিত হলো— এই পুনর্মিলনের ফলে জন্মলাভ করল একটা রাজনৈতিক পরিবার— পারিবারিক জীবননাট্যের রাজনৈতিক সূত্রধার-কল্পনার দিক থেকেই 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি বিশিষ্ট। শিবনাথের সন্ত্রাসবাদী অধ্যায়টিই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র বিশ্বস্ত আলেখ্য। তার ব্যর্থতার চিত্র-চরিত্র দুই-ই ইতিহাস সম্মত। দাদার মৃত্যুবরণ, পূর্ণের সম্মুখসমর ও হাসপাতালে নিরুত্তর মরণ— অগ্নিযুগের বীরত্ব ও আন্দোলনের অসঙ্গতি দুই দিকে নির্ভুল অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। আবার জনসমক্ষে পিকেটিং-এর সময় জনতার দ্বিধা, সাড়া দিতে ভয়, যথার্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে।

তারাশঙ্করের যেটা প্রধান ত্রুটি সেটা হলো রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্রচিত্র

তিনি উচ্চাবচ করে তুলতে পারেন নি। ফ্ল্যাট করে ফেলতেন। 'মন্বন্তরে' দেখি, বা 'পঞ্চগ্রামে' বিত্ত এ কারণেই নাট্যরস সৃষ্টি করলেও রাজনৈতিক কর্মীর ব্যক্তিচরিত্র-রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। টাইপ হয়েছে, ব্যক্তি হয়নি। যদি মতাদর্শ কেবলমাত্র ব্যক্তির সাধু সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে আমরা যে ব্যক্তি অথবা মতাদর্শের দুটোর একটাকে মাত্র পাই, এ কথা তারাশঙ্কর বুঝতেন না। সামাজিক অর্থনীতিক পটভূমিতে জীবনের নতুন অর্থ নির্ণয়ে তন্নিষ্ঠ নায়ক তারাশঙ্কর ভাল আঁকেন— দেবু ও করালী। কিন্তু রাজনৈতিক পট ও রাজনৈতিক চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তা তিনি আঁকেননি। এক হিসাবে ভাল কথা যে, তিনি এই সীমাবদ্ধতা সামলাতে গিয়ে ভাবাত্মক উপন্যাস লিখতে বসেন নি। ভাল রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার পথে একটা বাধা হল লেখাটি ভাবাত্মক নভেল হয়ে যেতে পারে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত' উপন্যাসটি তার প্রমাণ। বনানী রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত সোশ্যালিস্ট— কিন্তু তার যৌনজীবনের সঙ্গে ঐ মতাদর্শের সংযোগ কোথায় এবং কেন, তা বনানীর চরিত্রে লজিক-সম্মতভাবে দেখান হয়নি। এ ধরনের নভেলে লেখকের ভাবনাজগৎ চরিত্রপাত্রের আচরণে প্রতিফলিত হয়— তারা উপন্যাসের নিজস্ব জাগতিক জলহাওয়ায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না। বনানী যেন 'শেষ প্রশ্নে'র কমলের অসঙ্গতির উত্তরাধিকারিণী। এই অসঙ্গতি যেখানে থাকে সেখানে তত্ত্ব বা মতাদর্শ ব্যক্তির বৈদ্যুতস্পর্শে নির্জীব ব্যাঙের মতো উল্লম্ফ হতে পারে— তার স্বসমুখ ভূমিকা থাকে না। মতাদর্শের অনিবার্যতা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ধারণ এবং আগামীর অগ্রদূত বলে অন্বয়েয় ব্যক্তির দিক থেকে বৈপ্লবিক যজ্ঞাগ্নিতে কোন্ কোন্ অরণির প্রয়োজন এরকম গুরুতর বিষয় নিয়ে একটাই সার্থক বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা সাহিত্যে লেখা হলো— তা, 'একদা'। রচয়িতা গোপাল হালদার। গোপাল হালদারের মতো মনোরঞ্জন হাজরাও ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। মনোরঞ্জন হাজরার অধুনাবিস্মৃত 'নোঙরহীন নৌকা' বা 'পলিমাটির ফসল' উপন্যাস দুটি কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে লিখিত উপন্যাস। কিন্তু এতে মতাদর্শজনিত সমস্যাবর্ত নেই। 'একদা'র চরিত্র-পাত্রদের নিজ নিজ আবর্ত রাজনৈতিক পটভূমিকে একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য দিয়েছে। বেদনা, বঞ্চনা, নিগ্রহটা যে বাইরের ব্যাপার নয়, তা যে পাত্রপাত্রীদের অন্তর্লোকেরই ঢেউ, সেটা 'একদা'র একদিনের দ্রুত পদচারণা ও আত্মলীন সমীক্ষার মুকুরে প্রতিফলিত। নায়কের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিপরীতে যে আত্মতুষ্ট জীবনের মধ্যবিত্ত মন্থরতা তা ফুটিয়ে তুলেছে

একটা সময়ের বাস্তিক অবয়ব। বস্তুত বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা ক্রান্তিলগ্নের নানা উতোরচাপান শুধু কথার কথা না হয়ে জীবনের তীব্র গতিবেগের ভিতর দিয়ে মূর্তি পেয়েছে। পারিবারিক পট থেকে ছিঁড়ে গিয়ে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের যে দায় এহেন কর্মীকে বহন করতে হয়, তার চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের মধ্যেই থাকে তার নিয়তির রহস্য। গোপাল হালদারের 'একদা'তে তা স্পষ্টতা পেল অন্তদিক থেকে। তিনিই প্রথম দেখালেন তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের যন্ত্রণাময় গাম্ভীর্যের ভিতর দিয়ে যে, চরিত্র-নিয়তির সঙ্গে মতাদর্শের নিজস্ব নিয়তির একটা ট্র্যাজিক আনডারস্ট্যানডিং ঘটা দরকার। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর উপন্যাস জগতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজ মন্ত্র পাঠে— কিন্তু শুরু করেছিলেন গোপাল হালদার যে চরিত্র-নিয়তি ও ইতিহাস-নিয়তির বোঝাপড়া ও পারস্পরিক চ্যালেঞ্জকে বুঝে নিতে গিয়েছিলেন— সেখান থেকে।

চার

সতীনাথের হাতে ছিল আগস্ট আন্দোলনের মতো বড় মাপের একটা ঘটনা। কিন্তু ঘটনার প্রাবল্যে তিনি অভিভূত হননি। ইতিহাসের আনুকূল্যে তিনি বড় মাপের ঘটনা পেয়েও যে অভিভূত হলেন না, তার কারণ তাঁর হাতে যে মানুষ ছিল তারা সবাই সাধারণ মাপের মানুষ। তারা কেউ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের রাজনৈতিক চরিত্রের মতো অনুভূতি-প্রবল মানুষ নয়, তারাশঙ্করের সৎ রাজনৈতিক চরিত্রের মতো আদর্শদীপিত নয়, গোপাল হালদারের রাজনৈতিক চরিত্রের মতো মনন-চিহ্নিত নয়। সেই অর্থে 'জাগরী'র বাবা, মা, বিলু-নীলু একটা 'রাষ্ট্রীয়' পরিবারের সমস্ত— এটা বাইরের লোকের বা পাড়া প্রতিবেশীর কথা— আমরা যারা ভিতরের কথা জানলাম তারা দেখলাম এক পাঁচমিশালি বাঙালি পরিবার। অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সে সাধারণ মানুষের যে-পরিচয় মেলে সেটা অসাধারণ— তাদের মনোজগতটার ওপর বড় ঘটনার আলো পড়ে যে ছায়ালোক সৃষ্ট হয় সেটা এক-এক ভাবে নড়েচড়ে। নীলু কম্যুনিস্ট, বিলু সোস্যালিস্ট— আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করতো বলে এমনটা ঘটেছে— এও একান্ত বাইরের কথা নীলুর কম্যুনিস্ট মতাদর্শের সঙ্গে তার আচরণের সম্পর্ক একান্ত আপতিক। নীলু যে কাজ করেছিল তার মূল রয়েছে তার অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তিত্বে— সে কম্যুনিস্ট হলেও তাই, না হলেও তাই।

বিন্দু ব্যক্তির বড় ছেলে। নরবাক, মৃদুসহিষ্ণু ভারতীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্রের আর্কিটাইপ তার মধ্যে সক্রিয়। তার সোশ্যালিস্ট মতাদর্শ আর তার শান্ত ব্যক্তিত্ব এক করে দেখানো হয়নি— দেখানো হলেই বরং 'জাগরী' একটা অ্যাভারেজ রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে যেত। বাবার গান্ধীদর্শন, গীতাপাঠ ছাপিয়ে উঠেছে বাঙালি পিতৃহৃদয়। আর মা? অন্য কিছু নয়, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আদ্যোপান্ত একটি মা। অথচ 'জাগরী' প্রকৃত অর্থে একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'র জন্ম দিল এক 'রাষ্ট্রীয় পরিবার'। উপন্যাসে বিবৃত ঘটনাধারা ১৯২১ সালে এসে থেমেছে। 'জাগরী'র বিষয় একটি রাষ্ট্রীয় পরিবারের বিখণ্ডীভবন। একুশ বছর পূর্বে জাত সংকল্পের মূল নদী নানা মতাদর্শের শাখানদীতে বিভক্ত হয়ে গেল। নদীর সেই মোড় ফেরা, বাঁক ফেরা, ভেঙেচুরে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার মুখে একটি বাঙালি পরিবারের বারো ঘণ্টায় মানসনাট্য এই উপন্যাস। কাল এবং পটের বৃহত্ত্বে 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' অবশ্যই পরিণততর রচনা। রাজনৈতিক ভাবাকাশের সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠার যে-ইতিবৃত্ত এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তার ভারতীয় বাস্তবতা অঙ্কন করার যোগ্যতা একমাত্র বুঝি সতীনাথেরই ছিল। ঢোঁড়াইয়ের বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের অগ্রগতির ছন্দটি মিলেছে সেই যোগ্যতার ফলে। ঢোঁড়াই সমাজের যে অংশের মানুষ সেই অংশেরও ক্রমবর্ধমান চেতনার প্রতীকী বিগ্রহ সে। তার প্রথম নেতৃত্বগ্রহণ— তত্মিমাছত্রী হয়ে উপবীত গ্রহণ— বিহার ভূমিকম্পের পরে স্বাবলম্বনের ফলভোগ— আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ— আনডারগ্রাউনড জীবন— ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার ব্যক্তিজীবনের সরু মোটা জট। ঢোঁড়াইয়ের প্রথম ভোটদানের অভিজ্ঞতা ভারতীয় ভোট-পর্বের প্রারম্ভিক প্রতিনিধিস্থানীয় ঘটনা। ঢোঁড়াইয়ের মতো মানুষদের ভোটাধিকারের জন্য ব্যাকুলতা এবং তা নিয়ে আমরা 'বাবু' রাজনীতিকেরা কী প্রহসন করে থাকি সতীনাথ তার শাণিত হিউমার-দৃষ্টিতে অনেক আগে দেখতে পেয়েছিলেন। আগস্ট আন্দোলনের তেজীমন্দার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের নিজস্ব জীবননাট্যের পটপরিবর্তন ও চূড়ান্ত পটক্ষেপে এই নবচরিত-মানসের সমাপ্তি। এখানে একটা কথা, ঢোঁড়াই কোনো মতাদর্শের মানুষ নয়। সে কারণে এখানে মতাদর্শের 'টেনশন' রাজনৈতিক উপন্যাসের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করেনি। করার কথাও নয়। রামচরিত-এর ফ্রেমে তিনি যে নায়ক গড়ে তুললেন সে কোনো মতাদর্শের বিগ্রহ নয়। সত্যানুরাগ ও সে-কারণে দুঃখবরণে সহিষ্ণুতা

যেমন ছিল রামচন্দ্রের চরিত্র-নিয়তি, ঢোঁড়াইয়েরও তাই। এখানে মতাদর্শ অপেক্ষা জীবন অনেক বড়ো কথা। রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটায় ঢোঁড়াইয়ের জীবন-বটের ক'টা ডাল ভাঙল, মূল গাছটার কোন কোন শিকড় শুকিয়ে গেল— গাছটা শেষ পর্যন্ত স্বনির্ভর কোন একাকীত্বে গিয়ে পৌঁছল— এটাই এখানে আসল ব্যাপার। সে-তুলনায় সতীনাথের 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এ রাজনৈতিক পার্টির আবহাওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর সমস্যা এবং পার্টি-কর্মীর ব্যক্তিগত গ্রন্থি সব মিলিয়ে পলিটিক্যাল নভেলের পূর্ণ মাত্রা বজায় থেকেছে। ব্যক্তি-জীবনের মানবিক ইমোশনে প্যাশনে রাজনীতি যদি অপ্রাব্য‌ই হয়, তবে সেই অপ্রাব্য হবার পদ্ধতি এক-এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক-এক প্রকারের। এটাই তিনি বারে বারে দেখাতে চেয়েছেন।

সতীনাথের উপন্যাসে রাজনীতি এবং চরিত্র-নিয়তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ কারণেই নতুন মাত্রা পেয়েছে। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রগুলি সাধারণত জীবন্ত হয়ে ওঠে ভাবনার ভিতর দিয়ে। তিনি জানতেন ঘটনা বড় হয় না, কিন্তু ব্যক্তির মনোজগতে ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী। এজন্য রাজনৈতিক বাতাবরণ ব্যবহার করে সতীনাথ ব্যক্তির ভাবনা-জগতের স্বতন্ত্র স্বরূপ, তার নিজস্ব নিয়তির নিগূঢ় পদক্ষেপ— এগুলিই ধরে দিতে চেয়েছেন। অন্তর্গূঢ় টেনশনের সেই ক্রমদ্রুত লয় 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এ শিল্পরূপের প্রধান কথা।

তাই বড় রাজনৈতিক ঘটনার সংঘাত সংক্ষোভের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই যে রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত পরিপূরিত হল এমন কথা বলা যাবে না। তাহলে ছেচল্লিশের বিস্ফোরক গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস হত। ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নটাই এখানে দুই বাঁড়ুজ্যের লক্ষ্য ছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শ অস্তিত্বের অংশ হিসাবে এখানে দেখা দেয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে বা 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিতরে মানুষের একটা গহন পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হল। পক্ষান্তরে আগস্ট আন্দোলন হাতে পেয়েও সুবোধ ঘোষ তাঁর উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'তে সত্যকার রাজনৈতিক কর্মীর আদর্শঘটিত দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করতে পারেন নি। দূরত্বের প্রেক্ষণী ব্যবহার করলে দেখা যাবে গোপাল হালদারের 'ঊনপঞ্চাশী' 'পঞ্চাশের পথে' প্রমুখ উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্র ও মতাদর্শের একটা দ্রাবণ ঘটানোর সব প্রয়াস ছিল। বলা যায় গোপাল হালদার

এবং সতীনাথ ভাদুড়ী ছাড়া ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস প্রায় নেই— যদিও রাজনৈতিক ব্যক্তি পার্শ্বচরিত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা উপন্যাসে মূল বৃত্তকে ছুঁয়ে গেছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড— এমনটা দেখা গেল কয়েকবার!

পাঁচ

উপন্যাসের শিল্পকর্মে একটা প্রধান কথা মানবিক রূপান্তর বা 'হিউম্যান মেটামরফসেস'কে ব্যক্তি জীবনের ছন্দ-ভাঙা, ছন্দ-গড়ায় মূর্ত করা। সুতরাং সে অর্থে প্রত্যক্ষ জীবনের সমস্যাটাই শিল্পের সমস্যা। 'একদা'র শিল্পরূপ ঠিক তৎকালিক ইতিহাসছন্দকে স্বীকার করেই গড়ে উঠেছে। বিপ্লব গেঁজে যায় তখন, যখন বিপ্লবী বিপ্লবে বিশ্বাস হারায়। কিন্তু যেখানে বিপ্লবী ইতিহাস-জ্ঞান বশতই বিপ্লবে বিশ্বাস হারায়নি সেখানে—বিপ্লবীর আত্মসমীক্ষা, মাথার ওপর গ্রেপ্তারী খাঁড়া ঝুলছে যখন, তখন দ্রুতচ্ছন্দ হবে—মুহুর্মুহু মনের মধ্যে বাস্তবের ছায়া নানা ঢেউ তুলবে— তা কখনো অনুভূতির, কখনো নির্বেদের। একটা দিন তখন দেখতেই একটা দিন— আসলে তা অনেক দিনের যোগফল— আগামী দিনের সংকল্পের বীজতলা। আবার সতীনাথের ঢোঁড়াইয়ের রূপান্তর বা মেটামরফসেস-এর চিত্রলেখাটির মূল্য স্বতন্ত্র। পূর্ণিয়া জেলার এক কোণে জিরানিয়ার উপকণ্ঠে তাৎমাটোলির গ্রাম্য ঢোঁড়াই কেমন করে কোন কোন অভিজ্ঞতার ধাক্কায় কতবার রিক্ত হতে হতে নতুন ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক মানুষ হয়ে উঠল—তার ব্যক্তিগত বিধাতা ও ইতিহাসবিধাতা তার ললাটে একই সঙ্গে কোন শূন্যতার টীকা এঁকে দিল এটাই এ কাহিনীর আসল কথা। তার জন্য লেখক ব্যবহার করেছেন সামগ্রিক দৃষ্টি। রাজনৈতিক ঘটনাকাণ্ড তার একটি অংশ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার ভাটায় আন্দোলিত হওয়া যে আজকের নাগরিক জীবনের অপরিহার্য চরিত্র তার পরিশ্রমসিদ্ধ বিশ্বস্ত ছবি পাওয়া যায় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' বা গুণময় মান্নার 'জুনাপুর স্টীল'-এ।

মতাদর্শ-সংক্রান্ত সংঘাতকে নিয়ে সেই লেখকই সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেন, যিনি মতাদর্শের অন্তর্গত আবর্তের বৌদ্ধিক (ইনটেলেকচুয়াল) ও নৈতিক (মর্যাল) লড়াইকে ঠিকমতো অনুধাবন করে সেটাকে তাঁর নিজের আঙ্গিকরীতিমত অন্বেষায় অনিবার্য পরিণতি দিতে পারেন। শতাব্দীর

দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতেই স্ট্যালিন মারা গেলেন। কিছুকাল পরে, ১৯৫৬তে যখন ডিস্ট্যালিনাইজেশন শুরু হল তখনই নতুন করে কম্যুনিস্ট লেখকদের পক্ষ থেকে মতাদর্শ সাংঘাতসম্বলিত উপন্যাস লেখার কথা ছিল। লেখা হল না। এমন কি দেখা যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'তৃতীয় ভুবন'-এর মতো উপন্যাসে দুজন সমমতাদর্শী ছেলেমেয়ের অন্তর্লোক উদ্ঘাটন করেন, তখন মতাদর্শের সংকট সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু সত্তরের দশকে দীপেন্দ্রনাথের 'বিবাহবার্ষিকী' উপন্যাসে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বিখণ্ডীভবনের প্রতিফলন ঘটেছে সহকর্মীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে, ঔপন্যাসিকের কলমে। চীনা আক্রমণের পরে যখন ১৯৬৪তে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হল, তখনো মতাদর্শের সংঘাত থেকে কোনো বড় লেখা বেরুল না। অথচ অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কালেই আমরা পেয়েছিলাম ননী ভৌমিকের শক্তিমান কলম থেকে 'ধুলো-মাটি'র মতো জোরালো উপন্যাস। নায়ক চরিত্রের, তার সংগ্রাম ও আত্মসচেতনতার যে বিকাশশীল ইতিহাসনিষ্ঠ ছন্দ তাকে ননী ভৌমিক শৈল্পিক সততায় মূর্তি দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও আরো অনেকের মতোই বোধ করি অন্যতর বিবেচনায় নীরব থাকলেন। তাঁর প্রবাসজীবনই শুধু এ পথে বাধা হল এটা ভাবতে পারছি না।

সেদিক থেকে বলতে পারি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস নতুন ভাবে লেখা শুরু হল সত্তরের দশকে। সমরেশ বসুর 'যুগ যুগ জিয়ে' উপন্যাসে এবং তাঁর অন্য উপন্যাসেও পলিটিক্যাল পার্টিকে প্রেসার গ্রুপ হিসাবে দেখার একটা মনোভাব লক্ষ করা যায়। সেই প্রেসার গ্রুপ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এবং স্বাধীনতাকে গ্রাস করতে চায়, উক্ত উপন্যাসের নায়ক ত্রিদিবেশ সে-কথাই বলতে চেয়েছে। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিকাতে লেখা 'মহাকালের রথের ঘোড়া'য় 'যুগ যুগ জিয়ে'র মতো শিথিল পৃথুলতা নেই। তা অনেক পরিণত সৃষ্টি। নায়ক-চরিত্রের মেটামরফসেস কল্পনায় তা অনেক বেশি শিল্পময়। কিন্তু সেখানেও সমরেশ পলিটিক্যাল পার্টি সংক্রান্ত তাঁর মূল মনোভাব থেকে সরে আসেননি। পলিটিক্যাল নভেল লেখার পক্ষে এতে একটা বিপদ ঘটে। ব্যক্তির পার্টি বিদ্রোহের ট্র্যাজিক পরিণামের উপর যতটা এমফ্যাসিস পড়ে, মতাদর্শের ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক অনিবার্যতা সে পরিমাণ গুরুত্ব পায় না। তার ফলে উপন্যাসের স্ট্রাকচার কোনো তত্ত্বভিত্তি পায় না। আমি বলছি না যে, দক্ষিণপন্থী অপরচুনিজম ও অতিবাম অ্যাডভেঞ্চারিজম নিয়ে তাত্ত্বিক তর্ক জুড়তে হবে, বা ইনডিয়ান স্টেটের চরিত্র নির্ণয়ের চুলচেরা তর্কে নামতে হবে।

কিন্তু তাহলেও বলব, উপন্যাস নাটক নয়। কাজেই তার স্ট্রাকচারের লজিক্যাল ভিত্তির মূলে থাকে একটা জীবনতত্ত্ব। কারো স্বপ্ন ভাঙার ইতিহাস বলতে হলে স্বপ্নের চেহারা, স্বরূপ, স্বপ্নের সঙ্গে স্বাপ্নিকের অন্তর্বন্ধনের ইতিহাস বলতে হয়। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলব যে, রুইতন কুর্মির রাজনৈতিক দুরাশার বাস্তব পৃষ্ঠপট অবহেলিত থেকে গেছে। এইজন্য যেটা এখানে হবার কথা লেখক কি সেটা হলেন—'পরাজিত নায়কের প্রবল একাকীত্বের বিষাদের সঙ্গী'? সামাজিক টেনশন ও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া দুইকে একসঙ্গে না দেখলে তো তা হওয়া যাবে না। তিনি তাঁর 'অপদার্থ' উপন্যাসে যখন এর আগে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন কোন ভূমিতে ফ্যাসিজম জন্মায়, তখন তা অনেক বেশি রাজনৈতিক তাৎপর্য পায়, যদিও 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র শিল্পোৎকর্ষ তাতে নেই। নকশাল আন্দোলন নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ব্যক্তির বিষণ্ণ পরাভবের কথাটা বলতে চেয়েছেন। সকলেই বিয়োগান্ত পঞ্চমাঙ্ক নাটকের শেষ অঙ্কের কথা বলতে ব্যস্ত হলেন—এই প্রশ্নটা তাঁরা নিজেদের করলেন না কেন যে নকশাল আন্দোলনের মধ্যে কী ছিল যা একদশকের প্রায় এক ডজন ঔপন্যাসিককে নাড়া দিয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' উপন্যাসে বা এই জাতীয় অন্য কারো অন্য উপন্যাসেও বেশ বোঝা যায় যে হিরণ্ময়দের ব্যাপার-স্যাপার লেখকেরা ভিতর থেকে দেখেনি। হিরণ্ময়ের পরিস্থিতি লেখকদের ভাবিয়েছে সেটা টের পাওয়া যায়। কিন্তু তা যে শুধু রাগী যুবকের বিলাসী ক্রোধ ছিল না, এটা বলতে গেলে সমাজবীক্ষণ দরকার।

সত্তরের রাজনৈতিক অস্তিত্ব অনেক বেশি চঞ্চল, যন্ত্রণাময়। ভিতর থেকে যাঁরা এই অস্তিত্ব-জট বুঝে নিতে চাইলেন তাঁদের মধ্যে একদিকে রয়েছেন দেবেশ রায় ও অসীম রায়। দেবেশ 'আপাতত শান্তি কল্যাণে' রক্তাক্ত পট-ভূমি ও মনোভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন। তাঁর উৎকণ্ঠা তিনি বড় শিল্পীর মতো স্থির তুলিকায় মূর্ত করে তোলেন। অসীম রায় তাঁর 'আবহমান কাল'-এ রাজনৈতিক রূপান্তর ও ব্যক্তির রূপান্তরের দ্বন্দ্বকে কয়েক দশকের পটভূমি-সমেত আঁকেন। অন্য দিকে সমরেশ মজুমদার 'উত্তরাধিকার'-এ ঠিক এ ধরনের কাজ করেননি। কিন্তু একটা কাজ তিনি করেছেন—আমাদের স্বপ্নভঙ্গের যুগে দাঁড়িয়ে তিনি স্বপ্নের গোড়ার দিকের কথা বলেছেন—বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা দুয়ের মধ্যেই কত অসঙ্গতি ছিল। অস্তিত্বের সমগ্রতা উন্মোচনের তাগিদেই আসে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্ন তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ। অসীম

রায়ের উপন্যাসে—'একদা ট্রেনে', 'শব্দের খাঁচায়' ইত্যাদি প্রসঙ্গেও বলা যায় ব্যক্তি-চেতনার সেই সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে রাজনীতির কথা ওঠে ব্যক্তিত্বের অন্তর্গূঢ় টানে। এখানে তিনি একক। 'আবহমান কাল'-এ নায়ক টুটুলের সমগ্র হয়ে ওঠায় তার রাজনৈতিক গঠন-ভাঙন গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। রাজনীতি সেখানে অস্রাব্য মতাদর্শ মাত্র থাকেনি।

যাঁরা নকশাল আন্দোলনকে—তথা একটা অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে একেবারে ভিতর থেকে দেখেছেন, যাঁরা ঐ অন্তহীন জটের অংশভাক্ ছিলেন, তাঁদের লেখার একটা গুণ অবশ্যই প্রত্যক্ষতা। 'একজনের শোনা কথার বিবরণ পড়ছি'—এমনটা তাঁদের লেখা পড়ে মনে হবার কথা নয়। দু'খানি উপন্যাসকে এ প্রসঙ্গে আমি খুবই প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করি। একখানি স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো'; অপরটি শৈবাল মিত্রের 'অজ্ঞাতবাস'। যা এর আগে কোনো বইতে পাওয়া যায়নি 'গ্রামে চলো' উপন্যাসটির রঘুর ভিতর দিয়ে তার দেখা মিলল—সেদিনের যুবক-সংকল্পের চেহারা। অন্যেরা যেখানে 'আহা আহা' করেছেন অথবা প্রচ্ছন্নে 'হায় হায়' করেছেন সেখানে এই বইতে নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনায় দেখা গেল নেতি ছাড়াও একটা কোথাও এদের ভূমিকা-জ্ঞান ছিল। 'গ্রামে চলো', উপন্যাসরূপে ততখানি সর্বাংশ সার্থক হয়নি—কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ-সম্ভূত একটা এমন চরিত্র সে আমাদের দিয়েছে, যা একটা সময়ের বাঙালী যুবমানসের সৎ, সংকল্পবদ্ধ প্রতিনিধি। সবটাই আগুনের খেলার দেয়ালিবিলাস যে ছিল না—কোথাও একটা নীল ইস্পাতও ছিল—এই বইটি সেকথা বলে। 'অজ্ঞাতবাস' সেই দুর্দমনীয় যুবকদের বীরত্বের নাগরিক দিকটি তুলে ধরেছে—অ্যাকশনগুলির জীবন্ত বর্ণনা থ্রীলারসুলভ শস্তা বর্ণনা নয়। নিশ্চয় একটা কোন বোধ থেকে গোটা ব্যাপারটা এসেছে তপেশের লড়াই—কিন্তু দুটি উপন্যাসেরই প্রধান ত্রুটি—লড়াইয়ের বিবরণ যত, লড়াইটা কেন সে-বিবরণ তত নেই। স্বাধীনতা-উত্তর যুবসমাজ কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের যন্ত্রণা পেরিয়ে, কতবার মায়ামৃগের ডাকে জীবনের সীতাকে ফেলে, হারিয়ে, বিপ্লবের দিবাস্বপ্নে নিশীথের নিশ্চিন্ত নিদ্রা বিসর্জন দিয়েছিল তা বলা হল না। 'অজ্ঞাতবাস'-এর মিলির অপব্যয় বুঝি লেখকের অজ্ঞাতে গড়ে ওঠা গোটা ব্যাপারটার একটা প্রতীক।

শেষকালে তপেশ যখন মাটিতে মুখ ঘসটায়—'আমি আর পালাবো না, তখন বোঝা মুস্কিল হয় সে কোথা থেকে পালাবে না বলছে। তপেশদের কৃতকর্মের

পোলিটিক্যাল লজিকটা স্পষ্ট ছিল না বলেই এমনটা ঘটেছে— এঅভিযোগ কেউ করলে তার কী জবাব ?

ছয়

সেদিক থেকে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটালেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর 'হাজার চুরাশির মা' নিঃসন্দেহে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু যে-ধরনের ট্র্যাজিক পঙ্কমাত্র চেতনা এ বিষয় নিয়ে লেখা সব বইগুলিকে শেষ অবধি আচ্ছন্ন করে ফেলে—'গ্রামে চলো'র মতো ব্যতিক্রম মনে রেখেও বলছি—'হাজার চুরাশির মা' তা থেকে রেহাই পায়নি। যদিও লেখিকার ক্রোধের দীপ্তি তাঁর দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় নিবে যায়নি, তবু আমার এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু 'অগ্নিগর্ভ' অসামান্য গ্রন্থ। বসাই টুডু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে অগ্নিস্তম্ভ চরিত্র। যথার্থ বলতে কী, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে বসাই টুডুই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শিল্পসার্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিচরিত্র। কালী সাঁতরা যেমন বিপ্লবীর স্বপ্নভঙ্গের দন্দহ্যমান চরিত্র—বসাই টুডু তেমন নতুন স্বপ্ন যে গড়ে তুলবে তার ছবি। 'অপারেশন বসাই'-এ বসাইয়ের লাশ সনাক্ত করার জন্য বারবার ডাক পড়েছে কালী সাঁতরার—এটা একটা প্রতীকী ঘটনা। কালীর স্বপ্নটা খাঁটি ছিল—অকৃত্রিম বিপ্লবের স্বপ্ন যে দেখেছে সেই পারে বিপ্লবীকে মনে রাখতে। উপন্যাসে বসাই পাঁচবার মরেছে—মরা বসাই কিছুদিন বাদে আবার অ্যাকশন শুরু করেছে। অর্থাৎ বসাইরা মরে না—ততদিন স্বাভাবিক ভাবেও মরতে পারে না, যতদিন না বাস্তব পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। এভাবে একটা 'মীথ' তৈরি হল। এই জাতীয় লোকস্মৃতিতে ধৃত পুরাতন 'মীথ'-এর দু-একটা আজও হারিয়ে যায়নি। ধনীর বা অত্যাচারীর যম বিশে ডাকাত মরেও মরেনি—এ কিংবদন্তী সেদিনও সচল ছিল। বারবার সনাক্ত করার ভিতর দিয়ে আরো একটা কথা প্রমাণিত হচ্ছে—সবার মুখেই বসাইয়ের আদল—সবাই বসাই—যে শোষণের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, লড়ে, মরে সেই বসাই। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদটিতে বসাই-কালী সাঁতরা সংবাদে বর্ণিত হয়েছে বসাইয়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ও তার নিজের রূপান্তরের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। অতিশয় অস্বস্তিকর প্রশ্ন বসাই তুলেছে। এ প্রশ্নের সব ক'টি

হয়তো ঠিক নয়, বসাইয়ের ক্রোধ হয়তো কতকটা ব্যক্তিগত— কিন্তু আমি সমালোচক হিসাবে বলব— উপন্যাসের বিচারে বসাই অতীব জীবন্ত চরিত্র। লক্ষণীয়, তার চলাফেরা, মানুষের প্রতি মমতা, জীবনের প্রতি আসক্তি, সহজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচিত্র বলিষ্ঠ বাগভঙ্গি, সব মিলিয়ে তার প্রত্যক্ষতা চ্যালেঞ্জের অতীত। কিন্তু তকিমাকার গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির নিরেট কর্কশ জমি তার পায়ের তলায় রয়েছে বলে তার মুখের কথা একটা মাত্র রাজনৈতিক কর্মীর মুখের কথা নয়—বহু দিনের ক্ষোভ আর বঞ্চনা দিয়ে গড়া মানুষের কথা— 'নতুন জমানায়, পারটির বাবুরা সানতাল-কাওরা-তিওররে ভাই ভায়া ভাবে? আঁ? তাথে সামন্তবাবুর বাসায় তুমরা পিয়ালায় চা খেতা, আমু মাটির ভাণ্ডে?' অথবা 'কালীবাবু, বামুন-কায়েত খেতমজুর হয় না। হলে খেত-মজুর সমাজেও ছুয়াছুত হত', অথবা 'লকসালরা গরম লোহায় হাতুড়ি মারতেছু, লিজেরা মরতে ডরাছু না, তাদের সবে রেসপেট দিবু হে, তুমুরা যারা মরথে ডরাও, তুমাদের দিব না' অথবা 'বাবু শিক্ষায় সানতাল মুতে দেয়'—এইসব কথা তত্ত্ব হিসাবে কতদূর যাতসহ সে না হয় কফি সহযোগে আরামকেদারায় বসে আলোচনা করা যাবে—কিন্তু একেবারেই অস্বীকার করা যাবে না, সামনের জ্যান্ত লোকটাকে। আমি মহাশ্বেতা দেবীর ঔপন্যাসিক ত্রুটি সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতন। তিনি তাঁর পক্ষপাত ও ক্রোধকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেন। একথা মানি যে, বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের দিনে যে আঙ্গিকরীতির আনুগত্য শোভন ছিল, সেই সমাজের অবক্ষয়ের দিনে সে আঙ্গিকরীতিও ভেঙে পড়ে। আবাহনের দিনের শুচিবস্ত্রে বিসর্জনের দিনে কাদা লাগবেই—কিন্তু এটা যেন একটা 'গিমিক' না হয়।

বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা সত্তর দশকের আগুন-রক্ত-ঝরা দিনগুলিতে একটা কথা ঠিক বুঝেছিলেন এ আগুন, এ রক্ত আমাদের সকলের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্রোতের মুখে' বা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বন্ধুমেধ' বা তপো-বিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' প্রমাণ করে বাঙালি লেখকদের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা তারাশঙ্করের উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি' প্রকাশিত হবার পর বর্তমান প্রবন্ধকারকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'দেখেছ, নকশাল আন্দোলন আগেও হয়েছে।' একথা আর কিছু প্রমাণ করে না—প্রমাণ করে একটা অস্বস্তিকর মতাদর্শের সামনে বাঙালি লেখকের আত্মসান্ত্বনা।

কবিতায় কলকাতার ছায়া

কলকাতা যখন কলকাতা হয়নি, যখন তা ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লীর প্রাকৃত সমাবেশ মাত্র, তখন একটা আধুনিক মহানগরীর সংশয়, স্ববিরোধ, উদ্বেগ কিছুই তার গ্রামীন ধারাগত জীবনকে স্পর্শ করেনি। সেদিন কালীঘাট ছিল মধ্যযুগীয় প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতীক। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে লেখা বাংলা কাব্যে কালীঘাটই ছিল এতদঞ্চলের প্রতিনিধি। তখনো পুরনো জীবন ভাঙে নি, একটা বাইরের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এই মেট্রোপোলিসের ক্রমবিবর্তন তখনো শুরু হয় নি। সেদিনের নৌযাত্রী গঙ্গাবক্ষ থেকে তীরবর্তী পল্লব প্রচ্ছায় ঘন গ্রামদৃশ্য দেখতে দেখতে এর ভাবীরূপের কোনো ইশারাই পায়নি। কালীঘাটের মন্দিরে পূজো দিতে নেমে সে শুধু তখনো পর্যন্ত অটুট এক জীবনাচরণকে প্রণাম করে গেছে।

> বালিঘাট এড়াইল বেণিয়ার বালা।
> কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
> মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
> তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥

কালীঘাটের কালিকার দৌলতে কলিকাতা শুধু যে আমাদের উত্তর অঞ্চলের প্রতিবেশীদের কাছে অল্পমাত্রায় পরিচিত তাই নয়, কবিতাতেও তাই নিয়ে আমাদের অহঙ্কার কিছু কম ছিল না— 'এই কলিকাতা কালিকাক্ষেত্র কাহিনী ইহা সবার শ্রুত' বিষ্ণু চক্র ঘুরেছে হেথায় মহেশের পদধূলিতে পুত।' কিন্তু তাহলেও কবিরা জানতেন, দেবীর দৌলতে কালীঘাটের গ্রাম-মহিমাকে অনন্ততার বন্দনা জানালেও মহানগর কলকাতার ধূলোয় প্রাচীন গৌরবের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতা নয় পুরাপ্রসিদ্ধ ষোড়শ মহাজনপদের কেউ। এখানে শতাব্দীতে শতাব্দীতে মঞ্চস্থ হয়নি ইতিহাসের করুণ পঞ্চাঙ্কের শেষ দৃশ্য, অথবা ফ্রেড়-নাটোর প্রগলভ বাচালতা। এর সে ট্র্যাজিক মহিমা নেই, যা থাকলে এর উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারতো— 'ময়ূর আসন চোরে নিয়ে গেল কোহিনূর গেল

সাগরপারে / কিছু না কহিলে নীরব রহিলে গরবী এই তো সাজে তোমারে ' তাই বুঝি এই কনিষ্ঠ ভারতীয় মহানগরী শৈশব থেকেই অঙ্গীভূত করে নিয়েছে এক সহজাত স্ববিরোধ, বার্গিজোর 'বিশ্ব ভাগিনী'— কথাটি বুদ্ধদেব বসুর— এ মহাজনপদের করকোষ্ঠীতে ছিল এক প্যাটার্ন-ভাঙার দুর্গ্রহ। পুরনো গ্রামীণ ঐক্য ভেঙে এর উন্মেষপর্বেই জেগে উঠেছে এক বিচিত্র প্রতিযোগিতাপরায়ণতা— যার আধুনিক ফল হল, অপরের মুখ কালো করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো সাধ নেই। উন্মেষপর্বে হুতোমদাসের প্যাচালীতে এটাই ছিল আরো 'ক্রুড'— 'হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে মিছে কথার কী কেতা।' 'দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল কলকাতার আগেকার সহবৎ, সাবেক ধারা ধরন। তার একদিকের ছবি মেলে হুতোমদাসের বিখ্যাত গানে 'খ্যামটা খানকীর খাসা বাড়ি ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা', আরেকদিকের পরিচয় পাওয়া যায় হুতোমদাসের অন্য একটি আক্ষেপে :

দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম দেখি চমৎকার।
অসহ্য হতেছে মাগো! অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই তো জ্বালা মা গো!
মলেও শান্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার,
হুতোমদাস তাই শহর ছেড়ে আসমানে করেন বিহার।

এ মহানগরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার উল্লিখিত তাড়না কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বরং বলা যায় অনেকেই 'স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর' এই শহরের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার বন্দনা গেয়েছেন। রূপচাঁদ পক্ষী তাঁদের অন্যতম। 'সেরে দিলে কলে কলে / এবার কলেতে বানাবে ছেলে'—রূপচাঁদের এই মন্তব্যের সঙ্গে হুতোমের 'মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার' এই আক্ষেপ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই নতুন শহরের 'মোবিলিটি' তথা গতিবেগের সামনে দাঁড়িয়ে এক একজনের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম হয়েছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে ভারতচন্দ্র যে ভাষায় বন্দনা করেছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী প্রায় সেই ভাষাতেই, ('চন্দ্রদেবের ষোলোকলা হতে উজ্জ্বলা / শুক্লপক্ষে উদেন শশী এর পক্ষপাত নাই কোনো নিশি / শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ নাই অন্তর') কলিকাতা বন্দনা করেছিলেন। বুঝতে ভুল হয় না এ শহর বন্দনা এক অর্থে ইংরাজ বন্দনা তথা রাজবন্দনাও বটে।

একটা বোধ প্রথম থেকে মজবুত হয়ে গড়ে উঠেছিল যে, এ মহানগর নতুন

রাজাদের কীর্তি। ধারণা জন্মেছিল এই রাজারাও মজবুত, এই মহানগরও মজবুত। আর তার সেই মজবুতির মহানাগরিক বস্তু প্রতীক হলো ফোর্ট উইলিয়াম— কলিকাতার কেল্লা। চারিদিকের ছুটন্ত মানুষ গাড়ি-ঘোড়া, ট্র্যাফিকের গতিবেগের মাঝখানে এই কেল্লা কালীঘাটের মন্দিরের থেকে নূতনতর এক স্থায়িত্বের বোধ এনে দিল। শাসক এবং শাসিত দু দলই ছিল দুভাবে সে বোধের অংশীদার। আঠারো শ' এগারো সালে লেখা একটি কবিতা 'Calcutta in 1811' কলকাতার তৎকালীন ট্র্যাফিক বিষয় হলেও জানাতে ভোলেনি কেল্লার সাম্রাজ্যমহিমা—'When the wide Fort resounds the evening horn' আর তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে যদি মনে মনে শুনে নেওয়া যায় তখন গড়ের বাদ্য 'রুল বৃটানিয়া রুল দি ওয়েভস', তাহলেই কলকাতা হয়ে যায় উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যাস্তবিহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতাপের প্রাসাদ। প্রাসাদময়ী সে নবনগরীকে অমরাপুরী বা স্বর্গপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত ('কোথায় অমরাপুরী কোথা স্বর্গপুর'), তুলনা করেছেন দীনবন্ধু মিত্র ('অলকা অমরাপুরী শোভা একাধারে'), তুলনা করেছেন রূপচাঁদ পক্ষী ('স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর')— কিন্তু এ স্বর্গপুরী যে ইংরেজের রচিত, লালিত ও তাদেরই কেল্লার দ্বারা রক্ষিত এ কথা বলতেও কেউ ভোলেন নি। ফোর্ট উইলিয়মের যখনই উল্লেখ করা হয়েছে কবিরা তখনই এর অজেয়তার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। দীনবন্ধু বলেছেন 'দক্ষিণে রক্ষিত দুর্গ শক্ত অতিশয় / বিজয় পতাকা ওড়ে শত্রু পরাজয়'। হেমচন্দ্র বলেছেন, 'অদূরে দুর্জয় দুর্গ গড়-খাই / প্রকাণ্ড মূরতি জাগিছে সদাই / বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই / চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়'। 'চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়'—এই উক্তিটির মধ্যে কি অবমানিতের বেদনায় অতিপ্রচ্ছন্ন অঙ্কুরকে অনুভব করা যায়? যে জাহ্নবী ধন্য বিষ্ণুপদরজ মাথায় ধরে, সে ইংরাজের কেল্লায় পা ধুইয়ে দিচ্ছে, পুরাণে অভিজ্ঞ হেমচন্দ্রের চোখে এ অসঙ্গতি তো এড়িয়ে যাবার কথা নয়! যাই হোক কেল্লা এবং কেল্লার অনুষঙ্গে গোরা বাহিনী কবিদের কাছে বৃটিশ শাসন ও কলকাতার স্থায়িত্বকে একাকৃতি দিয়েছিল। আঠারোশ পঁচাত্তর সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কলকাতা আসেন। "ভারতভিক্ষা" কবিতায় হেমচন্দ্র লেখেন:

> কোটি তারা যেন একত্রে উঠে,
> সৌধ চূড়ে চূড়ে রয়েছে ফুটে
> গৃহ পথ মাঠ কিরণময়—
> নিশিতে যেন বা ভানু উদয়।

ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন
বৃটিশের ভেরী শমনদমন
রুল বৃট্যানিয়া রুল দি ওয়েভ্‌স্‌
সঙ্গীত তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

কলিকাতা মহানগরীতে মূর্ত সাম্রাজ্য মহিমার সামনে বাঙালি কবির সে অভিভূতি পরোক্ষে এই শহরের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতার স্বীকৃতিও বটে! এ কলকাতা যে ইংরেজ শাসকশক্তিরই নগর প্রতিমা তাও যেন চমৎকার ফুটে ওঠে দীনবন্ধুর কলিকাতা বর্ণনায়—বীরকীর্তি মনুমেন্ট পরশে গগন / কলিকাতা হাতে রাজদণ্ড সুশোভন। চাঁদপাল ঘাটে বা ডকে জাহাজের সারী একবার হেমচন্দ্রের মনে হল 'জাহ্নবী সলিলে এদিকে আবার / দেখ জলযান কাতারে কাতার / গুণবৃক্ষ যার শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায়, আবার দীনবন্ধুর মনে হল —বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগণন / ভাসিতেছে জলে যেন দেবদারু বন। এ সম্পদ, এ ঐশ্বর্যের সঙ্গে যে ঐ কবিদের দৃষ্টির যোগই মাত্র আছে, অন্তরের যোগ নেই তা তো বোঝা যায় হেমচন্দ্রের উদ্ধৃত কবিতাটির নাম দেখে। "ভারত বিলাপ" নামটিই যেন বুঝিয়ে দেয় এ কলকাতার ঐশ্বর্য পরস্ব ঐশ্বর্য। ঈশ্বর গুপ্তের চোখে দেখা কলকাতার বড়দিনের মতো তার সবটুকুই পরহস্তগত।

তবু একটা গৌরববোধ কলকাতাকে ঘিরে বাঙালি কবির জেগে উঠেছিল। সেটা হল ক্যালকাটা এলিটদের সম্বন্ধে গর্ববোধ। সুরধুনি কাব্যে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে শহরের গ্রন্থকার, সম্পাদক, শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক, চিকিৎসক, বাগ্মী প্রভৃতির, তেমনি রূপচাঁদ পক্ষীর কলকাতার গানেও এই সব সর্বাগ্রগণ্যদের কথা বেশ সবিস্তারে বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, দীনবন্ধু যেমন এলিট তালিকায় সংবাদপত্র সম্পাদকদের প্রাধান্য দিলেন, কী কারণে জানা যায় না রূপচাঁদ প্রাধান্য দিলেন ডাক্তারদের। কালী হালদার, আর. জি. কর, মহেন্দ্র সরকার প্রমুখ নানা স্বরের ডাক্তারদের কথা তো তিনি বলেইছেন, এ কথাও কলকাতার গৌরব বলে তিনি মনে করেছেন, 'গঙ্গাধর সেন, রমানাথ সেন আরাম করেন পিলেজ্বর'।

কিন্তু এই প্রাসাদ-গ্যাসের আলো-কলের জল (বেলা চারটের কলে জল আসা নিয়ে একটা সুন্দর গানও লেখা হয়েছিল) স্টিম ভেসেল ইত্যাদির মাঝখানে এ মহানগরীর বুকভরা ব্যথার হদিশও কেউ কেউ পাচ্ছিলেন। নৈশ কলকাতার সে ছবি এঁকেছেন বিহারীলাল তাঁর 'প্রেমপ্রবাহিনী'-তে:

কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে
সে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে,
ব্যোমময় তারা সব করে দপদপ
যেন মণিখচিত অসীম চন্দ্রাতপ ;
কোনোদিকে কোনো রব নাহি শুনা যায়
কভুমাত্র পিয় কাঁহা হাঁকে পাপিয়ায়।
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো করে
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে।
ফিরিয়াছি পথে পথে পাড়ায় পাড়ায়
যেখানে দুচোখ গেছে গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হররা উল্লাস চিৎকার
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার।
কোথাও উঠিছে হরিবোল হরিবোল,
ধেই ধেই নাচিতেছে বাজিতেছে খোল।
পথে পথে শুঁড়িদের ধনা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণা হাসি খেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়,
গায়ের বিটকেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোনো পথে বাবুজির পাটশালের দ্বারে,
পড়ে আছে দু এক অনাথ অনাহারে।

এই প্রথম এক সংবেদনশীল কবির মন্ময়তায় প্রতিবিম্বিত হল এই মহানগরের উল্টোদিক। প্রাসাদনগরীর আলোকিত অহঙ্কার, রাজদণ্ডস্বরূপ মনুমেন্টের তুঙ্গ উচ্চাশা, গড়ের প্রায় অবিনশ্বর অটলতা, চাঁদপাল ঘাটের চমকদার চাকলা, চৌরঙ্গীর জেল্লাদার সান্ধ্য বিলাসের অন্যদিকে, আড়ালে, পিছনে যে এক বিকার বিহ্বল কলকাতা রয়েছে — এ কবিতায় সেটা ধরা পড়ে। উদ্ধৃত অংশের শেষ দুটি ছত্রে এ মহানগরীর অহমিকা এবং গ্লানির যুগপৎ অবস্থিতি। এই প্রথম কলকাতার নৈশপ্রমত্ততা যে এক বিষণ্ণতার পরিবেষক তা জানা গেল। কিছুদিনের মধ্যেই তার নৈশ-নিস্তব্ধতার প্রায় পরাবাস্তব বর্ণনা দিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী "গভীর নিশীথে" কবিতার এই অংশে :

'কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার সাগরে
মগ্ন ধরা। চারিদিক এমনি সুস্থির—

প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
সহরের প্রান্ত হ'তে আর প্রান্তে যায়!
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে। এ কি ভয়ঙ্কর ভাব!

ধীরে ধীরে এই শহরের মোবিলিটি ও এ্যানোনিমিটির স্বরূপ কবিতায় ধরা পড়তে লাগল। শিবনাথ শাস্ত্রীর আর একটি কবিতায় (দ্বীপান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত মাতাল) দ্রুত পরিবর্তমান কলকাতার নির্মমতা ও উদাসীনতার একটি ছোট ছবির কথা এখানে মনে পড়ে। তবে এ বিষয়ে ভুল নেই যে, রবীন্দ্রনাথের "নগর সঙ্গীত" ('চিত্রা') কবিতাটিতেই প্রথম মহানগরের আঁতের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সে কথা হল মহানগরের গতিবেগের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা; সে মাদকতায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাওয়া। কলকাতার ছুটন্ত রূপটাই কলকাতা, কলকাতা কলকাতাতেই, মানে তার সেই গতিবেগের মধ্যেই, একথা বলার কত আগে কলকাতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই 'থ্রিল' অনুভূতিটি উচ্চারিত হয়েছিল— 'সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন, পশ্চাতে কিছু না রাখে চিহ্ন, পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন ছুটিছে মৃত্যু পাথারে'। অনেক পরে ঠিক এমন ভাবে নয়, এমন করে নয়, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুও তাঁর "কলকাতা" ('শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর') কবিতায় এই শহরের প্রেম আর নির্মমতার মিশ্ররূপের বন্দনা করেছেন প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেমিকার মতো :—

তুমি কাউকে মনে রাখো না, তুমি শুধু পায়ের শব্দ,
মমতা করো না অতীতেরে, তুমি শুধু গতির বেগ—

এই শহরের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বন্দ্বময়তায় কোথায় যেন রয়েছে এক উদাসীনতা ও আগ্রহের অসবর্ণ মিশ্রণ। এ আমাদের আহ্বান করে, কিন্তু কিছু হাতে তুলে দেয় না, ডাকে কিন্তু সাড়া দেয় না। "নগর সংগীত"-এর কবি বলেছিলেন 'পূজা দিয়ে পদে করি না ভিক্ষা বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা কে কারে, জিনিবে হবে পরীক্ষা'—বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আরো অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত হয়ে উঠল একথাই :—

কোনো কথা তুমি দাও নি আমাকে, শুধু ডাক দিয়েছিলে,
আমারও কোনো যৌতুক ছিল না, উৎসুক অনিশ্চয়তা ছাড়া ;
তবু তাই—তাই তোমার রাস্তার বাঁকে বাঁকে
আমার চোখের সামনে
খুলে গেল ভবিতব্যের দুয়ার।

রবীন্দ্রনাথের কলকাতা আর বুদ্ধদেবের কলকাতার মধ্যে মিল এইখানে, কলকাতা লভ্য নয়, জ্ঞেয়। অমিল এইখানে যে কলকাতার জীবনরস রবীন্দ্রনাথের কাছে জ্ঞেয় হলেও পেয় নয়, বুদ্ধদেবের কাছে পেয়। কিন্তু কলকাতা ধরা দিয়েও ধরা দেয় না। "নগর সঙ্গীত"-এর কবি এই কলকাতারই ছেলে। কলকাতা থেকে তাঁর যাত্রা শুরু। কলকাতা নিজে তাঁর কাছে কোনো নতুন দিগন্তের সংবাদ পাঠায়নি। বুদ্ধদেব পৌছলেন কলকাতায়— তিনি বাইরের ছেলে। তাই আবরণে অনাবরণে অর্ধাবরণে কলকাতা তাঁর কাছে রহস্যময়ী। রবীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতা গদ্যে পদ্যে মেশানো। বুদ্ধদেবের কাছে কলকাতা গদ্যকবিতা। একটা কথা লক্ষ করি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় কলকাতাও হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনভাষ্যের এক অন্যতর প্রতিমা। বৌবাজারের মোড়ে ফুলের দোকানের পাশে কসাইয়ে মাংস থুড়চে —এই জাতীয় অভিজ্ঞতা আসলে কলকাতা সম্বন্ধে কবির বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা নয়, জীবন সম্বন্ধে কবির সাধারণ অভিজ্ঞতার ঘটনাসঙ্কেত। কলকাতাকে কবিরা কবিতায় নিয়ে এসেছেন আধুনিক তাৎপর্যে তিরিশের যুগে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাই বা ভুলে যাবো কী করে যে, কলকাতার কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথই সর্বাগ্রগণ্য। কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ার রবিবারের দুপুরের শ্রাব্যরূপ ('নবজাতক'-এর "এপারে ওপারে" কবিতা) অথবা কিনুগোয়ালার গলির দৃশ্যরূপ ('পুনশ্চ'-এর "বাঁশি")—এই সব কবিতা তো মনে করতেই পারি, আরো মনে করতে পারি "ক্যামেলিয়া"র মতো নানা কবিতা, কলকাতার পট পরিবেশ যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কলকাতা সব থেকে জমে উঠেছে যে কবিতায় সেটি সহজ পাঠের একটি সহজ কবিতা—'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু'। কলকাতার স্বপ্নছায়ায় যেন পরাবাস্তবের ছোঁয়া লাগলো ঠিক তখনই যখন 'ইঁটে গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা' ছুটতে শুরু করলো। তারপরই আর রাস্তা অজগর সাপ হতে বাধলো না, হাওড়ার ব্রিজ বিছে হয়ে গেল, যে-মনুমেন্ট ঊনবিংশ শতাব্দীর কবির কাছে— একটু আগে আমরা বলেছি সে-কথা — রাজদণ্ডরূপে সহজে প্রতিভাত হয়েছে, সে মনুমেন্ট হয়ে গেল খেপা হাতির শুঁড়। ছুটন্ত কলকাতার দোলানিতে— 'মনুমেন্টের দোল যেন খেপা হাতি শূন্যে দোলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি'। কিন্তু কলকাতার এই স্বপ্নলব্ধ অদ্ভুত হাবভাবের মধ্যে একটা বোধ হয় অন্য কথাও উঁকি ঝুঁকি দেয়— এই সতত চলিষ্ণু শহরে প্রতিমুহূর্তের রূপান্তরের মোচড় লেগেই বুঝি এই এক এক আকারে অদ্ভুত অদ্ভুত ছুটন্ত আরণ্যক প্রাণীর আদল লেগেছে। ছবিগুলি বুঝি

কলকাতারই অবচেতন অভিপ্রায়ের ইশারা। ছুটে কোথায় যাবে কলকাতা সেটা বড়ো কথা নয়— ছুটন্ত ব্যাপারটাই কলকাতা। তাই শেষ কথা— 'দেখি কলকাতা আছে কলকাতাতেই'। এটা স্বপ্নভঙ্গ নয়, এটাই কলকাতার রিয়্যালিটি।

কবিতায় কলকাতার কথা বলতে গেলে একটু আলাদা করে বলে নিতে হয় কলকাতার কবিতায় ট্রামের প্রসঙ্গ। ট্রাম কলকাতার প্রতীক—বাস তো জেলা শহরেও আছে—কিন্তু বিদ্যুৎবাহিত ট্রাম আর মানুষে টানা রিকশ'র পাশাপাশি অবস্থান বুঝি একমাত্র কলকাতার ব্যাপার। নৌকায় বসে দুপাশের তীর-ভূমিকে দেখতে দেখতে চলা নিশ্চয় উপভোগ্য। ট্রামের জানালা দিয়ে একটু আলস্যের সঙ্গে রাস্তার দৃশ্যও কম উপভোগ্য নয়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এভাবেই দেখেছিলেন—'শ্রমসঙ্কুল ট্রাম চলা রাস্তার দুধারে বৃক্ষচূড়ায় এসেছে চৈত্র'। ট্রামেই ক্যামেলিয়ার নায়কের সঙ্গে নায়িকার দেখা হয়েছিল। বিষ্ণু দে-র "টপ্পা-ঠুংরি"র নায়ক এক লিবিডো তাড়িত উদভ্রান্ত দিনে চঞ্চল কল্পনায় স্বেচ্ছাতন্ত্রী বাস ছেড়ে দ্বৈতাচারী ট্রামই ভালো বলে ভেবেছে। তখনো কিন্তু নতুন ব্রিজে ট্রাম লাইন পাতা হয়নি। বুদ্ধদেব দেখেছেন শূন্য ট্রাম লাইনে জলের মতো চিকচিকে জ্যোছনা,— কবিরা এও দেখেছেন 'আপন জরায়ে কোলে ক'রে ট্রামের জানালা আলো করে কলেজের ছাত্রী', ওদিকে ট্রামের কম্পিত তারে বিদ্যুৎ চমক। ট্রাম যেন দুই পঙ্‌ক্তিতে বাঁধা—ওপরে বৈদ্যুতিক তার, নিচে লোহার লাইন— নিয়মিত শ্লোকবন্ধে গাঁথা কবিতা— বাস গদ্যের ভারবাহী। সমর সেনের ট্র্যাম থেকে নেমে চৌরঙ্গীকে দেখা, অথবা কামাক্ষী-প্রসাদের ভরা ট্রাম ও ফাঁকা ট্রামের উল্লেখ একথাই যেন বলতে চায়, কলকাতায় ট্র্যামই ছিল, অন্তত এককালে ছিল, একটি হৃদ্য অভিজ্ঞতা। আর ট্রামের কথা উঠলে আলাদা করে যাঁর কথা বলতেই হয় তিনি জীবনানন্দ। লক্ষ করি ট্রামের চেয়ে নিস্ট্রাম্ ট্রাম লাইন তাঁকে টানতো বেশি। যাদের কিছু নেই।

—আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাথ ধরে অথবা ট্রামের লাইন
মাড়িয়ে চলেছে
তাদের আকাশ কোনদিকে?

(এইসব দিন রাত্রি)

ট্র্যামের লাইনে তারা কিসের ইশারা পায়? ব্যর্থ অন্ধকার কি মৃত্যুর

কোনো অনুষঙ্গবাহী ? 'মহাপৃথিবী', কাব্যগ্রন্থের "ফুটপাথে" কবিতায় মৃত্যুর ছিম অনুষঙ্গটি আরো স্পষ্ট :

কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো
এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের
বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।

একটু পরেই আবার ট্রামের লাইনের প্রসঙ্গে তিনি 'লিকলিকে' বিশেষণ ছবি ব্যবহার করেছেন। সরু, সর্পিল এবং সেই সঙ্গে পিচ্ছিল হয়ে সে বিশেষণ-ছবি সাপের কথা সেই সঙ্গে পরোক্ষ মৃত্যুর কথা মনে করায়। "একটি নক্ষত্র আসে" কবিতায় শেষ ট্রাম চলে যাবার পরেই কলকাতার অদ্ভুত নৈঃশব্দ্যের উপমান হিসাবে কবি 'অন্তিম নিশীথ' কথাটি ব্যবহার করেন—"অন্তিম" এই সমাপ্তিসূচক বিশেষণটি আর অবহেলা করা যায় না। তাঁর জীবনেরও অন্তিম রাত্রির সঙ্গে ট্রামের সংযোগের কথা আমরা ভুলিনা, তাঁর জীবনের শেষ ট্রাম। তাই জিজ্ঞাসা করতে হয়, তিনি কি টের পেয়েছিলেন ?

জীবনানন্দ পরাবাস্তবী ছিলেন কিনা আমি জানিনা। কিন্তু যেহেতু যে কলকাতার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাতের কলকাতা, তাই তাঁর গহন মনের তলদেশে প্রতিফলিত সেই রাতের কলকাতার বাস্তবতর প্রতিমাগুলি অবিস্মরণীয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তাঁর সুবিখ্যাত "রাত্রি" কবিতাটি। সে রাত্রে মোটরকার গাড়লের মতো কেশে অস্থির পেট্রল ঝেড়ে চলে যায়, 'তিনটি রিকশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাস-ল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদুবলে,' 'ফিরিঙ্গি যুবক কটি চলে যায় ছিমছাম। থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতা তার অনিবার্য তাৎপর্য সমেত এ কবিতায় মূর্ত হয়েছে। রূপ যে কত পাল্‌টে গেছে, যাচ্ছে, তা বোঝা যায় বিহারীলালের চোখে দেখা নৈশ কলকাতার সঙ্গে জীবনানন্দের দেখার তুলনা করলে। জীবনানন্দের কলকাতা আধুনিক জগতেরই মতো **irrational** জগৎ। সেখানে বহু অতাদ্ভুতের পাশাপাশি অবস্থান। মনে পড়ে "ভিখিরী" কবিতাটিকে। আরো মনে পড়ে "এই সব দিন রাত্রি" কবিতার এই অংশ :

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি এক কুষ্ঠ কলঙ্কিত নারী

কেমন আশ্চর্য গান গায় ;
বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ,
বেহালা বাজায়।

কুষ্ঠ এবং নারী, মিনসে এবং বেহালার সহাবস্থানে যেন এই শহরের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বহু বৈষম্যের ভারে স্থির বিষন্নতার জোরালো ছবি ফুটে ওঠে।

এ শহরের রাত্রির চিত্র যেমন জীবনানন্দের, এর বিকেল বা সন্ধ্যার ছবি তেমন বিষ্ণু দে-র। "জন্মাষ্টমী" কবিতার প্রথম স্তবকে ট্রাফিক বিহ্বল ভীরাক্রান্ত কলকাতার সন্ধ্যার ছবি বিষ্ণু দে-র নগরচিত্রগুলির প্রতিনিধি বলা চলে। এ সন্ধ্যার কথা তিনি নানা কবিতায় বলেছেন, কখনো ব্যঙ্গের তির্যক ভঙ্গীতে, কখনো বা গভীর সমবেদনায়। তখনকার মধ্যবিত্ত কলকাতার সার্বিক এ্যানোনিমিটির বিবর্ণতা যেমন ফুটে উঠেছে "জন্মাষ্টমী" কবিতার এই অংশে—'তারপরে চা এবং তাস/ব্রিজ ভালো, না-হয় তো ফ্লাশ। /ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।/তারপরে বাড়ি, অম্লশূল আর সর্দিকাশি/ এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল।' তেমনি আবার মনে পড়ে কলকাতার আগেকার দিনের কথা। "আমাদের মেয়েরা" কবিতায় ঠাকুরের মরস্বর্গে, বাংলার বুর্জোয়ার রেনেসান্সে 'কলকাতায় পাড়া ছিল, পাড়ায় পাড়ায় গন্ধ ছিল, স্বাদ ছিল, ছিল বিশিষ্ট চেহারা, ছিল প্রতিবেশী'। দাঙ্গার বিদারক দিনগুলিতে আবার এই সন্ধ্যার উদ্দেশ্যে কবি বলেন, 'তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ/দগ্ধদিনে মৃত্যুর শহরে' (জল দাও)। জীবনানন্দের কবিতায় কলকাতার স্মৃতি কোনো আলো ছড়ায় না। মনে রাখি কলকাতায় বুদ্ধদেবের মতো তিনিও আগন্তুক। পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে কলকাতার ছেলে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দেরও কলকাতা জড়িয়ে রয়েছে স্মৃতিতে, সত্তায়, আর ভবিষ্যতের চেতনায়। জীবনানন্দ 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' এই অলীক স্বপ্নে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছেন, শান্তি শেষ পর্যন্ত প্রেমে। বিষ্ণু দের কলকাতা বুঝিবা অপেক্ষমান কলকাতার পার্কে ক্রীড়া-চঞ্চল ছোট ছেলেগুলির মধ্যে। "পার্কে" কবিতাটির প্রৌঢ় নায়ক, বলেন, 'বেশ লাগে দলবদ্ধ কিশোর আগ্রহ, একটু বা ভয়ে দেখি, কেননা হঠাৎ বল মাঝে মাঝে ছোটে দিশাহারা, গায়ে লাগে, এঁকে দেয় পেনসনের শার্টে কোটে পঙ্কের ভূষণ'। কিন্তু এখান থেকে সে প্রৌঢ় প্রত্যয়ও সংগ্রহ করেন, তাকে ভাষা দেন :

সবাই প্রজ্ঞায় স্বচ্ছ, যেন ভারতের জীর্ণ দীর্ঘ ইতিহাসে
এরাই একাল থেকে সেকালের মোগলপাঠান মৌর্য বা কুশন
বহু মৃত্যু দেখে দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রত্যয়ে
ভবিষ্যতে, যা এদের বর্তমান, এরা যার পুষ্টি ও পূষণ।

তখনই আমাদের কবিতার বইটির নাম আরেকবার মনে পড়ে—'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ।'

জীবনানন্দ যে ভিখিরিটাকে—আহিরীটোলায় যে একপয়সা পেয়ে যাবার সাফল্যে দীর্ঘ পদযাত্রায় বিমুখ হয়নি, আর বুদ্ধদেব বসু "মুক্তির মুহূর্ত" কবিতায় যে উঞ্ছজীবীটির জন্য সব থেকে শস্তা দেহজীবিনীর কাছে অনুরোধ জানান, 'বোন, তাকে দিয়ো সব, সার সত্য, যা-কিছু তোমার', এরাই কলকাতার দুর্মর মানবতা। এইভাবে কলকাতা নতুন কবিতার নায়ক সৃষ্টি করে। এই ভাবেই সে নতুন সুন্দরকেও চোখের সামনে ধরে দেয়— কলকাতার বৃষ্টি (বিষ্ণু দে), দুর্ভিক্ষে আগন্তুক জনতাকে আবেদন (অমিয় চক্রবর্তী), পথ ভোলা জোনাকি (বুদ্ধদেব বসু), চিড়িয়াখানার বাঘ (প্রেমেন্দ্র মিত্র), বিষণ্ণ সকাল (সমর সেন), পথের নিরভিভাবক কুকুরদের গায়ের রঙ (বুদ্ধদেব বসু), চেতন স্যাকরার গলি, যা অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয় কিছু গোয়ালার গলির কথা (অমিয় চক্রবর্তী) ইত্যাদি অন্য অনেক কিছু।

হুতোম দাস তাঁর সুবিখ্যাত গানে এক শতাব্দীরও বেশ কিছুটা ওদিকে বসে শুনিয়েছিলেন কলকাতার আত্যন্তিক স্ববিরোধের কথা। শতাব্দীর ব্যবধানে সে স্ববিরোধ আজ চেহারা পাল্টেছে, আরো এক নিহিত ও নিগূঢ় কনট্রাডিকশনের কথা জানিয়ে দিলেন একালের কবিরা। উদ্বেগ আর প্রত্যয়, আকাঙ্ক্ষা ও অনীহা, আমন্ত্রণ অথচ প্রত্যাখ্যানে মিশ্রিত এই মহানগর।

এ যুগের কবিতা সেই বিরোধাপন্ন আত্মচেতনার সাক্ষী। উপেক্ষা এখানে মমতাকে টপকে যায় না, আত্মম্ভরিতা স্নেহের কাছে নতজানু— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "কলকাতার যিশু" অসামান্য কবিতাটি সেই দুর্মর মানবিকতার স্মারক। দ্রোহবুদ্ধির কৌটোয় এখানে লুকোনো থাকে ভালবাসার আশ্চর্য আতর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "আমি ও কলকাতা" কবিতাটি তার নিদর্শন। অফুরন্ত কলকাতা— তাই অফুরন্ত তার কবিতাও। সুনীলের কবিতাটি থেকে একটু তুলে দিয়ে একথা শেষ করি:

'কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না—

চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্রাফিক বাতি, বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি ?...'

গল্পের দর্পণে সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের গল্প পড়তে পড়তে আমার একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চেনা হয়ে যায়— তিনি ফিল্মের সত্যজিৎ হতেও পারেন, নাও পারেন। বরঞ্চ বলা ভাল; গল্পের ভিতর দিয়ে যাকে পাই তিনি ব্যক্তি হিসেবে একটা পুরোমাপের মানুষ— স্ববিরোধ সমেত আস্তো মানুষ। স্ববিরোধ সমন্বিত আস্তো প্রাণবান অখণ্ডতার জন্যই সেই ব্যক্তিটি এত চিত্তাকর্ষক। তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে সে ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষে পেয়ে যাই বলে সরাসরি তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা আমি কখনো করিনি। করিনি যে তার অবশ্য দুটো কারণ আছে। এক, সে কার্যকারণের অভাব। দুই, একটি প্রতিনক্ত অভিজ্ঞতা। আমার এক সহকর্মী 'অপরাজিত' চিত্রস্থ হবার পর কলকাতার রাস্তায় শ্রীরায়কে দেখতে পেয়ে বলে বসেছিল— 'দারুণ বই হয়েছে মিঃ রায়।' মিঃ রায় নাকি কোনো জবাব দেননি— স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণটাও উচ্চারণ করেন নি। এই সূত্রেই সংযত হলাম ফেলুদাকে দেখে— গায়ে পড়ে আলাপ ফেলুদা পছন্দ করেন না। কিন্তু তাতে কোনো আফশোস নেই। কেননা গল্পগুলি পড়তে পড়তে বিকল্পে একজন চোখের সামনে ভেসে ওঠেন— যার আকার প্রকার হাঁটা চলা খাওয়া দাওয়া রুচি অরুচি এমনকি পড়াশুনায় আগ্রহ পর্যন্ত নিটোল বৃত্তে সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

'মাথায় বড়ো' কথাটিকে শ্লেষার্থে ধরার আগে দেখতে পাই তাঁর প্রধান চরিত্ররা সকলেই সাধারণ বাঙালির চেয়ে দীর্ঘতর। তাঁর প্রোফেসর শঙ্কু সাড়ে ছফিটের বেশি, "খগম্"-এর ইমলি বাবা বসে থাকলে বোঝা যায় না, দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় কত লম্বা। বাতিকবাবু ছ-ফুট। ফেলুদাও উঁচু মাপের মানুষ। তপেশও কৈশোরেই পাঁচ-সাত। নীহার দত্ত ছয়। তাই বলে সবাই তো সমান মাপের হয় না। "অনাথবাবুর ভয়" গল্পের অনাথবাবু, "পটলবাবু ফিল্মস্টার" গল্পের পটলবাবু, "প্রোফেসর হিজি বিজ্ বিজ" গল্পের হিজিবিজ্ বিজ বেঁটে মানুষ— কিন্তু মজাটা এই যে, এরা কেউ ছোট মাপের মানুষ

নয়। এইবার আমার ব্যবহৃত 'মাথায় বড়ো' কথাটিকে শ্লেষার্থে নেবার সময় এল। অনাথবাবু পটলবাবু হিজিবিজ্‌বিজ মনে মেধায় স্বপ্নে সন্ধানে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুমাপের মানুষ। এ্যাভারেজ আকৃতির মধ্যেও থাকে অসাধারণ কোনো অভিপ্রায়— যে অস্তিত্ব অন্তর্গূঢ়, তার একটা ইঙ্গিত এসব চরিত্রগুলির মধ্যে চমৎকার। তখন বেশ বোঝা যায় একটা মনের সাবয়ব সান্নিধ্য গল্পগুলিতে কলোচ্ছ হয়ে উঠছে— বাইরের মাপের দিকে নয়, ভিতরে মাপের প্রতি অদম্য কৌতূহল যার চরিত্র। ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তবু আভাসে আবছায়ায় উঁকি দেয় সেই মানুষটির জীবনকে দেখার একটা ভঙ্গি। লম্বা মানুষগুলি প্রায়ই যাকে বলে সাক্‌সেসফুল ম্যান। খ্যাতির সম্পদে সম্পন্ন প্রোফেসর শঙ্কু, সাফল্যে স্বচ্ছল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর প্রদোষ মিত্র। অপেক্ষাকৃত হ্রস্বকায় মানুষগুলি সেই অনুপাতে উজ্জ্বল নয়, বাইরের বাজারে দাম কষার প্রতিযোগিতায় তারা বিশেষ জেতে নি। কিন্তু এই চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে এদের স্রষ্টাকে চেনা যায়। পার্থিব পাওনা বা না-পাওয়ার নিরিখ ব্যবহার করে যে যাচাই শেষ করা যায় না— এ চরিত্রগুলি যেন সে কথাই বলে।

আমরা যারা এ্যাভারেজ, পদক বা তকমা যাদের ছুঁয়ে যায়নি, তারাই ব্যস্ত একথা প্রমাণ করতে যে, সকলেই আমার সেই ছাব্বিশ ইঞ্চির মাপের মধ্যে বন্দী। সত্যজিৎবাবু প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী বলেই জানেন, বঙ্কুবাবুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোল-টিচারের খোপে বন্দী করে রাখা যায় না। শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডার মেম্বররা অথবা অনুলেখ্য প্রচ্ছদের কারণে ক্লাসের ছাত্ররা যতই চেষ্টা করুক না কেন বঙ্কুবাবুকে আরো ছোটত্বে চিহ্নিত করতে— আদ্যোপান্ত বঙ্কুবাবু কখনো তা নন। জীবন তাকে আপাতবিচারে দিয়েছে অকিঞ্চিৎকরত্ব। তা শুধু স্থূল হৃদয়-হীনতার কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণ। 'বঙ্কুবাবু' কিন্তু কখনো রাগেন নি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন— 'ছিঃ!' এই 'ছিঃ' অনেক তথাকথিত বৈপ্লবিক আস্ফালনের চেয়ে মানবিকতর ধিক্কার। এটাই লেখকের নিজের গলার স্বর— অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ়, উপেক্ষায় সংক্ষিপ্ত হতে জানে সে স্বর, কিন্তু মনোভাবের অভিব্যক্তিতে অব্যর্থ নির্ভুল তার উচ্চারণ। বোঝা যায় লেখকটি এমন একজন, যিনি অর্থনীতির পাতায় মোড়া মানুষ খোঁজেন না, খোঁজেন না রাজনৈতিক সংবাদপত্রের ঠোঙায় পোরা মানুষ। নামহীন সংসারে খবরহীন পরিচয়হীন মানুষকেও তিনি চান না। তিনি বরং বিবর্ণ

বঙ্কুবাবুর জীবনের সীসক ধূসরতার মাঝখানে ধরিয়ে দিতে চান তার শীর্ণতম স্বর্ণরেখাটির অস্তিত্ব— ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলেদের মধ্যে দু-একটি করে ভাল ছাত্র প্রতিবারেই থাকে. বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে, তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। তাদের তিনি বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেশ বিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান— আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প— তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারেন। দেখতে দেখতে বঙ্কুবাবু কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোল আর বাংলা ক্লাসের চার দেওয়াল ছাড়িয়ে নিজের মাপের বাইরে চলে যান আর তিনি খুঁজে পান নিজের অবিকল সত্তাকে। সত্যজিৎবাবু আমাদের বলছেন এভাবে যেতে গেলে মাথা ঠুকে যায়— শ্রীপতি উকিলের আড্ডায় তাই যেত বঙ্কুবাবুর। মাথা খাড়া রাখার উপায়ও আমরা পেয়ে যাই ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং-এর কাছ থেকে— 'অতিরিক্ত নিরীহতা কোনো কাজের কথা নয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হয়।' অ্যাং-মশাইয়ের কাছ থেকে একথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আলাপ আরেকটু ঘন হয়। আমি চিনতে পারি এক চাপা বিদ্রূপে ভরা হাসি। 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হয়'— ইত্যাদি কথাগুলি এই গ্রহের মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করালে তা বস্তাপচা অনৃত ভাষণ হয়ে যেত। এই গ্রহে বুঝি আর ওকথা বলার লোক নেই— বঙ্কুবাবুরা, মানে আমরা, এটা বুঝি। তাই সুদূর ক্রেনিয়াস গ্রহের পথছুট আকাশযাত্রীর অবতারণা! আরো একটু বুঝতে পারি—শ্রীরায় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকীয় অর্থে রোমান্টিক নন— কিন্তু বিংশ শতকের শেষ প্রহরে দাঁড়িয়ে প্রসারিত মহাকাশ চেতনা ও পরমাণু চেতনা থেকে নবতম বিস্ময়ের উপাদান সংগ্রহ করে তিনি মানবিক অশেষত্বের আরেক দরজা খুঁজে পান। বঙ্কুবাবুর প্রত্যহের ছকবাঁধা অস্তিত্বের উপর সেই মহাকাশ বিস্ফোরিত হয়েছিল। এক লহমায় 'বেঙ্গলি কায়স্থ বঙ্কুবিহারী দত্ত' আত্মপরিচয়ের জন্য আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেন— যা তিনি এতদিন উচ্চারণ করেন নি— 'মানুষ'। আরো লক্ষ করি তিনি শ্রোতা বা পাঠক হিসাবে বেছে নেন তাদের যারা ছোট হলেও 'খোকা' নয়। বড়ো হলেও 'পাকা' নয়।

"পটলবাবু ফিল্মস্টার" গল্পের পটলবাবুও বাহান্ন বছরের মানুষটি, বেঁটেখাটো মাথার টাক— বাইরের বিচারে মনিহারি দোকানদার, ছোট বাঙালি আপিসের কেরানি, বীমার দালাল। খুব পরিচিতির মানুষই বটে। কিন্তু

ভিতরের মাপে তিনি অভিনয় শিল্পী। এই গল্পটি পড়তে পড়তে যেমন আমরা একদিকে পেয়ে যাই পটলবাবুকে তেমন আর একদিকে পেয়ে যাই সত্যজিৎ বাবুকে। যে মুহূর্তে তিনি তার পার্ট বলে (আঃ) বুঝতে পারেন উৎরে গেছে ব্যাপারটা, সেই মুহূর্তে তিনি আর দশ-বিশ-পঁচিশ টাকার একস্ট্রা নন। বাইরের পাওনার ছোট্ট খোপে তিনি আর বন্দী নন। কিন্তু কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা টাকার তোয়াক্কা না করেই তিনি হাঁটা দিলেন। দুটো গল্পের মূল সুর একটা— অন্তর্লীন আত্মপ্রত্যয়ের মুক্তি। 'আঃ' এই ক্ষুদ্র অব্যয়টির অনন্ত সম্ভাবনা পটলবাবুর সামনে যখন খুলে যায় তখন কিন্তু আমরা কেবল বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পিকিং পার্ট-এর জন্য মহড়ারত অভিনেতাকেই দেখি না, অভিনয় শিক্ষক সত্যজিৎ রায়কেও দেখতে পাই। 'আঃ' যে কত-গুলো তা শ্রীরায় পটলবাবুর কান দিয়ে আমাদের শুনিয়ে দেন। ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি দিক এই গল্পে ফুটে ওঠে পরোক্ষে— সেটা হল তাঁর শৈল্পিক বিনয়। ফিল্ম জগতের একটা দিন নিয়ে এই গল্প। তিনি নিজে যে জগতের বিশ্ববন্দিত মানুষ। গল্পটিতে কিন্তু ছবি তোলার অনুপুঙ্খ অতি পরিমিত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্যুটিং দেখলে যতটুকু দেখতে পাই তার বেশি কিছু নেই। এটা তাঁর নিজস্ব বিনয় এবং ছোটগল্পের শিল্পজ্ঞান— দুয়েরই পরিচায়ক। এবং, "একটা কথা মনে রেখো পটল যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোনো অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা"—এই কথার সঙ্গে মিশে থাকা সংযত সুরেলা গলার আওয়াজ চিনতে বাংলাদেশে কারো ভুল হবার কথা নয়।

আমরা এখনো রয়েছি ব্যক্তির বাইরের মাপ ও ভিতরের মাপের ভেদ-অভেদের সম্পর্কে শ্রীরায়ের অভিনিবেশের বৈশিষ্ট্যের এলাকায়। এ হিসাব-নিকাশ শেষ হবে না যদি না আমরা তাঁর পুতুলপ্রীতির উল্লেখ করি। অন্তত তিনটি গল্পের কথা এখনি সবারমনে পড়বে—"ক্রিংস্‌" "ভূতো" আর "প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল"। শ্রীরায়ের একটা বিশেষ মোটিফ যেন এই পুতুল। এই তিনটি গল্পের সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদের মধ্যে সামান্য সূত্র একটাই— পুতুলদের পুতুলত্ব অস্বীকার। পুতুল-নিশ্চেতনার হাত থেকে মুক্তি— এমন কি মৃত প্রমাণিত হয়েও—এটা "ক্রিংস্‌" আর "ভূতো" গল্পের সারাৎসার। "প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল" গল্পে লেখক অসাধারণ সতর্কতায় রূপকের

ফাঁদে পা ফেলার বিপদ থেকে বাঁচলেন— কিন্তু জোরের সঙ্গে সত্যি কথাটা বলে দিলেন— মানুষকে পুতুল বানানোর বিপদ পুতুলকর্তাকেই পোহাতে হবে। "ভূতো" গল্পের শেষটা পড়তে গিয়ে খুবই ক্ষীণভাবে মনে পড়ে বিখ্যাত ইংরাজি গল্প "কেস্ ইন্ দি ওয়াল" – কিন্তু সে স্মৃতি একান্তই গৌণ হয় গল্পটির মূল বক্তব্যের দিকে নজর দিলে। সে কথায় পরে আসছি।

তাঁর ছোটগল্পের পুতুল প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বুঝি বলার আছে। শ্রীরায় যেমন পুতুল নিয়ে ভাবতে ভালবাসেন তেমন দৈত্য নিয়েও ভাবতে ভালবাসেন। নিশ্চয় পাঠকদের মনে পড়বে "বোমযাত্রীর ডায়েরি"র বিধু-শেখরকে, "মরুরহস্য" গল্পের ডিমেট্রিয়াসকে বা "বৃহচ্চঞ্চু" গল্পের পাখিটিকে। এর মধ্যে ডিমেট্রিয়াসের গল্পটি শ্রীরায়ের বক্তব্যের প্রতিনিধি— মাপের বাইরে চলে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। পুতুল গল্পগুলিতে যেমন লং শটে দেখা মানুষকেই দেখা গেল, বৃহচ্চঞ্চু বা ডিমেট্রিয়াসের গল্পে সেই লং শট্ ব্যবহৃত হয়নি। যা মাপের বাইরে চলে যায়, তা জীবন অথবা শিল্প দুয়েরই বাইরে চলে যায়। বিধুশেখর শেষ পর্যন্ত উধাও, "হিপনোজেন" গল্পের ওডিন ও থর এবং তাদের স্রষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বৃহচ্চঞ্চু জঙ্গলে বিলীন, তার ধারালো চঞ্চুর কাজ ফুরিয়ে গেল, ডিমেট্রিয়াসের গবেষণার করুণ সমাপ্তি হল— পুতুল আর দৈত্য মিলিয়ে দেখলে এবার একটা কথার কাছে এসে আমরা দাঁড়াই। পুতুলের বেলায় তিনি বলছেন প্রাণের প্রতিবিম্ব সর্বত্র, দৈত্যের বেলায় তিনি কতকটা যেন বলছেন প্রাণের সঙ্গে কোনো গুণিতক চিহ্ন যোগ করা নিয়মের বাইরে যাওয়া— তা যেয়ো না। তিনি প্রাণের প্রতিবিম্ব খোঁজেন কায়াছায়ার যোগাযোগ মিলিয়ে— খুঁজতে কতটা ভালবাসেন তার পরিচয় "সদানন্দের খুদে জগৎ" গল্পটি। সদানন্দের কাছে পিঁপড়েরা মানুষের ছবি নয় শুধু, ক্ষুদ্রকায় মানুষ। গল্পটা একটা রুগ্ন ছেলের বিমর্ষ গল্প হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সত্যজিৎ তাঁর নিজের দিক থেকে বিষয়টিকে ধরেছেন— রোগশয্যায় বিচ্ছিন্ন ছেলেটি হার মানেনি। সে তার নিজের জগৎপরিমণ্ডল খুঁজে নিয়েছে। ছোট মাপের একটা দর্পণে সে প্রতিফলিত হতে দেখেছে তার অভিজ্ঞতার জগৎ সে শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয়নি, সে সেই জগতের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতেও চেয়েছে। এখানে শ্রীরায় বাংলাদেশের এক নামকরা সাহিত্য-ভবনের— উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদারের ঐতিহ্যবাহী। এঁরা চার জনেই একটা ব্যাপারে গভীর বিশ্বাসী— ছোট্ট প্রাণের অপরাজেয়তা।

আগেই বলেছি লেখাগুলির ভিতরে একটা আলাদা আভা ছড়ায় লেখকটির ব্যক্তিস্বভাব। আশ্বিন মাসে সাড়ে পাঁচটায় সন্ধ্যা হয় কিনা— একথা যিনি জানেন, তিনি ভূত-সন্ধানী অনাথবাবু অবশ্যই— কিন্তু আকাশের আলোর খোঁজ যাকে নিয়ত রাখতে হয় সেই সত্যজিৎবাবুও বটে। আর পাঁচজন বাঙালিকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন আশ্বিন মাসে কটায় সন্ধ্যা হয়, পাঁচ দুগুণে দশ রকম উত্তর পাবেন। "রতনবাবু আর সেই লোকটা" গল্পে রতনবাবু বেড়াতে গিয়ে যে-সব ব্যাপার খুঁজে পান, 'অন্যদের চোখে হয়ত এসব জিনিস খুবই সামান্য— যেমন রাজাভাতখাওয়ার একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ— যেটা একটা কুল গাছ আর একটা নারকেল গাছকে পাকিয়ে উঠেছে, মহেশগঞ্জে একটা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ, ময়নাতে একটা মিষ্টির দোকানের ডালের বরফি।' এই দেখার ক্ষমতা অবশ্য সত্যজিৎবাবুর। যেখানে সচরাচরের চোখ পৌঁছয় না সেখানে যে তাঁর চোখ পৌঁছয় সে তো আমরা জানিই। সসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে যায়, অনুমান করতে ভাল লাগে যে তাঁরও হয়ত ভাত আর হাতরুটি একসঙ্গে খেতে ভাল লাগে— মাছের ঝোলের সঙ্গে ভাত আর, ডাল তরকারির সঙ্গে রুটি (রতনবাবুর এটাই ছিল রেয়াজ)। জগন্নাথের দোকানের লুচি আর ছোলার ডাল তাঁকেও হয়তো টানে। ছোলার ডালের আগে 'মিষ্টি' বিশেষণ বসাতে তিনি ভুলে গেছেন মাত্র এই কারণে যে, দোকানটার নামই তো 'মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। ফেলুদার মধ্যাহ্ন ভোজে মুগের ডাল, মাছের ঝাল, চাটনি— এই খাঁটি বাঙালি খানা বোধ হয় তাঁরও পক্ষপাত ধন্য। "অতিথি" গল্পের ভদ্রলোকটির মতোই খাওয়া পরা নিয়ে তাঁরও কোনো 'ফাস্' করার অভ্যাস নেই। মাছ ডিম তাঁর কাছেও হয়তো বিরোধীবস্তু নয়— শেষে তো দই-এর প্লেট থাকবেই। শুধু অনুমান করতে ভাল লাগে আর পাঁচজন বাঙালির মতো সারা দিনের কাজকর্মের শেষে ডিনারটাই তাঁরও প্রিয় খাবার সময়। কাজের মানুষের পক্ষে খাওয়ার সময় খুব বেশি মেলে না।

উপকরণ বাহুল্য তো কর্মের প্রতিবন্ধক। তখন রসনার দাবি উপেক্ষণীয়। তাই প্রোফেসর শঙ্কু তাঁর বিচিত্র উদ্ভাবনী প্রতিভায় সবটাই একটি সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথিক বিন্দুতে সংহত করে নেন— বটিকা ইণ্ডিকো। এটা আর কিছু নয় কর্মময় সত্যজিতের ইচ্ছাপূরণ— এরকম একটা হোমিওপ্যাথিক গুলি হলে কাজের কত সুবিধা হয়! আমাদের বিজ্ঞানীদের স্বদেশ কৌতূহলী হওয়া আবশ্যিক। তাই বুঝি বটিকাইণ্ডিকার মৌল উপাদান বট ফলের

রস। শঙ্কুর ব্যোম যাত্রায় রকেটের উপাদান ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা। এই অতিপ্রাকৃত বস্তুনিয়ে যে গুলি হাতে করে আমরা সচরাচর দেখিনি, তার সঙ্গে পিতার জন্যে নাম শুনিনি ট্যানট্রাস বা একুইয়স ভেলো সিলিকা দ্রুত মিশলে যে বিজ্ঞানের রাজ্যে নয়, কল্পনার রাজ্যে অনটন ঘটে যেতে পারে— অতিকল্পনায় উপর বাঙালি পাঠকের সেই বিশ্বাসকে শঙ্কুর স্রষ্টাও ভালবাসেন।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, "প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য" গল্পে ছুশো সাতাত্তরটা ব্যারাম সারে এরকম একটি শঙ্কু-উদ্ভাবিত ট্যাবলেটের নাম রয়েছে এ্যানাইহিলিন। নামটা শঙ্কুর কাছেই আমরা যেন শুনেছিলাম মিরাকিউরল। এ্যানাইহিলিন সবচে অস্ত্রটার নাম নয়?'

এই ভাবে জানতে জানতে চিনতে চিনতে দু একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। আমি সত্যজিৎব.বুর খুব কম গল্পে পারিবারিক পটভূমি ব্যবহৃত হতে দেখেছি, কেন? লীলা মজুমদারের গল্পে যেমন চরিত্র পাত্রটি সুনির্দিষ্ট পারিবারিক পথে সুপরিচিত সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত, সত্যজিৎবাবুর গল্পে তা পাই না— পেলেও খুব কম। প্রোফেসর শঙ্কুর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, প্রাইভেট ইনভেস্টি-গেটর ফেলুদা না হয় দুনিয়ার তাবৎ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরদের টাইপে বিশুদ্ধ, কিন্তু তাঁর তিন ডজন গল্পের মধ্যে বাঙালি সংসারের সবচিন্ ছবি ক'বার দেখেছি— ভাবতে হয়, খুব ভাবতে হয়। গল্পের মানুষগুলি— প্রধান চরিত্রগুলিকে একলা অবস্থায় ধরতেই যেন লেখক অধিক পছন্দ করেন। স্বল্প পরিচিত যে সব স্টেশন ছড়িয়ে আছে টাইম টেবিলের পাতায় তাদেরই এক জায়গায়, গোপালপুর সৈকতে, অফ সীজন-এ দার্জিলিঙে জনবিরল পথে, বা ট্রেনের উঁচু শ্রেণীর কামরায় লম্বা পাড়ির সময়েই তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। রতনবাবুর সঙ্গে আলাপ কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ায় হতে পারে না, বাতিকবাবুকে খুঁজে পাই না। নৈহাটি, ইছাপুরে, ক্লিৎসকে পুনরুদ্ধারের জন্য সুদূর রাজস্থানের বুন্দি অবধি যেতে হবে। আমরা তাতে অসম্মত নই। বরঞ্চ এ কথাই বলবো যে এর একটা আলাদা মেজাজ আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন পটভূমির ভূগোল নিয়ে নয়— আমার প্রশ্ন পটভূমির বিজনতায়। এমন কি কলকাতায় বিপিন চৌধুরীও একেবারে একলা মানুষ। "সহদেব বাবুর প্রোট্রেট" গল্পে সহদেব বাবু বা "অসমঞ্জবাবুর কুকুর" গল্পের অসমঞ্জবাবুও একলা— একেবারেই একলা। বদনবাবু যিনি কলকাতাতেই টেরোড্যাকটিলের ডিম পেয়ে যাচ্ছিলেন তিনি অতীব স্নেহশীল বাবা বটেই, কিন্তু সেই স্নেহ—

সম্পর্ক নিয়ে এ গল্প নয়। ব্যক্তি পাত্রগুলির জীবনের পারিবারিক বা হৃদয়-ঘটিত কোনো সম্পর্ক-রস তাঁর গল্পে সাধারণত আসে না। হয়তো এর ভিতর দিয়েও তাঁর মনের একদিকের ছবি রেখায়িত হয়ে ওঠে। আজকের সম্পর্ক-গুলি নানা জটিলতার মোকাবেলা করে অহরহ। সে আঁকাবাঁকা জটিল রেখার ছায়া পড়ে তাদের গায়ে। ফিল্ম স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় তো সে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন বারে বারে। সম্পর্কের গড়াভাঙা নিয়ে সেলুলয়েডে তিনি অনেক কথা বলছেন, বলবেন। ছোট গল্পে তিনি খুঁজে নেন মনের মুক্তির আরেক দিগন্ত— সম্পর্কের জটিলতা নয়, ব্যক্তি পাত্র সংক্রান্ত বিস্ময়টা সেখানে বড়ো কথা। তিনি ছোট ছেলেদের জন্ত গল্প লেখেন না— গল্প লেখেন নিজের জন্ত। ছোট ছেলের জগৎ তাঁর বিষয়— যেখানে বিস্ময় আর বিশ্বাস আর কল্পনা এই ভঙ্গুর জটিল বয়স্ক জীবনে একটা আলাদা আলো ছড়ায়। কতখানি সে আলো ঐ গল্পগুলি ছড়ায়, আর সেই সঙ্গেই তিনি ছোট ছেলেদের কতটা বিশ্বাস করেন, পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ সেই বিশ্বাস আজ সময়ের অনিবার্য হস্তক্ষেপে তাঁর কাছে কতটা নৈতিক প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে. তার প্রমাণ হিসাবে দুটি গল্পের উল্লেখ করবো— "পিন্টুর দাদু" আর "অতিথি"। প্রথমোক্তগল্পটিতে পিন্টুর জগতে দাদুর প্রবেশের মূল্য প্রধান কথা। দ্বিতীয়োক্ত গল্পটিতে দাদুর কাছে মণ্টুর মূল্যের তাৎপর্য প্রধান কথা। ওর মনটা এখনো কাঁচা, ওতেই ছাপটা পড়বে ভালো— দাদুর একথা মণ্টুদের সমাজে শ্রীরায়েরও বিশ্বাস। "অতিথি" গল্পটিতে আজকের আত্মরক্ষাসর্বস্ব, স্বকেন্দ্রিক, তাই সন্দিগ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন চর্চার মাঝখানে একটি ছোটছেলের বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল, বিশ্বাস করার ক্ষমতার বলিষ্ঠ পরিচয় ফুটে ওঠে। তাঁর একটা প্রধান ভালবাসার জায়গা এটা। ফটিকচাঁদ যে অসামান্ত সৃষ্টি তার কারণ ফটিকচাঁদের বিশুদ্ধ জীবনাগ্রহ। এটা তাঁর নিজের ব্যাপারও বটে।

কিন্তু তাহলেও, একথা সত্যি, গায়ে পড়া আলাপী তিনি পছন্দ করেন না। প্রোফেসর শঙ্কুর প্রতিবেশী অবিনাশবাবুরাই হয়তো তাঁর এ ব্যাপারে হেতু। স্তিমিত-কল্পনা, নিস্তাপ, প্রশ্নহীনতা আর ছকা রসিকতা অবিনাশবাবুদের পরিচয়চিহ্ন! এঁরা অপরের কর্মনাশাও বটে। এঁর মূল্যের খেতে শঙ্কুর রকেট গোঁৎ খেয়ে পড়ায় শঙ্কু ক্ষুব্ধ হয়েছিল রকেটের জন্ত, মূলোর জন্ত নয়— সাব্-লাইম এখানে রিডিক্যুলাস হয়েছে শঙ্কুর অজান্তে। তবে অবিনাশবাবু মনে রাখবেন নিশ্চয় যে এহেন তাঁকেও শঙ্কু আফ্রিকা নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরায় যেন বলছেন— কি আর করা যাবে, সহ্যই করতে হবে এঁদের। ফেলুদা

অবিনাশবাবু কি মাথার বড়ো শঙ্কর কোনো কাজেই লাগে না— জটায়ু ভুল লিখলে আর বললেও মাথায় বড়ো ফেলু মিত্তিরকে কি কোনো সাহায্যই করেনি। লক্ষ করি তাঁর কোনো গল্পই অপরে বলছে না— অন্তত এতদিন বলেনি। অর্থাৎ আড্ডায় বলা গল্পের রীতি প্রকরণ তাঁকে টানে না তেমন। আরো একটা জিজ্ঞাসা জাগে যিনি 'মহাপুরুষ' ফিল্ম করেন, তিনি কেন ইমলি বাবা সৃষ্টি করেন, কেন লেখেন ভূতের গল্প। আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করছি না "খগম" বা "অনাথবাবুর ভয়" প্রভৃতি গল্পের অতিপ্রাকৃত রসে, কিন্তু প্রশ্নটা জাগে 'কেন'। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তরটা বোধ হয় আপনিই এসে যায়— তাঁর আগ্রহ রসে। ভূত আছে কিনা ও জিজ্ঞাসা নিরর্থক— ভূতের রস আছে। আর কৌতূহল তাঁর তো অনন্ত— প্রাচীন মিশর, তার দেবতত্ত্ব, আদিম আফ্রিকা, পুরাতন কলকাতা, প্রাণীজগতের আদি বিবর্তনের পাণ্ডুরতম অধ্যায়, মহাকাশ, মেরু, মরু, ব্রেজিলের জঙ্গল,— তাঁর কৌতূহলের জালে কখন কোন মাছ ধরা পড়ে কে জানে। তিনি জানেন বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোলের জগতে চলতে চলতে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানের পাঁচিল ভেঙে যায়। ছোট মাপের অবিনাশবাবুরাই সীমাবদ্ধ কৌতূহলের মানুষ। তাঁর ছোট্ট ছোট্ট পাঠক মানুষরা ছোট মানুষ নয়। সে জগতে ম্যাজিক এবং বিজ্ঞান, প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃতের সহাবস্থান বিচিত্রতর। কর্মী সত্যজিতের বিশ্রামের জগৎ সেটা। আরেকটা প্রশ্ন— প্রশ্নটা ঠিক আমার নয়— একটা খুদে পাঠিকার— তাঁর তিন বারোং ছত্রিশটা গল্পে একটাও ছোট মেয়ে নেই; এবং প্রায় নদী নেই, পাহাড় আছে বেশী, জঙ্গল আছে কয়েকবার, মরু আছে, কিন্তু নদী খুব কম— কেন? নদী তবু খুঁজে পেয়েছি রতনবাবুর গল্পে— কিন্তু বাচ্চা মেয়েরা— স্নেহশীল বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে যারা সকৌতুক আগ্রহ সঞ্চার করে। তারা তাঁর লেখায় প্রায় নেই— একেবারেই নেই। সদানন্দের একটা বোন থাকতে পারতো না। কী হত "ভক্ত" গল্পের পাঠকটি পাঠিকা হলে?

যে নিজের কেরিয়ার রচিত হবার পর, সে যে ধরনের কেরিয়ার হোক না কেন, ভুলে যায় তার ইতিহাসের গোড়ার পাতার মানুষদের সে ব্যক্তি শ্রীরায়ের কাছে তিরস্কারের পাত্র। তাঁর একাধিক গল্পে আজকের বিস্মৃতিপরায়ণ কিন্তু কীর্তিঅভিমানী মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি প্রধান কথা হয়ে উঠেছে। "ভূতো" গল্পের নবীন অক্রূর চৌধুরীকে অসম্মান করেছিল। অক্রূর তার সাজা দিলেন। কিন্তু বিশেষ করে উল্লেখ করতে পারি "বিপিন চৌধুরীর স্মৃতি ভ্রম" "দুই

ম্যাজিশিয়ান" "সহদেববাবুর পোর্ট্রেট" এমন কি "মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি" যিনি বঙ্কুবাবুর বেলায় অ্যাং মশাইয়ের গলায় বঙ্কুবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে, নিরীহতার আতিশয্য বিসর্জন দিতে, তিনিই চুনিলালের চিঠি মারফৎ বিপিনবাবুকে শেখালেন 'হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কুফল'। একজন দুঃস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দিতে পারা বিপিন চৌধুরীর পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তার চকচকে সফল, আত্মনিমগ্ন জীবনযাত্রায় বাল্যবন্ধু একটা দুঃস্মৃতি মাত্র। তাই তার স্মৃতিভ্রংশের শাস্তি। সহদেববাবুর অবস্থাটাও তাই। আগে যারা খুব কাছের লোক ছিল, তারা এখন তাঁকে দেখলে চট করে চিনতে পারে না, বা চিনলেও সাহস করে এগিয়ে এসে কথা বলে না। সহদেববাবুরও খুব ইচ্ছে নেই যে তারা তাঁকে চেনে। সহদেববাবুকে শাস্তি পেতেই হল। সুরপতি গুরুকেই ভুলে যেতে বসেছিল— তবু যে শাস্তি তার হল না, সে বরঞ্চ পুরস্কৃতই হল সে শুধু ভুল শুধরে নিয়েছিল বলে। মিঃ শাসমলের অপরাধ গুরুতর, তাই তাঁর শাস্তিও গুরুতর। কীভাবে বাঁচতে হয়, কীভাবে বিনয়ে ও নম্রতায় জীবনকে গ্রহণ করতে হয় শ্রীরায়ের এসব গল্পগুলির ভিতর দিয়ে তারই হদিস মেলে। সাফল্য অর্জনীয়: বর্জনীয় সাফল্যের তালিকায় হেলান দিয়ে নিজেরই অতীতকে অস্বীকার— যা একদা নিজের সত্তার অংশ ছিল, তাকে উপেক্ষা। এসব গল্প থেকে বোঝা যায়, তিনি উদ্বিগ্ন আজকের প্রতিযোগিতাপরায়ণ সাফল্যমৃগয়াবীরদের ব্যবহারে। তার উদ্বিগ্নতার আরেকটা দিককেও চেনা যায় এক ধরনের গল্পে। "আশ্চর্য প্রাণী" গল্পে মানুষের যে সাধনা অভিমানবিকল্পকে আয়ত্ত করতে চাইছে সে সাধনার পরিণতি কল্পনা করা হয়েছে—'যে অবস্থায় মানুষের উত্তর পুরুষ একটা মাংসপিণ্ডের মতো মাটিতে পড়ে থাকবে, তার হাত থাকবে না, চলবার, কাজ করবার, চিন্তা করবার শক্তি থাকবে না, কেবল দুটি প্রকাণ্ড চোখ দিয়ে সে পৃথিবীর শেষ অবস্থাটা ক্লান্তভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবে' এই ভবিষ্যৎ বিভীষিকার সামনে দিশাহারা শঙ্কু বিহ্বল রায়েরই ছবি। তবে সে অনেক দূরের কথা।

আপাতত তিনি যে ধরনের মানুষ, তিনি বাঙালি হয়েও বিশ্ব নাগরিক। এই প্রযুক্তি পারঙ্গম বিশ্বে ভূমণ্ডল অনেক ছোট হয়ে গেছে— সুতরাং তাঁর প্রধান নায়ক ফেলু এবং শঙ্কু দুজনেই ভ্রমণরসে সজীব। শঙ্কুর পৃথিবী— ফেলুর ভারতবর্ষ— দুয়ে মিলে একজন। শঙ্কুর 'অমনিস্কোপ' যেমন অবারিত ফেলুর বুদ্ধির স্কোপও তেমনি অগাধ। একজন খাঁটি বাঙালি— একালের বাঙালি—

তাই কর্ট্যুর মামা বলেন, 'বাপের বাড়ির মায়া একবার কাটাতে পারলে সারা পৃথিবীটাই হয়ে যায় নিজের ঘর। সাদা কালো ছোট বড় জংলী সভ্য সব এক হয়ে যায়'। অথচ এই বিশ্বগ্রাহী কৌতূহলের মাঝখানেও ভুলে যেতে দিতে চান না কাউকে তাদের নিজের নিজের উৎস ভূমিকে, ছোটবেলার বন্ধুদের — "হ্যাসক্রেও" আর "চিলে কোঠা" গল্প তার প্রমাণ।

রায় চৌধুরী পরিবারের বিচিত্র উজ্জ্বল পরিবেশে বিমর্ষ নিঃসঙ্গতার কোনো অবকাশ ছিল না। পুণ্যলতার লেখা থেকে অথবা সত্যজিৎ রায়ের 'যখন ছোট ছিলাম' থেকে ভালভাবেই অনুমান করা যায় দুঃখ বা বেদনার কালো ছায়া এ পরিবারের প্রবল প্রাণশক্তির কাছে সহজে হার মানত। প্রাণের প্রবলতায় দুটি মুখ এক, সে কল্পনা করতে ভয় খায় না, দুই কৌতুকের ঝিকিমিকি প্রাণ-স্রোতে সদাই খেলা করে। উপেন্দ্রকিশোরের জমজমাট পরিবারে বিত্ত থেকে চিত্ত ছিল অনেক বেশি— জীবন সেখানে স্রোতের মতো প্রাণবন্ত বলে কেউ কোথাও আবদ্ধ ছিল না— না কীর্তির অহংকারে, না বয়সের গরিমায়। সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত অহমিকার ক্ষুদ্র 'আমি' সেখানে মাথা চাড়া দিত না বলেই বড় 'আমি'-র আত্মবিকাশের পথ ছিল অনবরুদ্ধ। 'যখন ছোট ছিলাম' অথবা পুণ্যলতার লেখা থেকে আমরা এই পরিবারের অনর্গল প্রাণময় মেশামেশির অবিরল সাক্ষ্য পাই। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার এই প্রধান দুই রায় শিশুর অমলিন অন্তরঙ্গ জগতে তাঁদের মননকর্ম নিবেদন করেছিলেন। পারিবারিক ব্যবহারিক জীবনেও তার বিপরীতাচরণ ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসু শিশুকে থামিয়ে দেবার কুমন্ত্রণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রেলগাড়ির বিস্মিত সহযাত্রী দেখেছিলেন কীভাবে তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে মনের অবাধ সেতুবন্ধন রচনা করেন। সুকুমার রায় তাঁর অদ্ভুত মনগড়া জন্তুজানোয়ারদের প্রথম রচনা করেছেন ছোট ভাইবোনদের খুশি করতে গিয়ে। আজকে সময়ের দিক থেকে এত তফাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটির একটা অন্য তাৎপর্যও চোখে পড়ে। পরাধীন ভারতে, অষ্টাবক্র সমাজে, নানা বন্ধনে জর্জর অস্তিত্বের তাড়নায় যে আবেগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে গিয়েছিলেন প্রকৃতির কাছে, তারই সঙ্গে বুঝি তুলনীয় পুরোগামী রায়দের শিশুর জগতে ঘুরে বেড়ানো। শিশুর নিশ্চিতি, শিশুর অকৃত্রিমতা, বন্ধনবিমুক্ততা, অবাধ কল্পনার দুঃসাহস, ছকবাঁধা ব্যাপারে অরুচি— আমাদের স্বাধীনতাস্পৃহারই অন্য রূপক। ঠিক এমনভাবে তাঁরা কেউ কথাটি বলেন নি। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট জগতের বিচিত্র অবাধ প্রান্তরে মুক্তি নিতে নিতে আজও এই কথাটি এমন করেই আমাদের মনে হয়। এই

কথাটি এমন করে নয়, কিন্তু অন্তরকমে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের গল্প পড়তে পড়তেও। সেখানে আমরা যে সব চরিত্রের দেখা পাই তারা আমাদের বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। কিন্তু জীবনের বিশালতা সম্বন্ধে কল্পনায় সাহস তাদের অনেকেরই উপাদানে ব্যবহৃত। আমাদের খণ্ডিত অস্তিত্বের সমস্যাসংকুল জগতটা সেখানে মাথা চাড়া দেয় না। তার বদলে পাই মহাকাশের সংকেত, অতল সমুদ্রের ডাক. মরু বা মেরুর ইশারা অথবা মানুষের, একান্তই ছাপোষা সাধারণ মানুষের অশেষত্বের ঠিকানা। প্রযুক্তি পারঙ্গম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে মানুষের গল্প তিনি শোনান সে মানুষ গাণিতিক সিদ্ধির জগতে গণিতের অতীত মানুষ। সুতরাং রায়চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্যপটেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত পাত্র। এই গল্পগুলির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

রায়চৌধুরী পরিবারের কীর্তিমান ঐতিহ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সত্যজিৎ রায় তাঁর ক্ষেত্রে নির্বাচন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের লক্ষ্য ছিল সব শিশুরা যারা সবে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে, ডিঙিয়েছে বর্ণ-পরিচয়ের বেড়া। টুনটুনির বই যেন তাদের গলার আওয়াজ আর বাক্য-বন্ধের প্রতিধ্বনিতে নির্মিত। সুখলতা রাওয়ের গল্পও তাই। সবে যারা বাক্য গড়তে শিখেছে তাদের মাপ অনুযায়ীই যেন সে গল্পের জগৎ গড়া। পক্ষান্তরে সুকুমার রায়ের গল্প যাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তারা আর একটু বড়— আজকের ভাষায় ক্লাস সিক্স সেভেন স্টাণ্ডার্ডের ছেলে তারা। তারা নির্দোষ দুর্বুদ্ধিতা, নিছক নির্বুদ্ধিতা, গুল দেবার কল্পনাশক্তি, মজা করার দামাল অভিপ্রায়এ সব নিয়ে গড়ে উঠেছে সুকুমার রায়ের গল্প। সে প্রধানাংশে স্কুল স্টোরি। বাংলা শিশু সাহিত্যে নতুন সামগ্রী। সুকুমার রায়ের কল্পনা ও অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভব হয়েছে পাগলা দাশুর মতো চিরস্থায়ী চরিত্র। তার পাগলামির মধ্যে একটা মেথড ছিল। সে জন্যই সে পাগলামি গভীরতর বাস্তব তাৎপর্যের ঠিকানা দিতে পারে— 'যাও সবে নিজ নিজ কাজে'— আজও আমাদের কাছে বহু আড়ম্বরপূর্ণ অভিপ্রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ যবনিকাসম্পাতী বাচন। পাগলা দাশুকে স্কুল স্টোরির পটভূমি ছাড়া ভাবাই যায় না।

সত্যজিৎ রায় কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। প্রথমেই লক্ষ করি তিনি সুকুমার রায় বা লীলা মজুমদারের মতো একটিও স্কুল স্টোরি লিখলেন না। দ্বিতীয় লক্ষণীয়, তাঁর গল্পে ছোট ছেলে বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা অনুপাতে কম। "সদানন্দের খুদে জগৎ" "পিন্টুর দাদু" বা, "অতিথি" গল্পের

মতো ছোটছেলেরই গল্প তাঁর খুব বেশী নেই। এর মধ্যে "সদানন্দের খুদে জগৎ" ছোটরা কতখানি ধরতে পারবে জানি না, গল্পটির মধ্যে ছোটছেলের নৈতিক জগতের টেন্‌শন্‌ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও বালকভোগ্য নয়। তবু ছোট ছেলের মনোজগতের এমন প্রতিচ্ছবি দুর্লভ। তৃতীয় লক্ষণীয়—এবং এটাই তাঁর গল্পের আসল কথা—সে সব গল্প ছোটদের গল্প এই অর্থে যে ছোটরা বড়দের বিষয়ে যে সব গল্প শুনতে চায় এগুলো সেই জাতীয় গল্প। তার মানে এই নয় যে, বড়দের জীবনের সতর্ক নির্বাচিত অংশ নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। সেই সতর্কতা থাকলে শিল্প হিসাবে গল্পগুলি মাটি হ'ত। বলবার কথাটা এই, তিনি বড়দের চরিত্র পাত্র করে গল্প লিখলেও সেগুলো অন্যদের মতো মজার গল্প নয়, কেবল এ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নয়। তাঁর পৃথক কৃতিত্ব ছোটদের জন্য বড় বয়সীদের গল্প বলতে বসে সকলকে গল্প শোনানো। অথচ এ গল্প একদিকের বিচারে ছোটদেরই গল্প। যে পাঠকরা তাঁর মূল লক্ষ্য তাদের জীবনসম্বন্ধীয় নিজস্ব এ্যাটিচ্যুডকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করে এসব গল্প লেখা। সুকুমার রায়ের গল্পবিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর চমৎকার মন্তব্যটি আমরা মনে রাখি—'সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ পাওয়া; সে উপদেশ সেই জাতের, যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞচিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে।' এই জন্যই তাদের উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না; তাদের বয়সোচিত নানারকম ছলচাতুরী, বোকামি ও দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃষ্টান্তে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; সত্যজিৎ রায়ের গল্পে বাইরে থেকে ভিতর থেকে কোথাও থেকেই কোনো উপদেশ নেই। বড় ছোট নির্বিশেষে সেখানে একবয়সী হয়ে যায়, সেই আসরে সত্যজিৎ রায় এমন গল্প বলেন, যার যদি কিছু জানাবার কথা থাকে তা হল—বিশ্বাস করো জগৎকে আর জীবনকে।

জগতের বেলায় বিশ্বাস করো অসীম রহস্যে ভরা আ-মর্ত্য-নীহারিকা। জীবনের বেলায় বিশ্বাস করো—এর স্বীকৃত নৈতিক নর্ম্‌ ভেঙে দেওয়া ঠিক নয়। ভূগোল বা মহাকাশ-বিশারদের মতো বা নীতিবেত্তার মতো তিনি এ কথা বলেন না কিন্তু। সর্বপ্রথমে সেগুলি গল্প, সবশেষেও সেগুলি গল্প। সুকুমার রায়ের বালক চরিত্রগুলির পরবর্তী ক্লাশে উন্নীত রূপ লীলা মজুমদারের কোনো কোনো গল্পে পাওয়া যায়। সুকুমার রায়ের কোনো কোনো চরিত্রের উপভোগ্য নতুন রূপায়ণ দেখা যায় লীলা মজুমদারের চমৎকার কিছু গল্পে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সুকুমার রায়ের জগিদাস কে। আজগুবি গল্প বলার আশ্চর্য

ক্ষমতা ছিল তার। এক হিসাবে এ ক্ষমতা যত হাসির খোরাক যোগান দিক না কেন অন্তার্থে এতো তার কল্পনাশক্তিরই প্রমাণ। লীলা মজুমদারের বিখ্যাত গল্পের হরিনারায়ণ চরিত্র যেন জগিদাসের দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। ছোট ছেলের প্রথম পাওয়া সমাজজীবন তার স্কুলজীবন। জগিদাস ও হরিনারায়ণকে সেই সমাজজীবনেই পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায় সযত্নে তাঁর গল্পে এই সমাজবদ্ধ বালক বা কিশোরকে পাশ কাটিয়েছেন। তাকে নিয়ে কৌতুকগল্প লিখতে গেলে সেই সমাজজীবনের গুরুগম্ভীর নিয়মবদ্ধতার মাঝখানে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোন্ অসঙ্গতি সৃষ্টি করছে সেটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সত্যজিৎ রায় হাসির গল্প বলতে যা বোঝায় তা লেখেন নি বললেই হয়, যদিও তাঁর গল্পে হিউমার প্রচুর। তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র পাত্রদের একাকীত্বের কথা আমি পূর্বে এক রচনায় বলেছি। এখানে এই বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখতে চাই।

'যখন ছোট ছিলাম' এই অসামান্য স্মৃতিকথা নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সে আলোচনার ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু যার স্মৃতিকথা এই বইটি তার নিজস্ব ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের গভীর গহনের একটা চাবিকাঠি এই বইটির প্রারম্ভে লেখক আনমনে আমাদের হাতে তুলে দিলেন। চাবিকাঠিটি সম্পূর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের মর্মশালায় তৈরি— 'সাধারণ অসাধারণ প্রভেদ বড়দের মতো করে ছোটরা করে না, তাই তাদের মেলামেশার কোনো বাছবিচার থাকে না। এ ব্যাপারে গুরুজনের বিচার যে ছোটরা সবসময় বোঝে বা মানে তাও নয়।' এই উক্তিটি রায়চৌধুরী পরিবারের মর্মশালায় প্রস্তুত এ কথা বলার কারণ আর কিছু নয়— কথাটির মধ্যে ছোটছেলের চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের ও প্রথামুক্ত ভাবনা ভাবার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। সেই স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা স্থাপনে রায়চৌধুরী পরিবারের তিন পুরুষের আত্মনিবেদন বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসের সামগ্রী। 'যখন ছোট ছিলাম' বইটি অবশ্যই স্মৃতিকথা। সে স্মৃতিকথায় মেলে শ্রীরায়ের মানসিক গঠনের গোড়াপত্তনের আদিকথা। 'আসলে আমার অনেকটা সময় একাই কাটাতে হ'ত'। এই একাকীত্বকে পূরণ করতে গিয়ে সেদিনের বালককে নিজের জগৎ কিছুটা নিজেকেই নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। জানলার উল্টোদিকের দেওয়ালে বাইরের জগতের ছায়াছবি, দরজার ছোট্ট ফুটোয় ঘষা কাচ ধরে বাইরে দৃশ্য খুদে আকারে দেখা, চারখণ্ডে রোমান্স অফ ফেমাস লাইভস্, স্টিরিওস্কোপ— এই সবই আলোঃ ধরতে চাইছে এমন এক বালকতন্ময় বিচিত্র ভালপালা। এইখানে আমাদের মাথা স্বতঃই নত হয়ে আসে সত্যজিৎ জননী সুপ্রভা দেবীর উদ্দেশ্যে। ‐একান্ত

অসময়ে পিতৃহারা সেই বালকটিকে তিনি অযথা সহানুভূতির ভারে বিব্রত করেন নি। তিনি জানতেন সে বালককে মানুষ করতে গেলে, ছন্দের বন্ধনে থেকেও কবিতা যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে, বালকটিকে তেমনই স্বাধীনতা দিতে হয়। তাই বোধ হয় সত্যজিতের একলা থাকার বেলাটুকুতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। এই বালকের জননীর পক্ষে এই জ্ঞানটুকু খুব জরুরী ছিল, কতটুকু এই বালককে বাঁধতে হবে আর কতখানি ছাড়তে হবে। তার সেই একাকীত্বের কিয়দংশ ভর্তি হত ছেদিলাল আর হরেনের উদ্ভাবন নিপুণ কর্মঠ সখ্যে। চাবিকাঠি, মেটে লণ্ঠন, ঘুড়ি— এগুলো তো সেই একাকী বালকের আনন্দলোক আবিষ্কারের পথে এক একটা কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন। নিজের মতো করে যে বাড়তে পায় নিজের মতো করে সে দেখতে শেখে। রায়চৌধুরী পরিবারের ছড়ানো চৌহদ্দির মধ্যে সে বালক আর একটা কথা বুঝেছিল যে, সেখানকার প্রধান চরিত্রগুলি আপন আপন অভিনব এককত্বে অনন্ত। কেউ তাঁরা বাঁধা চৌখুপিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য জন্মাননি। ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায়, মুগুর ভাঁজতেন, ক্রিকেট মাঠে সেঞ্চুরি হাঁকাতেন, প্রপেলারের মত লাঠি ঘোরাতে পারতেন— অন্য সাক্ষ্য থেকে বলছি ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে পাতিকাক ধরতেন,— কিন্তু আসল মানুষটি শিল্পী। ছোটকাকা সুবিমল রায় প্রতিটি গ্রাস বত্রিশ বার চিবোতেন, চার রকম রঙের কালিতে একটা ছন্দের লজিক ধরে এক একটি বাক্যের শব্দগুলি লিখতেন। কিন্তু আমাদেরই পরিচিত চায়ের যে বারোটি ধরন তিনি লিখে রেখে গেছেন, শুধু তার জোরেই তাকে আমরা যথার্থ প্রতিভা বলতে পারি। এই কাকা-ভাইপোর সকৌতুক স্নেহ শ্রদ্ধার ভিত্তিভূমিটি শ্রীরায়ের পরবর্তী জীবনে নানা গল্পে বিচিত্র রসসঞ্চারী হয়েছে। তোপ্‌সে-ফেলুদা সম্পর্ক, হারুণ-কটিক সম্পর্ক, পিবু-কটিকদা সম্পর্ক এখানে আমাদের মনে পড়ে। লীলা মজুমদারের গল্পের সঙ্গে এখানেও সত্যজিৎ রায়ের গল্পের একটা তফাত দেখা যায়। লীলা মজুমদারের গল্পে বালকটির দরকার হয় একটি শক্তপোক্ত মাঝ-বয়সী দাদার টাইপ। 'পদিপিসির বর্মীবাক্স'র সেই করমিতেব্‌ল্‌ অবিস্মরণীয় দিদিমাটি যেমন। সত্যজিৎ রায়ের কিশোর চরিত্রটি দাদার-টাইপের ধারে কাছে ঘেঁসে না। তার দরকার কল্পনাকে নাড়া দিতে পারে এমন একটি বয়সের বড় যুবক চরিত্র। তার কারণ লীলা মজুমদারের চঞ্চল বালকটির আত্মরক্ষার দরকার। সত্যজিৎ রায়ের উন্মুখ কিশোরটির বিশ্ব রহস্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর জন্য সেতু দরকার।

সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন ব্যক্তির একাকীত্বের তথা অনন্যতার জন্য কোনো বৃহৎ কীর্তির ঠেকনোর দরকার হয় না। ব্যক্তিত্বের অশেষত্ব একান্তভাবেই ব্যক্তির স্বোপার্জিত ব্যাপার। সত্যজিৎ রায়ের পটলবাবু ফিল্ম্ স্টার, বঙ্কুবাবুর বন্ধু প্রভৃতি গল্প তথাকথিত অকিঞ্চিৎকর মানুষের অন্তর্গত অশেষত্বর গল্প। সাধারণের সাদা পোশাকে সংসার তাঁদের ঢেকে রাখলেও— সেটাই এসব গল্পের মূলকথা। ফেলুদা সিরিজের সিধু জ্যাঠা এইরকম লোক। বঙ্কুবাবু আর পটলবাবুর মধ্যে মিলটা লক্ষ করার মতো। জীবন তাদের দুজনের জন্যই ছটো ছোট ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। একজন কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোলের মাস্টার, আরেকজন চাকরি খোয়ানো গেরস্ত মানুষ। কিন্তু শতেক লাঞ্ছনা সহ্য করেও বঙ্কুবাবু নিষ্ঠার সঙ্গে ভূগোল পড়ান। পটলবাবু সত্যি সত্যি অভিনয়-শিল্পী। সিধু জ্যাঠার নাম ধাম ক্রিয়াকর্ম ফেলুদা ছাড়া কেউ জানে না। তিনি জানানোর জন্য ব্যস্তও নন। কিন্তু যেটা তিনি নিজের কাজ বলে ধরে নিয়েছেন সেখানে তিনি একনিষ্ঠ একাগ্র। এই অকৃত্রিমতা এসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাইরের সংসারের নানা ধাক্কায়, নানা লাঞ্ছনায় বঙ্কুবাবু পটলবাবুর মতো মানুষরা ক্লান্ত হয় না শুধু অন্তরের মৃগনাভিটুকু অক্ষুণ্ণ বলে। সংসারের মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত সফল প্রতিবেশীরা তাঁকে মজা ও টিপ্পনীর বিষয় বলে মনে করে— কিন্তু ক্রেনিয়াস গ্রহের উন্নততর প্রাণী অ্যাং াদের উন্নতর যন্ত্রে যখ ফেরতা বঙ্কুবাবুকেই তাঁদের যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে যান, নর্থ পোলের অন্তহীন বরফের মরুভূমি, অরোরা বেরিয়ালিস, হিপ্পোপটামাস, পেঙ্গুইন। দেখিয়ে যান ব্রেজিলের জটিল অরণ্যের অসূর্যম্পশ্য ভীষণতার মধ্যে অ্যানাকণ্ডা সাপ, পিরানহা মাছের বিভীষিকা। এই অতি অকিঞ্চিৎকর ভূগোলের মাস্টারের জীবনে যে বিশ্ব-ব্যাকুলতা লুকিয়ে আছে তার এক আশ্চর্য পরিচয় এই অংশটি। তার অস্তিত্বের দীনতা ঘুচে গেল— বিশাল পৃথিবীর ও পৃথিবীরও ওপারের মহাকাশের সংস্পর্শে। আমরা বেশ অনুমান করতে পারি পরের দিন কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলে ভূগোলের ক্লাশের মেধাবী আগ্রহী ছাত্রটির কাছে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে এই শিক্ষক ধন্য হবে। পটলবাবুর গল্পটির পরিসমাপ্তিতে পটলবাবুর উপলব্ধিটি বড় কথা। আর্থিক প্রাপ্তির জন্য তাঁর আর অপেক্ষা করার দরকার হল না— কেননা অভিনয় শিল্পের মূল রহস্যের অসীমতা তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। শিল্পী জানে সব পাওয়ার বড় পাওয়া এটাই। হয়তো নিঃসন্দিগ্ধ এ অনুমান— তথাপি ভাবতে ইচ্ছে হয়, পথের পাঁচালীর দুর্গন্ধ্য অর্থাভাবের

দিনে অর্ধসমাপ্ত ছবিটির শিল্পবস্তুর দিকে তাকিয়ে তার স্রষ্টাও কোনোদিন ভেবেছিলেন— আমি তো জেনেছি আমার বলা কী রকম হবে।

কিন্তু এ প্রশ্নটা সত্যজিৎবাবুর গল্প পড়তে পড়তে ক্রমশই অনিবার্য হয়ে ওঠে— ঠিক ছোট ছেলেদের জন্য লেখা কোন গল্পগুলি ? বাইরের দিক থেকে তার একটা মীমাংসা বোধ হয় আমরা করতে পারি। যে গল্পগুলি রায়চৌধুরী পরিবারের ধারাধরনের আত্মীয় সেগুলিই নিছক বালকভোগ্য গল্প। যেমন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর প্রথম ডায়েরিটি পড়তে গিয়ে আনমনে একবার ভাবতে হবেই হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি। অন্তত একবারও মনে হবেই দুই আবিষ্কারকের অভিযানের দুঃসাহসের মিল, অজ্ঞাতপূর্বকে আবিষ্কারের পর লাগসই নামকরণের দক্ষতা। হেশোরাম হুঁশিয়ারের হাস্যকরতা বাদ দিলে শঙ্কুর প্রাথমিক উপাদান নজরে পড়ে। প্রোফেসর শঙ্কুর গবেষণাগারের উপাদানগুলির প্রসঙ্গেও সুকুমার রায়ের প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলের গবেষণাগারের বিচিত্র উপাদানগুলির কথা মনে পড়বে। প্রোফেসার পাটকেলের গোলার মধ্যে ছিল বিছুটির আরক, লঙ্কার ধোঁয়া, ছারপোকার আতর, গাঁদালের রস, পচা মূলোর এক্সট্র্যাক্ট। প্রোফেসর শঙ্কুর রকেটের উপাদানে ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা তার সঙ্গে একুইয়স ভেলোসিলিকা। তবে শঙ্কু অতি দ্রুত এই প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। প্রহ্লাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল শঙ্কু কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বঙ্কুবাবু নন। বঙ্কুবাবুর দীন সহিষ্ণুতা তাঁর মধ্যে মিলবে না। তিনি আত্মপ্রত্যয়ী বৈজ্ঞানিক। অনেক কীর্তির অধিকারী। তাঁর আবিষ্কৃত মিরাকিউরল ম্যাঙ্গোরেঞ্জ, এ্যানাইহিলিন, অরনিথন্, রিমেমব্রেন, অম্নিস্কোপ, বটিকা ইণ্ডিকা, অম্নিস্কোপ, স্নাফগান, মাইক্রোসোনোগ্রাফ ক্যামেরাপিড, সমনোলিন, লিঙ্গুয়াগ্রাফরোবু প্রভৃতি ঔষধ. যন্ত্র, অস্ত্র ও গ্যাজেট সরলার্থে বিস্ময়কর। তাঁকে আমরা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে সসম্মানে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াতে দেখি। কিন্তু তিনি খাঁটি বাঙালি। অবিনাশবাবুর মতো একান্ত এ্যাভারেজ প্রতিবেশীকে তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেন সকৌতুকে। কোনো খাঁটি বাঙালি টাকাওয়ালা লোকের টাকার দম্ভ সহ্য করতে পারে না— শঙ্কুও পারে না। খাঁটি বাঙালির বসুধৈব কুটুম্বকম্। সাহেব দেখলে সে মাথা হারায় না। শঙ্কুরও উত্তরস্বাধীনতা ভারতীয়ের বিশ্বনাগরিকত্ব বোধ প্রখর। এ সবই আমরা বড়রা বিশেষভাবে উপভোগ করি। মাপের বাইরে চলে যাওয়া— প্রযুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গম বিশ্বের প্রতি

এটাই শঙ্কুর বাণী। ভিবিট্রিয়াসের গল্প, আশ্চর্য পুতুলের গল্প সেকথাই বলছে। তবে এসব সত্ত্বেও শঙ্কুর গল্প বিশেষ করে কিশোরভোগ্য গল্প। সে সব গল্পের প্রথম দিকের দুটি তিনটি বাদ দিলে সব গল্পেরই ঘটনাস্থল সুদূর বিদেশ। ভ্রমণরসের সঙ্গে রহস্যরস মিশিয়ে তার সঙ্গে যথোপযুক্ত এ্যাডভেঞ্চার রস জুড়ে দিলে কী জিনিস দাঁড়ায় স্বদেশের পটে তার নিদর্শন ফেলুদার কাহিনী, বিদেশের পটে তার নিদর্শন প্রোফেসর শঙ্কু। দুটোই দুই অর্থে আবিষ্কারের কাহিনী।

কিন্তু শঙ্কুর গল্প এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এমন সব গভীর প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সম্মুখীন হয়েছে যা বয়স্ক মানুষের প্রশ্ন। "কম্পু" গল্পটির কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ইলেকট্রনিক্‌স্‌-এর সম্ভাবিত শেষ কীর্তি সেই ক্ষুদ্রকায় গোলকটির নাম কম্পু। সে সব প্রশ্নের উত্তর জানে। জানতে জানতে সে মানবিক জ্ঞানের সীমানা পেরিয়ে গেল, হয়ে উঠল অন্তর্যামী, হয়ে উঠল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। পরিশেষে সে তার প্রদত্ত দেহত্যাগের আগে সব থেকে চূড়ান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। "কম্পু" আমার মতে শঙ্কু সিরিজের শিখরী গল্প। কম্পু যেন প্রাচীন সর্বজ্ঞ ভারতীয় ঋষির কম্পুটর প্রতীক। সেই প্রাচীন ঋষির মতোই সে জানতে জানতে জেনেছে জানার শেষ নেই— কিন্তু সে থামে নি। ঋষির মতোই সেও নিজের জন্য কিছু চায় না। কিন্তু মানুষকে দিতে চায় তার জ্ঞানের ফল। জাপানকে সে বলে দিয়ে গেল প্রাকৃতিক পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার কৌশল। তারপর প্রাচীন নচিকেতার মতো সব শেষে উচ্চারণ করেছে তার শেষ পরম প্রশ্নের নিজস্ব উত্তর পাবার সংবাদ। এ গল্প ঠিক বালকভোগ্য গল্প নয়— না হয়ে ভালই হয়েছে। এরকম দৃষ্টান্ত অবশ্য সংখ্যায় বেশি নয়। রায়চৌধুরী পরিবারের শিশু সাহিত্যের মূল উৎসটি তিনি আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন "প্রোফেসর হিজিবিজবিজ" গল্পে। আমার কিন্তু গল্পটিতে 'হ-য-ব-র-ল' বা 'আবোলতাবোল'কে ছাপিয়ে মনে পড়ে ওয়েলস-এর 'আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো'। মোরোর ট্র্যাজিক গবেষণার সঙ্গে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌-এর বিচিত্র ভয়াবহ গবেষণার মিল আছে। গোপালপুর সীকোস্ট-এ নির্জন পরিবেশে "ষষ্ঠীচরণ" কেমন একটা গা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে রসটার উত্তমর্ণ ওয়েল্‌স নন কিন্তু। সুকুমার রায়কেও পাশ কাটিয়েছেন লেখক আশ্চর্য তৎপরতায়। অদ্ভুত রস ও হাস্যরসের মিশ্রণ থেকে তিনি সযত্নে হাস্যরসটি এখানে ছেঁকে বার করে দিয়েছেন। যা রইল তা অদ্ভুত ও ভয়ানকের মোক্ষম বিমিশ্র স্বাদ।

সত্যজিৎ রায়ের অলৌকিক গল্পগুলির বেলাতেও বলতে পারি এগুলি পড়ে আমরা বড়রা যদিও সম্যক তৃপ্তি পাই, তথাপি এগুলি ছেলেদের জন্যই লেখা। কিন্তু একটু বড় ছেলেরা এর লক্ষ্য। লীলা মজুমদারের হাত থেকে আমরা খুব চমৎকার ভূতের গল্প পেয়েছি। কিন্তু সে গল্পের লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেরা। রায় ও মজুমদার দুজনেরই ভূতের গল্পের প্রিয় পটভূমি পরিত্যক্ত নির্জন বাড়ি। লীলা মজুমদারের ভূতেরা তাদের উপভোক্তাদের কথা ভেবেই বোধহয় খুব স্নেহময়, মজারুও কখনো কখনো। ভূতের গল্পের আরেক সার্থকস্রষ্টা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভূতেরা, লীলা মজুমদারের গল্পের ভূতদের ছানাপোনা। সত্যজিৎবাবুর গল্পের ভূতেরা কিন্তু আসল ভূত। এবং তাঁর ভূতের গল্পের বয়স্কভোগ্য সৌন্দর্য গল্পের শ্লীকচারে। সকলেই জানেন ভূতের গল্পের প্রধান মজা ভূতের আত্মপ্রকাশে। এ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। "অনাথবন্ধুর ভয়" এবং "ব্রাউন সায়েবের বাড়ি" গল্প দুটির তাক্ লাগানো উপসংহার ভৌতিক হতভম্বতা সৃষ্টি করে। এটাই ভালো ভূতের গল্পের আর্ট। অলৌকিক রসের গল্প হলেও "খগম্" ভূতের গল্প নয়। ছোটছেলেদের এ গল্প পড়তে বাধা নেই, উপভোগ করতেও বাধা নেই— কিন্তু এ গল্পের অন্তর্গত তাৎপর্যের তীরটি বয়স্কদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। কোনো মানুষ তার সেন্‌স্ অফ গিল্‌ট্ বা অপরাধ চেতনার হাত থেকে মুক্তি পায় না। এই বক্তব্যটি সত্যজিৎ রায়ের একাধিক গল্পে দেখা দিয়েছে একাধিক রূপে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। "খগম্" গল্পের ব্যাপারটি নাটকীয়। বালকিষণকে ধূর্জটিবাবু অহৈতুকী জিঘাংসায় মেরে ফেললেন, ফলে ক্রুদ্ধ ইমলিবাবার অভিশাপে ধূর্জটিবাবু সাপ হয়ে গেলেন— এই ভয়াবহ গল্পটির পিছনে রয়েছে একটি পুরাতন ভারতীয় মীথ। মীথটি অভিশাপের থীম্‌কে নিয়ে গঠিত। "খগম্" নামটি ধূর্জটিবাবুর মুখে উঠে এল অবচেতনের থাকায়। সে অবচেতন তখন অপরোধবোধে অভিভূত বলেই ইমলিবাবার অভিসম্পাতী মূর্তির সঙ্গে ধূর্জটিবাবু মহাভারতের শাপোক্ত মুনিকে গুলিয়ে ফেলেছে। বাকিটুকু বিকারের ফল। "মিঃ শাসমলের শেষরাত্রি" গল্পে শেক্‌স্‌পীয়ারের 'রিচার্ড দি থার্ড'-এর গ্যাভেজিং ঘোস্টদের কথা মনে পড়বে। সেখানেও কৃতকর্মের অবচেতন-সঞ্চিত পাপবোধ শেষ মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়েছে।

শ্রীরায়ের গল্পের দুটি চরিত্রের কথা একটু আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় —জটায়ু আর অবিনাশবাবু। দুজনেই সাধারণ মাপের বাঙালি। ঘটনাচক্রে দুজনেই জড়িয়ে পড়েছেন যেখানে মননে অসাধারণ করিৎকর্মা দুজন মানুষের সঙ্গে। এ সম্মেলন হাস্যরসের যথেষ্ট কারণ হতে বাধ্য— হয়েওছে তাই। দুজনের মধ্যে আছে দুরকমের বাঙালিয়ানা— সে বাঙালি একটু একটু সাহেব হতে পারলে সুখী হয়— কিন্তু তার বাঙালি স্বভাব শেষ পর্যন্ত দুর্মর। কৃতী প্রতিবেশীকে পরিহাস করতে পারা পড়শী বাঙালির একধরনের মৌতাত। অবিনাশবাবু প্রথমটা ছিলেন সেই মানুষ। প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব তাঁর কাছে উপহাসের সামগ্রী। তিনি সে প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্যের চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন নিজের মূলোর খেতের নিরাপত্তার জন্য। তার জন্য খেসারত দাবি করতে ও তাগাদা দিতেও তাঁর বাধেনি। আবার সেই শত্রুর সঙ্গে পরে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেও তাঁর কোনো চক্ষুলজ্জা হয়নি। এই বেরিয়ে পড়ার ঘটনা থেকেই বোঝা গেল অবিনাশবাবুর চরিত্রে আরেকটা মাত্রা আছে বাঙালির ভ্রমণপিপাসা। এতেই চরিত্রটি মুক্তি পেল তার ভাঁড়ামি থেকে। কিন্তু অবিনাশবাবুর ভ্রমণপিপাসা অজানা জায়গা চোখে দেখার অহমিকা তৃপ্তি মাত্র। তাঁর কৌতুহলের কোনো ইতিহাসও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। সহযাত্রীদের বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তিব্বতযাত্রার সাহেব সঙ্গীদের জন্য তিনি মাত্র তিনটি ইংরাজি বাক্য স্থির করে রেখেছিলেন। সকালে গুড মর্নিং, সন্ধ্যায় গুড ইভনিং এবং সাহেবদের কেউ যদি খাদে গড়িয়ে পড়ে যায়, তাহলে, গুড বাই। তিনি ভীতু নন ঠিক কথা, কিন্তু তাঁর সাহসের কোনো পরীক্ষাও হয় নি। উনিশ শতকীয় বাংলায় গল্প লেখেন, মানুষটিও সে হিসাবে খাঁটি মফস্বল ব্র্যাণ্ড। ভিড়ে পড়তে পারবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি সিদ্ধ। কৈলাস শৃঙ্গ দেখে সাহেবদেরও তিনি গড় করিয়ে ছেড়েছিলেন — খাঁটি বাঙালি লজিক প্রয়োগে — সেক্রেড্, সেক্রেড্, মোস্ট সেক্রেড্ প্লান কাউ। তা বলে তিনি ইংরাজি জানেন না এমন নয়। ঠিক ঠিক জায়গায় তিনি মোক্ষমভাবে মিল্টনের কাব্য স্মরণ করতে পারেন। নকুড়বাবু সে জায়গায় একান্ত সাদামাটা বর্ণহীন মানুষ। বিনীত ভঙ্গিতে মাটি চেটে ফেলেন যেন এমন ভাষায় চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি অনেক গুণ আছে এঁর। এমন কি মনগড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পারেন। "নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো"

গল্পে নকুড়বাবুর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নকুড়বাবুর সম্যক শক্তির আশ্চর্য কাহিনীগত প্রয়োগ ঘটেছে "প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও" গল্পে। তাজমহলকে কার-বোনিয়া ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে নকুড়বাবুর অলৌকিক শক্তির অদ্ভুত প্রয়োগ বিশ্বাস্য হত না যদি না আমরা আগের গল্পটি পড়ে রাখতাম।

জটায়ু সে তুলনায় একান্তই নাগরিক মানুষ। কলকেতে বাঙালিয়ানায় তার আচরণ চিহ্নিত। সে যখন 'মিস্টার মিত্তির' বলে ফেলুদাকে ডাকে, তখন ইংরেজি কেতাব 'মিস্টার' আর বাগবাজারী 'মিত্তির' শব্দের পাশাপাশি অবস্থান বুঝিয়ে দেয় লোকটি মোটেই ইংরেজি কেতার ধার ধারে না। ইংরেজি ভাষার প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, দখল তেমন নেই। অম্লানবদনে উল্টোপাল্টা ইংরেজি বলে, যেমন 'ইনকজিটো' (ইনকগ্‌নিটো)। খুব প্রথম শ্রেণীর কোনো এ্যাম্বিশন তার নেই। রোমহর্ষক নামের, 'ভ্যাঙ্কুভারে ভ্যাম্পায়ার' জাতীয় বই লিখে, তাতে অনেক ভুলভাল থাকে— দুমাসে তিন হাজার কপি বাজারে চালাতে পারলেই সে সুখী। ফিল্মে বই চললে আরো সুখী। গাড়ি কিনেছে। 'সোনার কেল্লা' থেকে সে ফেলুদার সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু এমন একটা কিছু তার মধ্যে আছে যে তারপর থেকে জটায়ু— ফেলু মিত্তির— তোপ্‌সে রূপান্তরিত হয়েছে অচ্ছেদ্য ত্রয়ীতে। যা ছিল বুদ্ধিগ্রাহ্য তাদন্তিক গল্প বা ডিটেকশন স্টোরি, জটায়ু যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে উঠল সকৌতুক ও এন্টারটেনিং। কিন্তু কমিক রিলিফের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রত্যক্ষ ঘোষিত না হলেও জটায়ুর একটা জীবন দর্শন আছে। সে রহস্যকাহিনী লেখে। ফেলু মিত্তির তাকে রহস্যঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত হবার সুযোগ দিচ্ছে। 'সোনার কেল্লা' ফিল্মে সে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা কি এখন ডেকয়েটদের পিছু পিছু ছুটছি, তখন তার বুক ঢিপ-ঢিপ উত্তেজনায় আগ্রহ উদ্বেগে মিশ্রিত মুখচ্ছবিটি সন্তোষ দত্ত খুব চমৎকার ধরে দেন। এই হচ্ছে আসল লোকটা। ফ্যাক্ট্‌ ইজ্‌ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন, একথা জেনেই বোধহয় জটায়ু ফিকশনের ফক্কা জগৎ ছেড়ে ফ্যাক্টস্‌-এর জগতে ঢুকে পড়েছে। রহস্যকাহিনীর লেখক রহস্য ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ল এমন একটি চরিত্র অবশ্য এর আগে আমরা ফেলুদা কাহিনীতে পড়েছি— তিনি "ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি" গল্পের তিনকড়িবাবু। কিন্তু তিনকড়িবাবু সত্যি তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তাকে দিয়ে জটায়ুর উদ্দেশ্য মিটত না। আশ্চর্য নয় জটায়ু বিপুল জনপ্রিয় হবে। সংখ্যায় বেশী লোক জটায়ুর মতো লেখকের লেখা পড়তে

ভালবাসে— জটায়ু নিজেও জানে সে বড় মাপের মানুষ নয়। তা নিয়ে তার মাথা ব্যথাও নেই। কিন্তু সে ভ্রমেভ্রান্তিতে আগ্রহে কৌতূহলে ভয়ে ভরসায় খুব জ্যান্ত মানুষ। পাঠিকারা তার খুব অনুরাগী। রুণু তাই ফেলুদাকে দেখে প্রথমেই জটায়ুর খবর নিয়েছে। জটায়ুর ভিতু ভাবটাকে পাঠিকারা খুবই উপভোগ করে। ভয়ের মুহূর্তে যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে মহাপ্রাণের নিঃশ্বাস মিশে যাওয়া— চঃ বলতে ছঃ, অথবা 'কে' বলতে গিয়ে 'খে' বলে ফেলা আমাদের মনে পড়ে। উত্তেজনাপ্রবণ ভদ্রলোকটি উত্তেজনার মাথায় যেভাবে গুলিয়ে ফেলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়, যেমন— দি সার্কাস হুইচ এসকেপড্ ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেষ্টিক টাইগার— ভদ্রলোক লক্ষ করেননি সেন্‌শটাই প্রায় এসকেপ করছে। ফেলুদা ও তোপ্‌সে কম্বিনেশনে কোনো হাস্যরসের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু দ্রষ্টা ও ন্যারেটর তোপ্‌সের চোখে বাগ্‌যত ও র‍্যাশনাল ফেলুদা এবং বাক্‌লুব্ধ ও উত্তেজনাপ্রবণ জটায়ু একসঙ্গে হলে যে চমৎকার অসঙ্গতি সৃষ্টি করে তা উপভোগ্য হাস্যরসের উৎস। 'ছিন্নমস্তার কাহিনীতে' জটায়ু যখন ফস্‌কে যাওয়া বুদ্ধির পৌনঃপৌনিক 'ছ্যা'-ছ্যা'-এর স্রোতে গল্প থামিয়ে ফেলার যোগাড় করছিলেন, তখন ফেলু মিত্তিরের গম্ভীর সংযত ধমকে জটায়ুকে পরে 'ছ্যা' 'ছ্যা' করার নির্দেশ, জটায়ুকে থামিয়ে দিয়ে আমাদের হাসিয়ে দেয়।

কিন্তু যেসব গল্পে বয়স্কপাঠ্য ও কিশোর পাঠ্যের বিভাজন রেখা ভাবা হয়নি, পাঠকও ভাবেন না, সে সব গল্পেই সত্যজিৎ রায়ের শক্তি একটা অন্য মাত্রায় ফুটে ওঠে। একটু ইতস্তত করেই বলে ফেলছি— সে সব গল্পেই তাঁর নিজস্ব স্বভাবের সংক্ষিপ্ত যথার্থ পরিচয়। সে স্বভাবের নাম শিল্পীস্বভাব। নানা ভাবে এর প্রকাশ ঘটেছে— নানা স্তরে। শিল্পীর কৌতূহল নিয়ে, শিল্পীর শ্রদ্ধা নিয়ে, বিনয় নিয়ে এবং বিনয়মিশ্রিত প্রত্যয় নিয়ে তিনি জীবনের মুখোমুখি হতে চেয়েছেন। বিশ্বাস করেছেন সব ক্ষতিপূরণ ওখানে। "টেরোড্যাকটিলের ডিম" গল্পটি উল্লেখ করছি। বদনবাবু ছাপোষা কেরানি। পঙ্গু ছেলে বিলটুর জন্য তাঁকে গল্পের যোগান দিতে হয়। তাই মনে মনে তিনি গল্প ফাঁদেন— বিলটুকে শোনাবেন বলে। "টেরোড্যাকটিলের ডিম" দারিদ্র্যের গল্প নয়, তথাকথিত বাস্তবতা এর উপাদান নয়। পঙ্গু ছেলের জন্য দুঃখী পিতার গল্পও এ নয়। এ এক এমন মানুষের গল্প যে অক্লেশে মাস মাইনের একটা ভারি অংশ পকেটমারকে ধরে দিয়ে আসে এই আনন্দে যে, ছেলের জন্য একটা মোক্ষম গল্প সংগ্রহ করা গেছে।

এখানে আসল শিল্পী ওই পকেটমারটি। যে প্রায় ম্যাজিক দেখিয়েছে হাত-সাফাই করে— আর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিশিয়ানের উপযুক্ত হতভম্ব করে দেওয়া প্যাটার করে। এই প্যাটারটাই শিল্প। মদনবাবু শিল্পপ্রাণ বলেই টাকা খোয়ানোর দুঃখের চেয়ে বড়ো করে ধরেছেন ওই প্যাটারের বিস্ময়করত্ব। দরিদ্র সংসারের রুগ্ন পিতার দুঃখ ধাক্কাকে এ গল্পে মিথ্যা বলা হয়নি। কিন্তু কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য বলা হয়েছে মদনবাবুর আনন্দ পাবার ক্ষমতাকে।

অন্যদিক থেকে এরই কারণে বলতে পারি "অতিথি" গল্পটির কথা। যে পরিবারটির পটভূমিকা গল্পটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সে পরিবার আর্থিক দারিদ্র্যে ম্লান নয়। কিন্তু সে পরিবারের একটা অন্য দারিদ্র্য রয়েছে। তারা তাদের সংকীর্ণ সিদ্ধির চার দেওয়ালের মধ্যে ছক বাঁধা অস্তিত্বকে আঁকড়ে থাকে। যা তাদের প্রত্যহ ব্যবহৃত সংস্কার বাইরে তাকে তারা বিশ্বাস করতে নারাজ। এরই মাঝখানে এসে হাজির হয়েছিলেন মণ্টুর দাদু— বিচিত্র বিশ্বের ডাকযোগ্য বুকে নিয়ে। স্বভাবতই তাঁকে এ বাড়ির মধ্যে যে বুঝে নিতে চেয়েছে সে মণ্টু। দাদুও মণ্টুদের সঙ্গেই গল্প করতেন— সাহারার তুয়ারেগদের গল্প, জাহাজে দুঃসাহসিক যাত্রার গল্প। টাকা পয়সায় মাপা সাংসারিক সাফল্যের দ্বারা স্পষ্ট নয় যে সব বয়সোত্তর মানুষ— তা সে শিশু হোক কিশোর হোক, অথবা প্রৌঢ় হোক সত্যজিৎ বাবুর গল্পের লক্ষ্য তারা। দাদুও তার মানসিকতার উত্তরাধিকারী করে গেছেন মণ্টুকে— সে সেই বয়সোত্তর মানবগোষ্ঠির সদস্য বলে। যে মন পাকা, সে মন শ্রী রায় অথবা ঐ দাদু কারো লক্ষ্য নয়। এটাও শ্রী রায়ের জীবন সমালোচনারই একটা অঙ্গ।

এই জীবন সমালোচনাকেই আরেকটু অন্য মাত্রায় দেখতে পাই আমরা "অসমঞ্জবাবুর কুকুর" গল্পে। বিজ্ঞান কাহিনী লেখক ওলাফ স্টেপলডনের একটা উপন্যাসে একটা কুকুর ছিল, বৈজ্ঞানিক তার সারমেয় শরীরে মানবীয় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। অসমঞ্জবাবুর কুকুর সে জাতীয় নয়। অসমঞ্জবাবু সত্যজিৎবাবুর অনেক গল্পের মতোই একলা মানুষ। পটলবাবু বা বঙ্কুবাবুর মতো সংসারের বাজার দরে তিনিও আসলেই পয়লা মার্কার মানুষ নন। শাখা ডাকঘরে কেরানি, দেড়খানা ঘরের ভাড়াটিয়া। মাসে দুটো হিন্দী ছবি, একটা বাংলা যাত্রা বা থিয়েটার, হপ্তায় দুদিন মাছ, আর চার প্যাকেট উইল্‌স্ সিগারেট হলেই তাঁর চলে যায়। একা মানুষ, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। এ হেন ব্যক্তি একটি কুকুর যোগাড় করলেন। নাম ব্রাউনী। তাজ্জব ব্যাপার এই যে, কুকুরটি হাসে— ঠিক জায়গায় হাসে, হাস্যরসের সূত্র অনুযায়ী

মুখেমুখে হাসে। এ গল্পের চূড়ান্ত সীমায় আছে ব্রাউনীকে কিনে ফেলতে ইচ্ছুক এক মার্কিন সাহেবের ব্যাপার স্যাপার দেখে ব্রাউনীর নতুন হাসি। 'সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে'— সাহেব সোনার পার্কার কলম পুনরায় পকেটবন্দী করে ফিরে যাবার সময় অসমঞ্জবাবুর বিষয়ে বলে গেলেন— হি মাস্ট বি ক্রেজি। টাকা দিয়ে মানুষের ভালবাসার সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় এ কথা যে ভাবে সে সবচেয়ে হাস্যকর— আর বিত্তহীন সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে একটা অসাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসে উপলব্ধির ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে। তখন এক মুহূর্তে নাটকটা পাল্টে যায়। ঝকঝকে চকচকে শ্যামল নন্দী সাহেবের ধাতানির ভয়ে অসমঞ্জবাবুর ওপর কঠিন হতে চায়। কিন্তু অসমঞ্জবাবু ব্রাউনীর হাসির আলোয় সহসা উপেক্ষা করে বসেন ঐ অতলান্তিক পারের ধনকুবেরকে আর কমিশন ভিক্ষু বাঙালি নন্দীকে। এমনি করেই একদা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির বেকার যুবকটি মনের অপ্রমেয় মানসিক বিস্তারের মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল উমেদার ভূমিকা। এক হিসাবে সত্যজিৎবাবুর এই গোত্রের সব গল্পই ব্যক্তির আত্মাবিষ্কারের গল্প। তুলে নিতে পারি "দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্পটি। ম্যাজিক স্টোরিতে লীলা মজুমদারও সিদ্ধহস্ত। তাঁর সুবিখ্যাত "ভানুমতীর খেল" গল্পটি ম্যাজিকের অপার অবাককাণ্ডের গল্পই বটে, যদিও শেষ পর্যন্ত গল্পটি ড্রিম স্টোরি। সত্যজিৎ বাবুর গল্পেও একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু তার তাৎপর্য আলাদা। সেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঘটেছে সুরপতিবাবুর আত্মোপলব্ধি। এ গল্পের মূল উপাদানটি রয়েছে সত্যজিৎবাবুর শৈশব স্মৃতিতে। 'যখন ছোট ছিলাম' বইটিতে শেফালো সাহেবের স্টেজের কারসাজি বনাম বিয়ে বাড়িতে দেখা এক বাঙালি ভদ্রলোকের টাকা আংটির ম্যাজিকের স্মৃতি পরিণতচেতনায় "দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্পে রূপ ধরেছে। এবং বীজ-বক্তব্যটিও এক— জেনে নিতে হবে কোনটি প্রকৃত শিল্প, খাঁটি ভারতীয় স্বভাব-যুক্ত। সুরপতিকে ত্রিপুরাবাবু বলেছিলেন, 'একজন বিদেশী বুজরুকের বাইরের জাঁকজমক তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। আসল পথ ছেড়ে যে পথে চট করে অর্থ হয়, খ্যাতি হয়, সেই পথে চলে গেলে তুমি।' এখানেই বোঝা যায় ত্রিপুরাবাবু শিল্পী— কলকব্জার উপর সে শিল্প নির্ভরশীল নয়। সাধনায়, নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় তার রহস্য করায়ত্ত হয়। সুরপতিকে ত্রিপুরাবাবু সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বপ্ন ধরে ব্যাখ্যা করলে বলতে পারি সুরপতির অবচেতনে যা ছিল সেটাই ত্রিপুরাবাবুর মুখে ব্যক্ত হয়েছে।

"সহদেববাবুর পোর্ট্রেট" ও "রতনবাবু ও সেই লোকটি" এই গল্প দুটির মধ্যে রস ও রূপের অনেক তফাত। "রতনবাবু ও সেই লোকটি" এক কথায় দারুণ গল্প— বাংলায় কেন, আমার জ্ঞানে আমি কোথাও এরকম গল্প পড়িনি। কিন্তু এই দুটি গল্পেরই মোদ্দা কথা একটাই— আনুরূপ্য কোনো দিক থেকেই মঙ্গলের কারণ হয় না। এর প্রাথমিক বীজ রয়েছে বুঝি "প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু" গল্পে— বোর্গেল্টের উক্তিতে— 'ঠিক ওরই মতো আরেকজন কেউ থাকে সেটাও চাইল না।' যে বিশ্বসভ্যতা আজ সব কিছু ছাঁচে ঢালাই করার জন্য ব্যস্ত তার শিল্পময় প্রতিবাদ এই গল্প দুটি। রতনবাবু এমন মানুষ যার সঙ্গে কারো মেলে না। তিনি একা তো বটেই, অনন্যও বটে। তিনি খোঁজেনও অনন্যকেই —যা সবাই দেখে না, খোঁজে না, সেগুলিই তিনি খোঁজেন। কিন্তু সিনিতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর এক হুবহু ডুপ্লিকেট। এখানেই রতনবাবুর মতো মানুষ বড় ধাক্কা খেলেন। এই একটা জায়গা যেখানে সব উত্তরই তাঁর জানা— কেননা তিনি নিজেই সেই উত্তরগুলো। রতনবাবু সেই অসহ অবস্থা থেকে মুক্তি চাইলেন অনুরূপকে ধ্বংস করে। কিন্তু আনুরূপ্য তো পারস্পরিক —কে রূপ আর কে অনুরূপ দুটো জীবনে স্থির হল না বলেই একটা মৃত্যুতেও তা স্থির হল না। সহদেব বাবু নিজে থেকেই অঙ্কিত প্রতিকৃতির অনুরূপ হতে চেয়েছিলেন। সেই আনুরূপ্য সাধনার ফলে তাঁর অর্জিত সৌভাগ্যের ভাঁটা সরতে শুরু করল। অবশ্য সহদেববাবুর এই দুর্দশা তাঁর একটা কৃতকর্মের শাস্তিও বটে। পোর্ট্রেট ফেরত দিয়ে আবার রিয়ালের জগতে ফিরে এলেন।

সত্যজিৎবাবুর গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য হল জীবনচর্চায় কতকগুলি প্রাথমিক নর্মকে স্বীকৃতি দান। একটা নর্ম হল ছোটবেলার বন্ধুকে আঘাত করতে হয় না। হলে কি হয় তার প্রমাণ বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম। শৈশবের বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের স্মৃতি মোছে না। তার প্রমাণ ফেলুদার "গোয়েন্দাগিরি" এবং "চিলেকোঠা গল্প"। এই জগতের আর একটি নর্ম হল তুমি কৃতী হলেও তোমার কৃতিত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত কৃতজ্ঞতা ও বিনয় —"জুতো" এবং "দুই ম্যাজিশিয়ান" গল্প তার প্রমাণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত স্নেহরসের বশ। তাঁর গল্পে আমরা পাই ক্লাসফ্রেণ্ডের প্রতি সকল অবিশ্বাস, সংশয় এবং তজ্জনিত গ্লানির অবসান ঘটে জয়ের ছেলে সঞ্জয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বদনবাবুর জীবনের টান তাঁর ছেলে বিল্টুর জন্য। পিল্টুর জগৎ মন্টুর জগৎ, সদানন্দের জগৎ অনেক বেশী বিশ্বাস্য— একথা তিনি আমাদের শোনান— আমরা যারা নানা খর্বতায় আর

সংকীর্ণতায় পীড়িত। ফটিকচাঁদের হারুণও স্নেহমিশ্র সখ্যের বশ। এমন মানুষই যথার্থ শিল্পী। সে শিল্প জীবনের বিশাল গাছে লতা। হারুণ বাবলুকে তার ফটিকচাঁদ পর্বে এ কথাই শেখাল জীবনকে ভালবাসলে তবে শিল্পী হওয়া যায়। আর জীবনকে যে ভালবাসে, সে মুক্ত। সব কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। এই মুক্তির চেহারাটা বাবলু এর আগে দেখেনি। হারুণ ফটিকচাঁদকে বাবলুর জীবনে অবিস্মরণীয় করে দিল— বাবলু জানল কাকে বলে অকৃত্রিমতা। সত্যজিৎবাবুর শিল্প অকৃত্রিমতার সাহায্যে কৃত্রিমতার প্রতিবাদ। হারুণের মতো সেও আমাদের শেখায় মনের দিক থেকে বড় মাপের মানুষ হতে। আর্টিস্ট কি শুধু একরকম হয়···বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা— এক এক খেলা এক এক স্টাইলে খেলতে হয়। আর শেখাল আর্টিস্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা। ফটিকচাঁদ জানল কাকে বলে জীবনের সত্য মূল্যাঙ্কন। একটা কথা তাকে হারুণ বলে গেল জীবনের কোনো অবস্থার জন্যই খেদ থাকে না তার— যে শিল্পকে ভালবাসে।

সব শেষে আলাদা করে বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ের গল্পশৈলী। এ সবটাই তাঁর নিজস্ব। এ গল্পে কোথাও ফেনা নেই। পাতাবাহার নেই। নিষ্পত্র অথচ ফলবতী লতার মতো মনোজ্ঞ সে গল্প। তোপ্‌সের ভাষা আর শঙ্কুর ভাষার মধ্যে পার্থক্য এখানে উল্লেখ করি! তোপ্‌সের গল্পে একটা অন্তরঙ্গ সরল কৌতুক আছে— একটা উঁচু ক্লাশের স্কুলের ছেলের স্কুল-ল্যাঙ্গুয়েজ সে স্বভাবত নিঃসংকোচে ব্যবহার করে। ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতা নিয়ে তার অহংকারও আছে। কেউ ভুল করলে তা নিয়ে 'ফান' করতেও ভাল লাগে। পক্ষান্তরে শঙ্কু স্বভাবগম্ভীর। তার গল্পও তাই। হিউমার সেখানে যথাসম্ভব স্বল্প। অপরের অজ্ঞতায় সে হাসে না, বিরক্ত হয় না— বোধ হয় নির্বোধের প্রতি অনুকম্পা পোষণ করে। লক্ষ করি যে, শঙ্কুর ভাষার ডায়েরি-রেজিস্টার যেমন সংক্ষেপে সংহৃত হতে জানে, তোপ্‌সের ভাষার কিশোর স্মার্টনেশ তেমনি ডাইনামিক। তোপসের বা 'ফটিকচাঁদ' উপন্যাসের বাবলুর ভাষার প্রধান গুণ তা বিশেষণকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না। দেখাকে শুনিয়ে দেওয়া খুব শক্ত কাজ। এ ভাষার সে ক্ষমতা আছে। এ ভাষার প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে ফেলুদা তোপসেকে যা বলেছিলেন তা এই—'গাদাগুচ্ছের মর্চে ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লেখাপড়া করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটি ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।' কিন্তু তার মানে কিন্তু এ নয় যে এ ভাষায় কবিতা নেই।

'ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়ি ঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা।'

নদীর ছুট আর ঝাঁপ 'ছিন্নমস্তার অভিশাপে'র এই গল্পে যেন সটান ছায়া ফেলেছে। আসলে একজন আর্টিস্ট যিনি বস্তুকে রঙ সমেত চাক্ষুষ করে দিতে চান— এ গল্প তাঁর গল্প। সংযম, যথাযথতা একটা নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এখানে। স্ফটিক স্বচ্ছতার সঙ্গে তা তুলনীয়। অথচ দরকারে রঙ ধরাতেও এ জানে।

যে কোনো বড় মেট্রোপলিসের মতো কলকাতা মহানগরীও যুবক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব অভিজ্ঞান বা 'আইডেনটিটি' খুঁজে নিতে চেয়েছে। সেই অন্বেষার একদিকে তার নতুন প্রয়োগবাদ আরেক-দিকে তার প্রোফেনিটি। কলকাতা শহরের প্রথম কয়েক দশক যেতে না যেতেই এ প্রবৃত্তি তার সকল কর্মোদ্যোগের মূলকথা হল—'যা করছি তা কতটা কাজে লাগবে!' দ্বিতীয় লক্ষণটিও দেখতে দেখতে তীব্রতা পেয়েছে—স্থূল বস্তুবাদ। একজন প্রাচীন গ্রামবাসী 'বারাণসী' শহর দেখে চমকে ওঠেনি—কিন্তু কলকাতা শহর দেখে তার চমকে ওঠার কথা। কলকাতা শহরের একেশ্বরবাদ, ধর্মকে কালোপযোগী গতিশীলতা দানের প্রয়াস, তার প্রত্যাহের জীবনে মুদ্রামানের আধিপত্য—পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে অতিসচেতনতা—উপকরণের বাহুল্য সৃষ্ট সম্পদ সম্বন্ধে সপ্রশ্ন দায়িত্ববোধ—এ সমস্তই একটা নবীন পোলিসের চরিত্র। কিন্তু তার থেকে বড়ো চরিত্রলক্ষণ একটা বৃহৎ শহরের সচলতা ও অনামা মুখাবয়ব বা এ্যানোনিমিটি। কলকাতার মতো একটা বৃহৎ শহর বললেই যে ইমেজটি আমাদের চোখে প্রথম ভাসে তা হ'ল অনেকগুলি বড় রাস্তার কাটাকুটি, আর যানবাহন ও পদযাত্রীর দ্রুত ধাবমানতা। প্রথম দর্শকের চোখে ঊনবিংশ শতকে এ ব্যাপারটা কী রকম ঠেকেছিল ইন্দিরার প্রথম কলকাতা দর্শনে তার বর্ণনা মেলে :

> নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া, বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র ;—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞান বুদ্ধি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য, অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে? নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্তী রাজপথে গাড়ি পাল্কী পিপ্ড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই। তখন মনে হইল,

> ইহার ভিতর খুড়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে? নদীসৈকতের বালুকারাশির ভিতর হইতে, চেনা বালুকাকণাটি খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে?

এই সচলতা এবং অপরিচয়ের অন্ধকারে ডুবে যাবার আশঙ্কার গোড়ায় রয়েছে একটা আধুনিক টেকনোপলিসের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যতা। একটা অনিশ্চয়তা প্রথম দর্শনেই জেগে ওঠে। এর যেটাকে এ্যানোনিমিটি বলছি তা এই শহরের বস্তুময় সাফল্যের উপহাত— এর সচলতার প্রত্যক্ষ সন্তান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়— ধাবমানতাটা এ্যাবসট্রাক্ট। এর লোকজনদের কোনো মুখের রেখা নেই, এই ধাবমানতায় কোনো গভীরতর ব্যক্তিগত সম্পর্কের চর্চা বা কোনো স্থায়ী মূল্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। রমেশ দত্তের 'সংসার', উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে বিন্দু ও সুধার প্রথম কলকাতা— অভিঘাতেও এমনই এক আশঙ্কার উল্লেখ রয়েছে:

> পথ জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী চলিতে পারে না, মনুষ্যের ভিড়ে মনুষ্য অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পায় না, চারিদিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ খারদারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চীৎকারধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,— একি বিশাল মনুষ্য সমুদ্র! এত লোক কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়! অদ্য তালপুকুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মনুষ্য-সমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহানগরীর কোনো নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান পাইবেন?

ইন্দিরা ও বিন্দু সে যুগের সাধারণ মানসতার প্রতিনিধি। বিশাল একটা মেট্রোপোলিস বা, টেকনোপোলিস হতে চলেছে সে কি গিলে ফেলবে আমাকে? এই প্রশ্ন, হারিয়ে যাবার ভয় থেকেই আসে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প। তখনই চরিত্রপাত্রগুলি হয়ে ওঠে উপন্যাসের চরিত্র। বড় শহরের মুখর সচলতার সামনে, বা তার মধ্যে পড়ে যে বিহ্বলতা কিংবা বিমূঢ়তার জন্ম হয় তার একটা পরিচয় আমরা পেয়েছি তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য়। নীলকমলের অভিজ্ঞতায় কোলাহলময়, নিরবয়ব আর বিবেচনাহীন হাস্যকরতার ছাপটি চিরমুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মহানাগরিক মোবিলিটি শুধু চাক্ষুষ ঘটনামাত্র নয়। এর মধ্যে আছে আধুনিক জীবনের আত্মার একটা ছায়াও। শুধু বাইরের মোবালিটি নয়, ভিতরের একটা মোবিলিটিও নাগরিক জীবনের একটা লক্ষণ। স্তর-শ্রেণী জীবিকাগত সচলতার ব্যাপারও এখানে একটা

থাকে। 'সংসার' উপন্যাসের প্রথম এক তৃতীয়াংশে একটা স্থাণু আইডিলিক অবস্থার বর্জন ও নাগরিক জীবনে অধিকতর সুবিধাজনক আরো বেশি অনুকূল পরিবেশের জন্য প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রমেশ দত্ত সঠিক ভাবেই এই পর্যন্ত মহানাগরিক মনোভাবকে ধরেছেন। স্বভূমি থেকে দূরে গিয়ে নায়ক ঘুরে বেড়াচ্ছে শিকড় মেলার জায়গা খুঁজে— এটা একটা উপন্যাসের বিষয় হতেই পারে। রমেশ দত্ত অন্তত তার কিছুটা নিদর্শন হাজির করেছিলেন।

দুই

আমেরিকান ঔপন্যাসিকদের একটা বড় অংশে জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটর এবং হাওয়াই-জাহাজ ইত্যাদিকে কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে নেবার প্রবণতা লক্ষণীয়। এটাও কিন্তু ঐ মোবিলিটির প্রতি প্রীতি। হয়তো আমেরিকান ধমনীতেই একটা স্বস্থান পরিহার করে দূরের দিকে পাড়ি দেবার বাসনা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সূত্রে রয়েছে। মেলভিল্ থেকে জ্যাক কেরুয়াক পর্যন্ত এক ডজন ঔপন্যাসিকের লেখা থেকে দেখানো যায় বৈকি যে, আমেরিকান মেট্রোপোলিস বা টেক্‌নোপোলিস কতটা গতিপ্রাণ, তার ঔপন্যাসিকেরাই বা কতটা গতিপ্রেমিক। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে আমাদের উপন্যাসে ঠিক এতটা মহানাগরিক গতিশীলতার ব্যবহার ঘটেনি। কিন্তু লেখকদের নাগরিক মনস্কতার পরিচয় গতিশীলতা বা মোবিলিটি-প্রবণতায় ন্যূনতম অভিব্যক্তিও লাভ করেনি— এমন কথা বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে লম্বা স্টিমারযাত্রা এবং 'গোরা' উপন্যাসে স্টিমার-যাত্রার কথা এখানে মনে পড়তে পারে। গোরা যদি সচল মানুষ না হতো, তাহলে তার স্থিরীভূত জীবনাদর্শ এত ধাক্কা খেতো না। বিনয়ের স্টিমার-পথে প্রত্যাবর্তন শুধুই ফিরে আসা নয়— একটা পূর্বাবস্থার অবসান ঘটিয়ে ফেলা। যে জীবনে সচলতা বেশি সে জীবনে রূপান্তর ঘটে দ্রুতছন্দে। এই গতিশীলতা বা সচলতা যা একটা মহানগরের প্রাণ তা চরিত্রপাত্রগুলিকে অন্তর্বেগ-সম্পন্ন করে তোলে। বিনয়, ললিতা, পরেশবাবু এবং গোরা সুচরিতা তো বটেই কেমন নিজ সীমানা সরহদ্দের পুর্নমীমাংসা করলো সেটা তাদের নাগরিক সচলতার প্রমাণ।

একবিংশ পরিচ্ছেদে গোরা সম্বন্ধে লেখকের আধ্যাত্মিকাগামী মন্তব্য এখানে উল্লেখ করি—

> প্রকৃতি কোনোদিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার মন নিজের সচেষ্টতার বেগে নিজে কেবলই তরঙ্গিত হইয়া ছিল; সে জল স্থল আকাশ অব্যবহিতভাবে তাহার চেষ্টার ক্ষেত্র নহে তাহাকে সে লক্ষ্যই করে নাই।

এই বেগ-চঞ্চলতার জন্যই গোরাকে যথার্থ নাগরিক চরিত্র বলা হচ্ছে। আরো বলার কথা, এই উপন্যাসের মহানাগরিক গতি-প্রকৃতির একটা বড় বিষয় হল ধর্ম সম্বন্ধে পরিবর্তমান চেতনা। কলকাতা মহানগরী তার জন্মদশক পেরিয়ে কয়েক দশক যেতে না যেতেই একটা নব কালোচিত ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়েছে, তার জনক হিসাবে। ব্রাহ্মধর্ম আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর নানা পার্থক্যের মধ্যেও বললেন সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মের কথা। কলকাতা কতোটা সেক্যুলার সিটি হিসাবে গড়ে উঠল সে প্রশ্ন মোকাবেলা করার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে একটা কথা দেখা যায়, ট্র্যাডিশনাল ধর্মচেতনার জায়গায় একটা সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন সাধক ধর্ম-ধারণা প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্রাহ্মরা একটা আধুনিক জীবনাচরণ-বিধির প্রবর্তন করেছেন। গোরা সেই জীবনধারার প্রতিবাদ করতে চাইলেও, প্রতিবাদ করার জন্য তাকে ছুটতে হচ্ছে সেই জীবনযাপনকারীদের কাছে। অর্থাৎ একথা আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে, তারা অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য অংশ। গোরার মোবিলিটির একটা প্রমাণ যেমন নারী-পুরুষ-সংক্রান্ত ধারণার ভাঙা-গড়া, আর একটা প্রমাণ তেমনি— সমাজের সবস্তরে গোরার চলা ফেরায় :

> গোরার প্রত্যহ সকাল বেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে— নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার একরূপ যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা দাদাঠাকুর বলিত এবং কড়িবাঁধা হুঁকা দিয়া অভ্যর্থনা করিত। কেবলমাত্র ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্যই গোরা জোর করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল।

এই সীমাভাঙা সচলতা একটা গ্রামীণ-জীবনসঞ্জাত ব্যাপার নয়। মহা-নাগরিক সচলতা যেমন ভৌগোলিক বা স্থানিক, তেমনি শ্রেণীগত বা স্তরগতও বটে। কিন্তু আমাদের মহানগর-চেতনার সীমাবদ্ধতাও এই সূত্রেই গোরার কাছে ধরা পড়ে। নন্দ ছুতারের ঘটনা উপন্যাসটিতে তাৎপর্যপূর্ণ, সেকথা

বর্তমান লেখক পূর্বে বলেছেন। এখানে আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে কথাটা আবার বলতে হচ্ছে। এই মহানগরের 'তুপাতা বিজ্ঞান'-পড়া আলোকছটা যে অতি সামান্য জায়গাতে সীমিত, গোটা শহরের জনতা যে তা থেকে বঞ্চিত, নন্দর শোচনীয় মৃত্যু তার প্রমাণ। ডাক্তার এবং ওঝার লড়াইয়ে এখন ওঝা রোগী কবজা করতে পারে না বটে, কিন্তু শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন এ শহরের শিল্পায়ন পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়নি, তখন ওঝাকে ঠেলে ডাক্তার ঢুকতে পারতো না।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কলকাতা বারে বারে নায়িকা কুমুর চিত্তে একটা সহানুভূতিহীন অনাত্মীয় পটভূমি হিসাবে দেখা দিয়েছে। তার কলকাতা-অভিজ্ঞতার প্রথম মুহূর্তটি বিন্দু বা ইন্দিরার মতো বিস্মিত বিহ্বলের অভিজ্ঞতা নয়। তার প্রথম অনুভূতি অনভ্যাগতের অভিজ্ঞতার অনুভূতি। এই বৈশ্য স্বভাব শহর যেমন সব কিছু মেপে যাচাই করে নিতে চায়, তেমন তাকেও সে হৃদয়হীন ভাবে পরখ করে নিতে চাইছে :

> কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সংকুচিত হয়ে রইল। যে একটি আতিশয্য শুচিতা বোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে ?

এর পরের পরিচ্ছেদে বধূবরণের পর ঢোকা গেল মধুসূদনের বাড়ি। তার বৈঠকখানা বাড়ি আর অন্তঃপুর মহলের সানুপুঙ্খ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ শুধু যে মধুসূদনের শিক্ষা সংস্কার রুচি ও জীবিকার চরিত্রটি ফুটিয়ে তুললেন তাই নয়, ফুটিয়ে তুললেন কলকাতা শহরের একটা ছোট্ট এপিটোম্। সে বাড়িটায় পুঞ্জীভূত আছে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি, খড় ও গোবর, যে বাড়ির দেওয়াল ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন, বারান্দার দেওয়ালে যেখানে সেখানে পানের পিকের দাগ, কয়লার ধোঁয়া যেখানে সদাই ঊর্ধ্বায়মান, সেই বাড়ির বাইরের মহলে সর্বত্রই মার্বেলের মেজে বিলিতি কার্পেট, চিত্রিত কাগজ ঢাকা দেওয়ালে ঝুলছে এনগ্রেভিং ওলিয়োগ্রাফ, অয়েল পেন্টিং, তার বিষয়, ঘোড়দৌড় জিতেছে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, স্নানরত নগ্ন নারী ইত্যাদি। কাঁচের আলমারি ভর্তি জমকালো বাঁধানো ইংরেজি বই, বেহারা ছাড়া কেউ তাদের ছোঁয় না। এ তো শুধু গৃহ-বর্ণনা নয়, গৃহকর্তার চরিত্র-ছবিই নয়— এ তো কম্প্রাদুর বুর্জোয়াজির হাতে পড়া কেজো শহরের রূপকও বটে। সে-রূপকের চেহারাটা আরো স্পষ্ট হয় মধুসূদনের ঘরের সঙ্গে বাড়ির বাকি অংশের

বৈপরীত্যের বর্ণনায়— 'অন্দরমহলের সর্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা গায়ে দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরি জহরত দেওয়া পাগড়ি।' এটা মধুসূদনদের গৌরব, মহানগরটির বিপর্যাস।

কিন্তু শুধু রূপকে প্রতীকে নয়— ধোঁয়াশা ভরা কলকাতার আকাশ কুমুর কাছে কলকাতার স্বরূপের ইমেজের উপাদান হয়ে দেখা দিল :

(ক) কলকাতার শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

(২৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ)

(খ) পশ্চিম-আকাশে একটা লোহার কারখানার চিমনি। যে-দুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে, ওই চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল— সমস্ত আকাশের মধ্যে ওই কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটি আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

(২৮ সংখ্যক পরিচ্ছেদ)

(গ) শীতের দিন দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এল। ধূলি কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন।

(৩১ সংখ্যক পরিচ্ছেদ)

(ঘ) কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ করে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। শীতকালের বাদলা অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রং নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মন-মরা, সূর্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত।

(৪২ সংখ্যক পরিচ্ছেদ)

উদ্ধৃত অংশ-কটি প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমে বলে নিতে হয়। 'গোরা'র গল্প যখনকার 'তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীত সন্ধ্যায় নগরের নিশ্বাস কালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না।' অর্থাৎ মেট্রোপোলিস তখনো যন্ত্রনগরী হবার পথে পা বাড়ায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন

'যোগাযোগ' লিখছেন তখন এ মহানগর তার রূপান্তরের দ্বিতীয় পালা শুরু করেছে পুরোদমে। তাই উদ্ধৃত অংশগুলিতে কলকারখানার ধোঁয়ার কথা, কারখানার চিমনির কথা স্বভাবত অনিবার্য হয়।

কিন্তু এ তো গেল বাইরের কথা। ভিতরের কথাটি আরো বেশি মহানাগরিক লক্ষণাক্রান্ত। বিচ্ছিন্নতার বোধ, হারিয়ে যাওয়া মনোভাব, প্রতিহত আকাঙ্ক্ষায় বুকচাপা বাস্তহীনতার বোধ— একটা সহায়হীন নিরাশ্রয় বোধ, এই মহানগরের বুকে যে-নতুন আগন্তুক তাকে সদাই পীড়িত করে। কুমুর সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শীতকালের কলকাতার ধোঁয়াশা। লক্ষণীয় বারেবারে শীতার্ত কলকাতার আকাশের বুকে যেন কুমুর শীতার্ত মনের ছায়া পড়েছে— সে ছায়া বিবর্ন, সে ছায়া নিরুত্তাপ। উপন্যাসটি যেন শীতের দ্বারাই আক্রান্ত। শীত থেকে তার রেহাই ঘটেছে আটাশ নম্বর পরিচ্ছেদে— যখন সব দুঃখ অপমান তবু একটা উপসংহারের দিকে এগুচ্ছে, তখনই কুমু এবং বিপ্রদাস দুজনে ভৈরোঁ রাগিনী বাজাতে বাজাতে দেখল পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ আভা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। কিন্তু কলকাতায় সে আভা কার্যকর হবে কিনা তা আমরা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন কলকাতার একদিকের প্রতিনিধি মধুসূদন। তার চাওয়া পাওয়া, কামনা বাসনা, ভয় উদ্বেগ, উত্তেজনা সবই সঠিকভাবে কলকাতাসঞ্জাত। এই শহরের জন্মলগ্ন থেকে যে স্থূল বিষয়-বাদের জন্ম, যার সঙ্গে সঙ্গে জাত হয়েছে তার দৈবজ্ঞ-নির্ভর উদ্বিগ্নতা— সে প্রকৃত টেক্নোপোলিসের সন্তান নয়। তার মোবিলিটি শেষ পর্যন্ত ভাঁড়ামি। যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে কিন্তু আত্মসচেতন হয়নি, সে বিত্তবান হয়নি, হয়েছে অর্থশক্তিতে ধন্ত, সে গরিমা খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু দৈন্য ঢাকতেও জানেনি। যে ভিক্ষা চাইতে পারে কিন্তু দান গ্রহণ করার বিনয়কে চেনে না, সেই মধুসূদন তার আচারে আচরণে এই মহানগরেরই একটা দিকের চলিষ্ণু আত্মসর্বস্বতার প্রতিভূ। তার কাছে ধরা পড়ে না কলকাতা শহরের বিড়ম্বিত অসংলগ্নতা— কুমুর বিড়ম্বনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কলকাতা শহরের বিলাপ প্রলাপ এক হয়ে যায়। কুমুর অন্তরন্থ একাকীত্বের বোবা কান্নার প্রতিধ্বনি মেলে নৈশ-কলকাতার শান্ত জগতে— 'রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদ্গদ্ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর প্রতিবেশীদের আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্চাকে বেঁধে রেখেছে— রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠেছে তারই অশ্রান্ত আর্তনাদ।' পারিবারিক জীবনে কুমুর ভিড়ের মাঝখানে যে একাকীত্ব তা এই মহানগরের

বিচিত্র জটপাকানো অস্তিত্বের ফল।

আমরা আগে বলেছি এ মহানগরের আকৃতির মধ্যে কোথায় যেন বিধি-নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে একটা অ্যানোনিমিটি বা নামহীন সংজ্ঞাহীন অস্তিত্ব ধারণের ব্যাপার। এলিয়টের সুবিখ্যাত কবিতায় চরিত্রপাত্র নাম খুঁজে ঘুরে বেড়ায়। কাফ্‌কার উপন্যাসে নায়ক বহন করে অনামা পরিচয়। বড়-শহর আমাদের গ্রাস করে ফেলে তার জনপিণ্ডের বিপুল চাপে, ডুবিয়ে দিতে চায় নিরন্তর যান্ত্রিক ধাবমানতার ফলস্বরূপ এক রূপহারা নৈর্বাক্তিকতায়। উনিশ এবং বিশের শতকের গোড়ার দিকে বিপুল শিল্পনগরীগুলির মুখহীন, অদয় সংখ্যাভারালো জীবনের সম্বন্ধে ধিক্কার ও আতঙ্কে বুদ্ধিজীবীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। আমাদের উপন্যাসে অন্তত প্রথম দিকে নাগরিক হৃদয়হীনতাকে ব্যবহার করা হয়েছে সন্তর্পণে। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্পে ব্যক্তির চতুর্দিকে ক্রমবর্ধমান চাপ আর তার সংজ্ঞার্থের জন্য নিরুপায় ব্যাকুলতার ইতিবৃত্ত ফুটে উঠেছে। গল্পটি "মাস্টারমশায়"। এই গল্পের নায়ক হরলাল এই শহরের বিপুল অবজ্ঞার উপেক্ষার তলায় প্রায় নামহারা পরিচয়হারা অকিঞ্চিৎকর। আতিথ্যহীন এই শহরে সে যে বাড়িতে মাস্টার সে বাড়িতে 'গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা যোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে', যে অফিসে সে কেরানি 'সেখানে বড়ো সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন, তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল'। অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা এবং নির্মমতার একটা নাগরিক প্রকৃতি এখানে লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে বেণুর সঙ্গে সম্পর্কের ভিতর দিয়ে সে খুঁজে নিতে চেয়েছিল তার অভিজ্ঞান। কিন্তু বেণুও এই শহরেরই বৈশ্য-স্বভাব পরিবেশের পরিণাম। সুতরাং তার কাছেও হরলালের এই আত্মগত সংজ্ঞার্থ খুঁজে নেবার কোনো দাম নেই। মৃত্যুর আগে হরলালের কাছে এই হৃদয়হীন শহর কতখানি নিরর্থক হয়ে গেল, তার চেতনার কাছে এই শহরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কতটা জট পাকিয়ে গেল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই অংশে :

> শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো-বা উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল

> তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল— যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল।

বিচ্ছিন্নতাবোধের যে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে এই বৃহদায়তন শহরের ঔপকরণিক সমস্ত উপস্থিতি উৎকট সত্যের মতো ভয়াবহ বা বস্তুহীন স্বপ্নের মতো নিরবয়ব বা মুখাকৃতিবিহীন হয়ে যায়, সে বিচ্ছিন্নতাবোধও এই শহরেই হরলালদের মধ্যে এনে দেয়।

তিন

শহরের পরিচয় কিন্তু আমাদের উপন্যাসের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এর মেস বাড়ির পরিচয়, এর সন্ধ্যাগ্রহের দিনের চঞ্চলতার কথা, এর বস্তি অঞ্চলের কথা, অফিস পাড়ার কথা, শতাব্দীর দশকে দশকে চলতে চলতে নানা বেগাৰ্ত-বর্তুল বাঁকে এর পৌঁছে যাওয়া, পেরিয়ে যাওয়া উপন্যাসে নিশ্চয় ছায়া ফেলেছে। উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল', বনফুলের 'জঙ্গম', বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত', গোপাল হালদারের 'একদা' প্রভৃতি উপন্যাস তো কলকাতার এক দশকের সম্মিলিত সালতামামি। এর মধ্যে প্রসঙ্গের জন্য একটি উপন্যাসের নাম আলাদা করে উল্লেখ্য। কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে তরুণ বাঙালি ব্যবসায়ী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইনটেলিজেন্ট' উপন্যাসের নায়ক। বইখানি বেরিয়েছে এই শতাব্দীর তিনের দশকের শেষে মাসিক বসুমতী পত্রিকায়। কাহিনীর কালগত পটভূমি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের কলকাতা। তখনকার দিনের কলকাতার বাবু সমাজ ও পান্তিরাম পাকড়ের স্ব-সমাজের টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে কলকাতার অধুনা বিলুপ্ত সামাজিক ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা এ উপন্যাসে থেকে গেছে। যে-সব পুরনো বইয়ের ভিতর দিয়ে পুরনো কলকাতাকে নতুন করে চেনা যায়, 'ইনটেলিজেন্ট' বইটি তাদের অন্যতম। বাণিজ্যনগরীর এই পরিচয়বিনাশী সংজ্ঞার্থ বিধ্বংসী বৃহত্ব আর নির্মমতার যে আকৃতির কথা বলা হল এটাই সব কথা নয়। এর একটা অন্যদিকও আছে, আধুনিক উপন্যাসে সেটাও ফুটে উঠেছে। সেদিকটায় লক্ষ না রাখলে কোনো ঔপন্যাসিক বড়ো ঔপন্যাসিক হতে পারেন না। বড় লেখকের কাছে শহর কখনই আক্রমণের লক্ষ্য নয়— সেটা তার পটভূমি বটে। মহানাগরিক বিরাটত্বের মধ্যে যে

অপরিচিতের প্রতি উদাসীনতার স্বভাব থাকে, সেটা আবার একদিক থেকে খুব দরকারিও বটে। গ্রামজীবনে ব্যক্তিজীবনের প্রাইভেসি অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। 'শহরে কেউ কারো হাঁড়ির খবর রাখে না'— এই মহানাগরিক উদাসীনতা একদিক দিয়ে যেমন আধুনিক টেক্‌নোপোলিসের দান, তেমনি এর মধ্যেই আছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিজস্বচর্চার স্বাধীন অবকাশ। একারণেই 'কল্লোল' 'কালি কলমে'র ঔপন্যাসিকেরা বা তারও আগের 'ভারতী'র ঔপন্যাসিকেরা যে-কলকাতাকে ব্যবহার করলেন, সে কলকাতা ব্যক্তিজীবনের আত্মকেন্দ্রিক নিজস্ব চর্চাকে প্রশ্রয় দেয়। হয়তো কখনো বা সে চর্চা পাংশু আত্মচর্চায় পর্যবসিত হয়েছে, তবু তার যথাসম্ভব উজ্জ্বলতম মুহূর্তে মণীন্দ্রলাল বসুর বা গোকুল নাগের (যদিও একখানি) রচনায় দেখা পাওয়া গেছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রায় উপন্যাসেই মহানাগরিক পট পরিবেশে ব্যক্তির স্বাধীন আত্মচর্চার প্রাধান্য। তাঁর কলকাতার ওপর লেখা বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতাটি এই শহরের এ্যানোনিমিটির দুই দিককে আলোকিত করে। নাগরিকদের জীবনের নানা বৃত্ত। গ্রামীণ মানুষের মতো সে কেবল একটি দুটি প্রাথমিক বৃত্তেই চলাফেরা করে না। সুতরাং তার ব্যক্তিসত্তার টানাপোড়েন যে কোনো বৃত্ত থেকে উদ্ভূত হতে পারে। আপাতবিচারে বৃত্তগুলিকে মনে হয় পরস্পরের সঙ্গে শিথিলভাবে সংলগ্ন, মনে হয় আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ব্যক্তির নিজস্ব ভাঙচুর, তোলপাড় ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হলে এই নাগরিক ছক বা জীবন-যাত্রার কোনো কোনো অংশের বিস্তৃত সীমা ও সীমাবদ্ধতার মাঝখানেও কোন্ গূঢ় টেন্‌শন জেগে ওঠে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী' উপন্যাসে তার দেখা মেলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে যখন এই শহরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল নানাবেণী দুর্দিন, তখন এর এতদিনকার নিজস্ব গদ্যছন্দেরও যতিভঙ্গ ঘটলো, গতিতে এলো ভারসাম্য হারানোর স্খলন। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর', বিমল করের 'দেওয়াল', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', 'মোমের পুতুল', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' প্রভৃতি উপন্যাসে এই শহরের অসহায়, অথচ আত্মসজ্ঞিংসু, প্রতিরোধহীন অথচ আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক অস্তিত্বের দেখা মেলে। তারাশঙ্করের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসে কলকাতার রাজনৈতিক পালাবদলের প্রান্ত মুহূর্তের মুকুরে ধৃত হয়েছে তার অনেক পুরনো হিসাবের নিকাশ। বিপুল কলকাতা মোড় ফেরার জন্ত প্রস্তুত হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে একটা ব্যাপার উপন্যাসে অন্তত লক্ষ করি। যৌন মূল্যবোধের অবনমন রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক হতাশার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এ লক্ষণটি ইউরোপেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বড় বড় নগরীর মূল্য-ক্ষয়ের সঙ্গে দেখা দিয়েছে। সীতা বা লক্ষ্মীর আদি প্রতিমার সঙ্গে, বা, ইউরোপের ভার্জিন মেরীর আদি প্রতিমার সঙ্গে যে বিনয়, তিতিক্ষা আর দুঃখ বহনের শান্ত অচঞ্চলতা যুক্ত থাকে আজ মহানগরগুলিতে দুটো দুটো মহাযুদ্ধের পর অবশ্যই তা কালের কাছে মূল্য হারিয়ে বসে আছে। সিমন্ দ্য বোভোয়ারের একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায়— নারী জন্মায়, কিন্তু মেয়েমানুষ তৈরি হয়। সভ্যতা তার সামনে কোন্ অভিপ্রায় এবং মডেল তুলে ধরছে, তার উপরই এই হয়ে-ওঠা বা না-ওঠাটা নির্ভর করে। একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, আধুনিক শহর আর আমাদের আনা কারেনিনা বা দামিনীর মতো চরিত্র উপহার দেবে না। আধুনিক উপন্যাস যে দামিনী-এলা, কিরণময়ী-উজ্জয়িনীও দিতে পারবে না, বা, দিতে পারবে না আনন্দময়ী বা সিদ্ধেশ্বরী, এ থেকে বোঝা যায়, আধুনিক মহানগর প্রায় হারিয়ে ফেলেছে নারীত্বের কেন্দ্রীয় আদর্শ। এটা দোষের কথা, কি গুণের কথা, সে-কথা এখানে উত্থাপনযোগ্য নয়। এটাই ছিল এই মহানাগরিক জীবনের ভবিতব্য। কিন্তু সেই ভাঙা আদর্শের টুকরোগুলো দিয়েও একটা জোড়াতালি কিছুই কি গড়ে উঠল? যদি গড়ে থেকেও থাকে তাহলেও তার অভিঘাত-মহাকর্ষ-ঘূর্ণনের ক্ষমতা কতটা তা অন্তত উপন্যাসের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয় না। ওদিকে, উপন্যাসের ফ্রেম স্ট্রাক্‌চার থীম্ ও ন্যারেশনের যে রূপান্তর ও রকমফের ঘটেছে তা যেন এই মহানগরের চলচ্ছন্দের সঙ্গে, তালফেরতার সঙ্গে সংযোগ রেখেই ঘটেছে। ব্যক্তিবৃত্তে এই শহরে আরো কোনো গল্প নিটোল সম্পূর্ণতা পায় না। কোনো অভিজ্ঞতাই এ মহানগরে আর সংবৃত্ত অভিজ্ঞতা নয়, কোনো উপন্যাসই আর সংবৃত সমাপ্তি বা ক্লোজ্‌ড এণ্ডিং-এ দাঁড়ি টানে না। ঠিক এইভাবেই লক্ষ করি, এই শহর বোম্বাই বা দিল্লীর মতো যৌন-মনস্ক নয়, ভিক্টোরিয়ান শুচিতার ফলস্বরূপ যৌনভীতি তার এক কালে ছিল, ভেঙে গেছে— যৌন প্রীতিও তার ফ্রয়েড-উত্তর কালে যে আসেনি তা নয়, কিন্তু এখন সে যে-অবস্থায় এসে পড়েছে এটা যেন যৌনপণ্যের যুগ। মনোভাবের দিক দিয়ে তার আর যৌনে অযৌনে কোনো বয়ঃসন্ধি সুলভ বিকার থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পণ্যের দায়ে প্রতিযোগিতাপরায়ণ পসারীর হাতে পণ্যেরই মান হানি হচ্ছে। উপন্যাসও তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। জীবনার্থের

বিরাট শূন্যতা এই মহানগর এবং এই উপন্যাস একই সঙ্গে ভোগ করছে। সেই শূন্যতা আর অসহায় যৌনাত্মকতা লেখকদের অজ্ঞাতসারে এক করুণ অর্থগৌরবের রচয়িতা। 'মীরার দুপুর' উপন্যাসে মীরার ভ্রান্তি এবং অসহায়তা এই শহরেরই ভ্রান্তি এবং অসহায়তা।

এই শহরের সামর্থ্য নেই যে, সে এখানকার যুবকদের কোনো গভীরে আহ্বান করতে পারে। এই পরিবেশ সমন্বিত অথচ 'রাডারলেস' অস্তিত্বের ছায়া অবশ্যই উপন্যাসে পড়তে শুরু করল। রাডারটি আবর্ত-পঙ্কিল জলরাশি থেকে তুলে আনতে চেষ্টা করছেন ঔপন্যাসিকেরা— এ সত্য সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অসীম রায়ের উপন্যাসে স্পন্দিত। তবে সে আলোচনার জন্য পৃথক শিরোনাম প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণের অন্তঃপুরে

[কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে]

ঊনবিংশ শতকে সামাজিক রূপান্তরের যতটুকু প্রক্রিয়া যেখানেই ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে তার মৌল প্রেরণা এসেছে দেশাচার বা শাস্ত্রাচার নির্দিষ্ট ছকের বিরুদ্ধ ব্যক্তির বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। বিদ্রোদ্ধত ছাত্রই হোক, অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী মনীষীই হোন, তাঁরা তাঁদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান খুঁজেছিলেন, খুঁজে-ছিলেন আপন আপন ব্যাখ্যামত পুরুষার্থ— সনাতন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। এর ফলাফল যাই হোক একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নতুন কালের এই পুরুষার্থ সন্ধান অনেকটা নাগরিক আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির ব্যগ্রতায় সমগ্র দেশ পট থেকে অনন্বিত হয়ে পড়ছিল। এ জাতীয় নয়, কিন্তু এ ধরনের প্রাচীন অনন্বয়ের সংকট ভারতীয় ইতিহাসে যখনই তীব্র হয়ে উঠেছে তখনই কোনো না কোনো ভক্তিমার্গী সাধক দেখা দিয়েছেন— আচরণবন্ধনমুক্তির নতুন বার্তাবহ রূপে। ঐশী সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির অন্য নিরপেক্ষ সরাসরি সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে ভক্তি সাধকেরা মন্ময়তার উপর বেশী জোর দিয়েছেন, জাতিভেদের কড়াকড়ি আলগা করতে চেয়েছেন, নারী পুরুষের সাধনাধিকারের সাম্য কিছুটা স্বীকার করেছেন। এমন কথা বললে খুব ভুল হবে না যে, ভক্তির পংক্তিতে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদ রেখাও এঁরা মুছে ফেলতে চেয়েছেন। যে উপজাতীয়েরা হয়তো বর্ণীয় হিন্দুর শাস্ত্রকথার কোনো কিছু জানে নি, তাঁর গোষ্ঠীর কাছেও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নাম ও ভূমিকা অজানিত ছিল না। ভাতের হাঁড়ির জাতের পাতি এভাবে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। 'কভু উদ্ধারণ রাঁধে নিত্যানন্দ খায়। কভু নিত্যানন্দ রাঁধে উদ্ধারণ খায়' —এ জাতীয় একটা নতুন বিধি প্রবর্তনের প্রয়াস ভক্তি আন্দোলনের দান। ভক্তি আন্দোলনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— বিষয়াসক্তকে উপেক্ষা। ধনাভিজাত্যকে অবজ্ঞা। যেভাবে চৈতন্যদেব রূপের গা থেকে দামী কম্বল ছাড়িয়েছিলেন এবং রাজপুত্রোপম রঘুনাথের

দেশের বাড়ি থেকে আসা অর্থসাহায্য গ্রহণে বাধা দিয়েছিলেন তা তো এখানে স্মরণীয় বটেই, আমরা এই সূত্রেই পৃথকভাবে স্মরণ করতে পারি রামপ্রসাদের সেই সব বিখ্যাত পদ, যেখানে তিনি সমকালীন ধনাহঙ্কারের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সেসব পদে তিনি সামাজিক বৈষম্যের চিত্রটি প্রকট করেছেন, এটা বড়ো কথা নয় — বড়ো কথা এটাই যে, ভক্তিবাদী দেখিয়েছেন, যাঁরা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রে, শোষণ ক'রে, মিথ্যা ডিক্রি জারি ক'রে ধনী হয়েছেন তাঁরা ঐশীসত্তাকেও ঘুষ দেবার মতো দুর্নীতির কথা ভাবতে পারেন। প্রকৃত ভক্তিবাদী জানেন এই সব শ্রেণীর মানুষেরা তাঁদের যাগযজ্ঞ আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে ঐশীসত্তার সঙ্গে মিলনের পথ বন্ধ করতে চান। ভক্তিমার্গীরা আর দুটো কাজ করেছিলেন যাদের সামাজিক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক, সকল বর্ণের— বিশেষত উচ্চবর্ণেতর মানুষের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের মর্যাদাবোধ এনে দিলেন। জীবিকা জীবনের বৃহত্তর স্বীকৃতি অর্জনের পথে বাধা নয়। চৈতন্যদেব যেদিন হরিদাসকে কোনো শ্রাদ্ধবাসরের অগ্রদানী নির্বাচন করেছিলেন সেদিন তিনি ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে জন্মসূত্র ছিঁড়ে ফেলার পথে এক পদ এগিয়েছিলেন। দ্বিতীয় গুরুত্ব সুদূর প্রসারী পরিণামের রচয়িতা। কথাভাষার প্রতি অনুরাগ ও তার উপর নির্ভরতার ফলে সেই ডায়ালেক্‌টের যারা পালয়িতা ও রক্ষক তাদের ধ্যান ধারণা ভাবনা আবরণ সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এবং একটু কমজোর গলায় আরেকটা কথাও বোধ হয় বলা চলে। অন্তত বৈষ্ণব আন্দোলন ভক্তভগবানের নতুন সম্পর্ক রচনা করতে গিয়ে গ্রামীণ এলিটদের প্রথানুবর্তী স্ট্রাক্‌চারে খানিকটা ভাঙন ধরিয়েছিল।

এ কথায় কোনো ভুল নেই যে ভক্তি আন্দোলন সমাজ বিপ্লব নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ এ ব্যাখ্যায় অভ্রান্ত যে মরমী সাধকদের মর্মগ্রাহী বার্তা যে-বিপ্লবের কথা বলেছে তা 'মিরার রেভল্যুশন' মাত্র। ভারতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌল পরিবর্তন ব্যতিরেকে তা শেষ পর্যন্ত esoteric থেকে গিয়েছে। অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'মডার্ণ ইণ্ডিয়ান কালচার' নামক গ্রন্থে ভক্তি সাধকেরা প্রথাবদ্ধ হিন্দু জীবনের পরিবর্তনে যে প্রয়াস করেছিলেন তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ভক্তি সাধকেরা আচার আচরণের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, বর্ণীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ডি. পি. জী. দেখিয়েছেন যে ভক্তি সাধকেরা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ব্যবধান কমিয়ে এনেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভক্তিসাধকেরা ছিলেন

চমৎকার প্রতিবাদ। তাঁরা তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যে পর্দাপ্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েদের ভক্তির ক্ষেত্রে অধিকার তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। আমরা ভুলতে পারি না যে, ভিন্নশাখ বৈষ্ণবদের মধ্যে পুনর্বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ দুই-ই সম্মতি পেয়েছিল। পুরোহিতবাদ সেখানে নিরুৎসাহিত হয়েছে। যদিও একথা সত্য যে, ভক্তিবাদীরা কিছুটা পরিমাণে বুদ্ধিবাদের বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, লৌকিক ভাষায় নতুন সৃজনীক্ষমতার জোয়ার এসেছে মধ্যযুগের ভক্তিবাদেরই টানে। তাহলেও এ প্রশ্ন আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাউকে কাউকে বারে বারেই পীড়িত করেছে যে, বিপুল গণতান্ত্রিক ভক্তি আন্দোলন (The great democratic Bhakti Movement) মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল তা কিন্তু ইংরেজ আমলের আগেই নিজে পরিণত হয়েছিল কনভেনশনসের চর্চার করুণ পম্বলে। আমাদের আধুনিক গবেষকরা তার উত্তর খুঁজেছেন তিন জায়গায়। প্রথম, শুরু থেকেই ভক্তি আন্দোলন ধর্মীয় সীমাবদ্ধতায় ভুগেছে— ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ব্যাপকতা সে অর্জন করেনি। দ্বিতীয়ত, ভক্তি আন্দোলন ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের জন্য কোনো সামাজিক বা ন্যূনতম অর্থ নৈতিক বিকল্প কর্মসূচী স্থাপন করেনি। মুক্তির জায়গায় আবেগকে বসাতে গিয়ে জট আরো পাকিয়েছে। তৃতীয়ত, এই আন্দোলন থেকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করেছে— কিন্তু স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যুঝতে পারে এমন কোনো সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সংগঠিত হয়নি। বিপিন পালের সময়ে বাংলাদেশে যে নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার প্রমুখেরা সে আন্দোলনে চৈতন্যদেবকে সামাজিক মুক্তির বার্তাবহ রূপে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন কতকটা জাতীয় জাগরণের তাগিদে। এ প্রয়াসের গূঢ় ঐতিহাসিক তাৎপর্য অবশ্যমান্য, কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপট স্মরণে রাখলে দেখা যাবে, ভক্তি আন্দোলনে অভাব ছিল দৃঢ়তার— যা থাকলে বর্জনের শক্তি জন্মায়। সমাজ-মুক্তির স্বপ্নদেখব অথচ অথচ বিরোধী শক্তির চারিত্র্য নির্দেশে অধিকতর কঠোর হব না— এর,একমাত্র পরিণতি হ'ল বর্জন অপেক্ষা আপোষের উপরবেশী নির্ভর করা। তাই শেষ পর্যন্ত সর্ববর্ণীয় পংক্তি ভোজনের সাধু সংকল্প চিঁড়ে দইয়ের কলারে সীমাবদ্ধ থাকে। ভক্তির বিরাট গণতান্ত্রিকতা তিন পুরুষ যেতে না যেতেই মীষ্টিক সাধকদের এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটোনো কতকগুলি গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে— মূল ধারা থেকে দূরবর্তী তো বটেই, এমন কি বলা যায় আপন মীষ্টিক চর্চায় আরো বেশী esoteric হয়ে যায়। নিজেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কাছে

মজুরী পেতে গিয়ে ভক্তিমার্গীরা সমন্বয়ের পথ ধরেছেন। শাখা-প্রশাখা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো নিবিষ্ট হয়েছে বুদ্ধিবাদ বিরোধী ভাব-সাধনার অন্তর্মুখিতায়। তবু বলার কথা এটা নিশ্চয় যে, এই শাখা-প্রশাখা বলতে আমরা যাঁদের বুঝছি, তাঁরাই কিন্তু হিন্দু সমাজের শ্রমজীবী অংশকে আঁকড়ে ধরেছেন; এবং শ্রমজীবী সমাজও এঁদের ভক্তিবাদের প্রথাবিমুক্ত গণতান্ত্রিক আলিঙ্গনে স্বস্তি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞাপিত নয় এমন একটি কবিতা এখানে মনে পড়ে। গীতিমাল্যের ১৩ সংখ্যক কবিতাটি বলে একদল কৃষিজীবীর কথা। সন্ধ্যাবেলা কাজের হাত থেকে তারা ছুটি নিয়েছে। এ সময়ে তারা আর কারো খাতক নয়, দেনদার নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে তারা অন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ভক্তি আন্দোলন দিতে চেয়েছে এই স্বাধীনতা।

দুই

এই প্রেক্ষাপটে আমরা যখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সামাজিক তাৎপর্যটি বিচার করতে অগ্রসর হই তখন আমরা প্রথমেই স্পৃষ্ট হই গুটিকতক অভিনবত্বে— সম্পূর্ণ নতুন কতকগুলি অনন্যতায়। ইনি একজন এমন ভক্তিমার্গী সাধক যিনি গেরুয়া পরেন না। এই প্রথম দেখলাম একজন ভক্তিসাধক – যিনি নাপিতের কাছে নিয়মিত দাড়ি কামান, যিনি গায়ে বোতাম আঁটা জামা চড়ান, পায়ে দেন বার্নিশ করা জুতো, দরকার হলে পরেন মোজা। শীতে ব্যবহার করেন কম্বল নয়—মোলেস্কিনের র‍্যাপার। তিনি টিকিট কেটে অথবা ফ্রী পাসে পাবলিক থিয়েটারের সীটে বসে থিয়েটার দেখেন। হয়তো শহরে আগত সার্কাসের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। তাঁকে যেসব ঘটনায় ভাল করে বোঝা যায় সে রকম একটা ঘটনার উল্লেখ করি:

> গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজ টোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুই দিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বললেন, "আমার জল তৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?" কি করা যায়! নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ী থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্লাসটি ধোয়া তো?" নন্দলাল বলিলেন, "হ্যাঁ।" ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন। (কথামৃত। প্রথমভাগ—দশম পরিচ্ছেদ)

উদ্ধৃত অংশের ব্যঞ্জনা দুটি। এক, উনবিংশ শতকীয় জীবনযাত্রার নবলব্ধ কলকেতিয়া ছবি রামকৃষ্ণকে বিমুখ করেনি। দুই, পিপাসা মিটানোর জন্ত তাঁকে জল এনে দেওয়া হলে তিনি কাঁচের গ্লাসে আপত্তি করেননি— জল কোথা থেকে আনা হয়েছে সে প্রশ্নও করেন নি— কেবল একটি স্বাস্থ্যবিধিসম্মত প্রশ্ন করেছেন— গ্লাসটি ধোয়া কি না। পৃথকভাবে লক্ষণীয়, তিনি বুদ্ধ বা চৈতন্তের মতো পত্নী পরিহার করেন নি। বরং পত্নীকে নিজ সিদ্ধির সহায় করেছিলেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চলিষ্ণু মানব সত্তার স্বভাবগত স্ববিরোধটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। জামা চাদরে যাঁর আপত্তি ছিল না, সেই রামকৃষ্ণই দেবেন্দ্রনাথ কেতাদাকিক যখন অনুরোধ করেছিলেন, 'ধুতি আর উড়ানি পরে এসো' তখন বলেছিলেন, 'আমি বাবু হতে পারবো না।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাজসকাশের প্রথানির্দিষ্ট বিদেশী পোষাক প্রত্যাখ্যানের যে কাহিনী আমরা জানি, তারই সমমূল্যের এই ঘটনা সামাজিক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্ত কিছুর সংযোগে রামকৃষ্ণের যে ভাবমূর্তি রচিত হয়, তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালি গৃহস্থ ভদ্রলোকের ভাবমূর্তি— যিনি ঠিক শহরে থাকেন না, কিন্তু শহরকে ভালবাসেন না এমনও না। তিনিও ঠাকুর, 'টেগোর' নন। তিনি মূলত পুরোহিত বটে, কিন্তু পৌরোহিত্য তাঁর 'ফোর্টে' নয়। তিনি বক্তৃতা করেন না, তিনি উপাসনা পরিচালনা করেন না। লেকচারে তাঁর গভীর অনীহা, তিনি চেয়ারে বসে, তক্তাপোষে বসে বা মাটিতে বসে গল্প করেন —যার প্যাটার্নটা শ্রেষ্ঠার্থে গ্রামীণ। অর্থাৎ তিনি কিছুতেই পৃথক হবার জন্ত ব্যস্ত ছিলেন না। বরং বাহরে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'আমার কোন শালা চেলা নেই। আমিই সকলের চেলা।' বাইরের দিক থেকে সকলের সঙ্গে মিশে যাবার জন্তই যেন প্রয়াসী ছিলেন। ঠিক এই ইমেজটাই তখন খুব দরকার ছিল।

কারণ সে একটা সময় যখন কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ বুঝতে পারছিলেন কোথায় একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে, সে একটা সময় যখন রামমোহনের মুক্তির তত্ত্ব ও মুক্তি ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিকতায় আটকে যাচ্ছিল, সে একটা সময় যখন জ্ঞান এবং আবেগ পরস্পরের ছায়ায় জড়াজড়ি করছিল, যখন উপলক্ষ্য প্রায়ই লক্ষ্যকে চাপা দিচ্ছিল, যখন অন্তঃসারশূন্য কর্মের ধূম্রধারাকায়

ধর্মের স্রোত শুকিয়ে যাবো যাবো করছিল, তখন এই ইমেজটির দরকার ছিল— আমাদের ঘরের মানুষের, এত দিনের চেনা ছায়াটি যাঁর মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে। আমরা লক্ষ না করে পারি না, রামকৃষ্ণ এমন একটি আসর বসাতেন যেখানে বক্তা ও শ্রোতার সমান অধিকার। শ্রীম লিখিত রামকৃষ্ণ কথামৃতের অনেক জায়গায় দেখা যাবে ভক্ত শ্রোতা বক্তার উদ্দেশ্যে 'কুইক রিপার্টি' ছাড়ছেন। তাতে আসরের ভারলাঘব ঘটছে না। সে এক বিচিত্র জমায়েত, সমাগত কথামৃত পিপাসুরা যেখানে অমৃত বিতরণকারীকে 'মশায়' বলে কথা বলতে পারতেন – সম্বোধনটি যে উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামীণ নাগরিক বাঙালি গেরস্থ ভদ্রলোকের পারস্পরিক সম্বোধনরীতি।

তিন

রামকৃষ্ণ বলেছিলেন— 'আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকশ্চার।' এটা রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত একটি ইমেজ। অসাধারণ এই ইমেজটির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসম্মত এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে। এই ইমেজের 'ভেহিকল' ও 'টেনর' দুই থেকেই রামকৃষ্ণকে ভারী চমৎকার বোঝা যায়। দশমূলের জায়গায় ফিবার মিকশ্চারের কথাটা উঠেছিল 'শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কই'?— এ কথা বোঝাতে গিয়ে। কিন্তু 'ফিবার মিকশ্চার' ইমেজটি অসাধারণ। রামকৃষ্ণ নিজেই কি সেই ফিবার মিকশ্চার নন? রামকৃষ্ণের ঘর এবং বাগানের বর্ণনাটি এখানে স্মরণীয়। সে বাগানে গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ যেমন আছে, কৃষ্ণচূড়া, রক্তকরবীও তেমনি আছে। তার ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি আছে আবার 'পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন' সে ছবিখানিও আছে। বুদ্ধদেবের একখানি প্রস্তরময় মূর্তিও আছে। বস্তুত এটাও রামকৃষ্ণের ভাবমূর্তির মধ্যেই পড়ে। তিনি এক আশ্চর্য হিন্দু, যাঁর কাছে ব্রাহ্মরা সহজেই চলে আসতে পারতো। যিনি নিজে মুসলমান এবং খ্রীস্টান ধর্মের অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে সেই সেই মতের সাধনপদ্ধতি অনুধাবন করেছিলেন। রামমোহন বলেছিলেন, কোনো ধর্মগ্রন্থ একা অভ্রান্ত নয়। আর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, যত মত তত পথ। এই দুইয়ের মধ্যে অমিল যতটা মিল তার থেকে বেশী। রামকৃষ্ণ সকলের ভাবের স্বাতন্ত্র্যকে

সম্মান করতেন। এই সম্মান করতে পারার শক্তিটা একেবারে আধুনিক মনের প্রকাশ। যে অর্থে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের বিশেষ আড়ম্বর করে খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাঁইবোর্ট (Sign board) মেরে নিজেকে বড়ো সাধু বলে জানায় তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি নি', সেই অর্থে রামকৃষ্ণ আধুনিক মানুষ। কিবার মিকশ্চার যেমন দ্রুত জ্বর ছাড়ায় রামকৃষ্ণ তেমনি চেয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর যে সব মানুষগুলি সোজা রথ উল্টোরথের নানা টানাটানিতে তাপগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের তাপ ঘোচাবার এবং পথ্য প্রদানের আশু ব্যবস্থা করতে।

সেইজন্যেই রামকৃষ্ণ এমন একটা ভাষা ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছিলেন যা প্রাণবন্ত ইমেজে পূর্ণ। প্রথমেই লক্ষণীয় তিনি একেবারেই লেক্‌চার রেজিস্টার ব্যবহার করেন নি। বেদী থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা এগুলো নয়। যে শ্রেণী তাঁর সম্মুখে হাজির ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল আটপৌরে এ্যাভারেজ গেরস্থ মানুষ। তাদের আচার্যের কাছ থেকে শোনা তত্ত্বকথায় শানাবে না। সংস্কৃতগন্ধী এলিগেণ্ট বাংলাতেও তাদের শানাবে না। কিন্তু বাংলা ভাষার আর একটা ধারাও তো ছিল— আলালী ভাষা বা হুতোমী ভাষা। রামকৃষ্ণ সে ভাষা-রীতিকে গ্রহণ করলেন না। আলালী ভাষা এবং হুতোমী ভাষা সোজা ভাষা বটে, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই তার নাগরিক আত্মসচেতনতায় এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সফিস্টিকেশনে। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাষা শুধু সহজ নয়, তা গভীর ভাষা। সচেতনতা তার লক্ষ্য নয়, সংক্রমণই তার লক্ষ্য। শ্রেষ্ঠার্থে এক স্নেহশীলা গ্রামীণ নারীর বাগ্‌ভঙ্গি রামকৃষ্ণের ভাষার মধ্যে লক্ষণীয়। আপাত এবং নিহিত এ ভাষা যে শুধু সরলতা ও গভীরতাকেই একাধৃত করেছে তাই নয়, অষ্টাদশ শতকের আরেক ভক্তিসাধক রামপ্রসাদের মতো এ ভাষারও প্রধান গুণ সমকালীন জীবন থেকে ইমেজের ভেহিকল (Vehicle) খুঁজে পাওয়া। এটা এক অর্থে আধুনিক জীবনকেই স্বীকৃতি। রামকৃষ্ণ যখন বলেন :

(ক) যেমন ফুটপাতের গাছ ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

(খ) দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই।

(গ) এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে

কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (Stick) এই সব এসে জোটে, রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস্ দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে।

(ঘ) জাহাজ একবার কালাপানিতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না।

(ঙ) সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়।

(চ) বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

(ছ) ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বুক টানে না।

(জ) আজকালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার।

(ঝ) চাপরাশ থাকলে তবে লোকে মানবে।

(ঞ) ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে তা হলে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, সবই দেখতে পায়। কথাটা এই এখন কলকাতায় কেমন করে আসি।

এই অসমাপ্ত তালিকা আমাদের দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ সেই গ্রামীণ মানুষটি, নতুন কালের জীবনকে নিজ বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। সিম্বলিক ট্রান্সফর্মেশন অফ এক্স্পিরিয়েন্স—অভিজ্ঞতার প্রতীকী রূপান্তর ঘটে মানবিক অবিরাম স্বতঃস্ফূর্তিতে সুসান ল্যাঙ্গারের এই সূত্রদীপ্তিতে যদি আমরা রামকৃষ্ণের নাগরিক উপাদানে নির্মিত পূর্বোক্ত চিত্রকল্পগুলকে ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখি সেই স্বতঃস্ফূর্তির মধ্যেও আছে চিন্তাকে চেতনে অবচেতনে সংগঠিত করার ব্যাপারে বিস্তারিত পটভূমির দান। 'ঙ' চিহ্নিত চিত্রকল্পটি অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের গানের কথা— 'সব আলোটি কেমন করে / ফেল আমার মুখের পরে /তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে' (গীতবিতানের 'পূজা'র ৪২ সংখ্যক গান) ভক্তির 'টেনর-'টি ছুআয়গাতেই এক হবার ফলে, ভেহিক্ল্-এর এই

সাদৃশ্য ঘটেছে। এ থেকে আর একটা বিষয় বোঝা যায়। সক্রিয় চিন্তায় রূপান্তরিত হবার অনেক আগে এরা ধারকের মনোলোকে জারিত হয়েছে। যে সমৃদ্ধ স্মৃতিলোক ও অবচেতনলোক বড়ো কবির বৈশিষ্ট্য, সেটা রামকৃষ্ণেরও বৈশিষ্ট্য। রামকৃষ্ণের কলিকাতাভ্রমণের অভিজ্ঞতা একটু আগে যা উদ্ধৃত করেছি অনুমান হয় সে জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর স্মৃতিতে সংহত হতে থেকেছে এবং উপযুক্ত মুহূর্তে তাঁর অনুভূতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য অন্বয়ে মুক্তি পেয়েছে। তাঁর চিন্তা কত সক্রিয় ছিল এ তার প্রমাণ। '৬'-চিহ্নিত চিত্রকল্পটিতে একসঙ্গে একাধিক অর্থের নানা ছায়া আশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'এত আলো জ্বালিয়েছ' গানটির উৎসবের পটভূমি তাতে নেই। থাকার কথাও নয়। 'আঁধারে' শব্দটির উপর প্রাধান্য পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তা হয়ে যায় রামকৃষ্ণ-অভিপ্রেত অভক্তি ও জ্ঞানবাদীদের তর্ক বিতর্কের জটিলতার অন্ধকার। কিন্তু শেষ বাক্যটি গভীর আশ্বাসবহ। সে সকলের মুখ দেখতে পাবে। এই মনোজ্ঞ আশ্বাসটি সমগ্র রামকৃষ্ণ। কিন্তু এ বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত মূক হয়ে যায় শুধু ছবিটির দিকে তাকিয়ে। উদ্ধৃত ইমেজগুলির একটা সীমাবদ্ধতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয়। নাগরিক উপাদানে ব্যবহৃত ইমেজগুলির মধ্যে নাগরিক চরিত্রের দেখা বিশেষ মেলে না—যদি বা দু এক ক্ষেত্রে মেলে, তা তাঁর সম্মুখবর্তী ভদ্রলোকদের অভিজ্ঞতাকে লঙ্ঘন করে যায় না। কিন্তু এমন ব্যাপারটি তার গ্রামীণ ইমেজগুলি সম্বন্ধে ঘটেনি। সেখানে বারে বারে দেখা দিল কামারশালার ইমেজ, দেখা দিল রংরেজের রঙের গামলার ইমেজ। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ খেটে-খাওয়া কৃষকের ইমেজ, পরিশ্রমী মেয়েরা চিঁড়ে কুটছে তার ইমেজ প্রমাণ করে রামকৃষ্ণের পশ্চাৎপটের আত্যন্ত অখণ্ড ব্যাপকতা। রামপ্রসাদের মতো তিনি অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত কৃষকের রূপক ব্যবহার করেন নি। যখন ভাবি জমিদারের পক্ষে সাক্ষী না দেবার জন্য তাঁর পিতাকে স্বগ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছিল, তখন তাঁর এই না-করাটি একটু বিস্ময়কর লাগে। কিন্তু একটা কথা সত্য, তাঁর ব্যবহৃত গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের উপাদানে রচিত প্যারাবলগুলিতে মানুষের যে ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে তা হল গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের এনডিওরেন্সের মূর্তি। কার না মনে পড়বে সেই কৃষকের গল্প যে তার জমিতে চাষের জন্য জলসেচ করে চলেছে সারাদিন ধরে অভুক্ত অস্নাত অবস্থায়। সেচের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তার ঘরের লোকজন কারো কথায় কর্ণপাত করেনি। আমাদের অবশ্যই মনে পড়ে পুত্রশোকাতুর সে চাষাটির কথা। গ্রামের শ্রমজীবন থেকেই রামকৃষ্ণ তুলে নেন এই চমৎকার জীবন-

চিত্রগুলি :

(ক) চাল কাঁড়ছো একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হলো। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয় ?

(খ) যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়— সেটুকু পার হয়ে গেলে আর হয় না। যদি বাঁক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে।

(গ) দেখো,— ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাস যোগ। কিন্তু পনর আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাত পড়ে যায়।

(ঘ) মাখন যদি চাও তবে দুধকে দই পাততে হয়। তারপরে নির্জনে রাখতে হয়। তারপরে দই বসলে পরিশ্রম করে মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।

প্রত্যেকটি এ জাতীয় চিত্রকল্পের আপাত অর্থের আড়ালে রয়েছে রামকৃষ্ণ প্রদত্ত কেন্দ্রীয় অর্থটি। গাড়ির চাকার অরের মতো তা চাকার দণ্ডগুলিকে ধরে রয়েছে। সেটা হল প্রত্যেক মানুষ তার শ্রমের নিষ্ঠার ক্ষেত্রে একাকী— এটাকেই তিনি রূপকায়িত করেছেন।

রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ইমেজগুলি তাঁর বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সংগঠিত স্মৃতি-শক্তির নিদর্শন মাত্র নয়, তা তাঁর তাৎপর্য-তৎপর মানসিকতার পরিচয়ও বটে। গ্রামজীবনের নানা প্রসঙ্গ তাঁর নির্মল চিত্তমুকুরে ঈপ্সিত অনুষঙ্গ বহন করে এনেছে। চিল বা শকুন হয়ে উঠেছে বিষয়াসক্ত লোভীর প্রতীক। গিরগিটি হয়েছে বহুরূপী সত্যের প্রতীক। মাছ, জাল, জল সহজেই তাঁর কাছে হয়ে ওঠে মুক্তি ও বন্ধনের প্রতীক।

চার

রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত অনেকগুলি প্যারাবলে তখনকার গ্রামীণ মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার নিজস্ব প্যাটার্নের ছায়া পড়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় তিনি

একান্নবর্তী পরিবারের মাতৃকেন্দ্রিক রূপটিকে ব্যবহার করেছেন। বাড়িতে মাছ এসেছে, মা তাঁর এক এক সন্তানের জন্ত এক এক রকম ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করছেন; আবার কোথাও বা বাড়ির বড়োছেলে বেকার অবস্থায় বসে থেকে সকল কাজের বাইরে চলে গেছেন— শুধু কুমড়ো কাটার কাজেই তাকে লাগে; একটি ইমেজে গর্ভবতী গৃহস্থ বধুর সঙ্গে তার স্নেহময়ী শাশুড়ীর সম্পর্কের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমস্তই প্রমাণ করে যে, রামকৃষ্ণের মনোজগতে গ্রামীণ সংসারের আবহমান কালের বাঁধাধরা রূপটাই বেশি ছায়া ফেলেছিল। মনে হয় গ্রাম এবং শহর দুজায়গাতেই রামকৃষ্ণ স্থিতাবস্থা বা স্টেটাসকুও-র বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। তাঁর সুবিখ্যাত 'আমি কামড়াতেই বারণ করেছি ফোঁস করতে নয়' এক হিসাবে তাঁর সমগ্র সামাজিক দর্শনের প্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তব্য। কেননা কেবলমাত্র ফোঁস করলে যে শেষ অবধি শত্রুকে নিঃশেষ করা যায় না এতো জানা কথাই। অত্যাচারী জমিদারের গল্পও তিনি যখন বলেছেন তখনও শেষ পর্যন্ত সে গল্প রূপান্তরিত হয়েছে জমিদারের প্রতি ক্ষমার গল্পে। সমস্ত ভক্তিবাদীদের মতো রামকৃষ্ণেরও সীমাবদ্ধতা এইখানে যে তিনি কোনো বিকল্প সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা জাহির করতে পারেন নি। তখনকার মানুষ সংসার ছেড়ে সবাই পথে বেরিয়ে পড়ুক এটা রামকৃষ্ণ চাননি। মানুষ সংসারে থাকুক, এবং সেই সঙ্গে ভক্তির সাধনা করুক —এটাই রামকৃষ্ণের মোট বক্তব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন ভক্তিবাদীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অযথা বাড়িয়ে না ফেলি। ভক্তিবাদীরা কেউই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে চাননি। তাঁরা সংসারকে উন্নত করতে আসেন নি। তাঁরা ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন সংসারের বন্ধন থেকে। এই সীমাবদ্ধতার কারণেই অন্য ভক্তিবাদীদের মতো রামকৃষ্ণও বিষয়াসক্ত সংসারের সমালোচনা করেছেন বটে— দেখিয়েছেন 'কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। আমার ঠাকুর কি হবে?' কিন্তু রামকৃষ্ণ বারে বারে বিষয়সম্পন্ন ধনী ব্যক্তিদের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। বড়োলোকের বাগানবাড়ির রূপক, বাবুর ধনসম্পত্তির রূপক, বাবুর চাকরকে দিয়ে হীরের দাম যাচাইয়ের রূপক এ সমস্তই প্রমাণ করে তিনি নাগরিক অথবা গ্রামীণ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের বহুকালগত রূপটিকে মেনেই নিয়েছিলেন। আমরা একথা অবশ্যই মনে রাখি যে তিনি নিজেকে গুরু বলে ঘোষণা করতে চাননি। আচার্য বা গুরু কিছু হবারই অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি মথুরবাবুকে 'বাবু' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য জমিদার বা বড়ো মানুষদের প্রসঙ্গেও তিনি

'বাবু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তিনি বাবু বলতে বাবু শ্রেণীটাকেই বুঝিয়েছেন। যা কিছু বিষয়াসক্তির প্রতীক তাকেই তিনি পরিহার করতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর এবং রিক্ত। তাঁর ভাষাও তাই অংলকাররিক্ত এবং অনাড়ম্বর।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, তাঁর ভাষায় কোনো মানসিক বাধ ছিল না। যে সমস্ত শব্দ ভিক্টোরিয়ান রুচির যুগে, কলকাতার ব্রাহ্ম নাগরিক পরিশীলনের যুগে অশুচ্চার্য ছিল তিনি তা অবলীলাক্রমে বলতেন। 'মাগ', 'ভাতার' 'হাগা', 'মোতা' নির্বিকারচিত্তে তিনি তাঁর বাক্যরাশিতে প্রয়োগ করতেন। একদিক থেকে এটা তাঁর সাধুজনোচিত বিকারহিত অবস্থা বটে, কিন্তু আর এক দিক থেকে তাঁর এই শব্দপ্রয়োগ যেন পরোক্ষে একথা বলে দিচ্ছে, তিনি কলকাতার বাবুসমাজের কেউ নন। তাই তাঁর এই জাতীয় উক্তিপুঞ্জের মধ্যেও কিছু সহজাত গ্রামীণ সংস্কার কাজ করছে। শহুরে বিষয়-সর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও বোধ করি উঁকি দেয়। ভাষায় একেবারে গ্রামীণ বর্ণনাভঙ্গিও লক্ষণীয়—'তেঁতেবুদ্ধি' (তাঁতির বুদ্ধি অর্থাৎ তখনকার লোকপ্রবাদ অনুযায়ী নির্বুদ্ধিতা), 'মেটেভক্তি' (যে ভক্তি টেঁকসই নয়), 'সট্‌কাকল'— মাছ ধরা একরকম ছিপ— 'ঢং কাঁচ' প্রভৃতি নানাজাতীয় গ্রামীণ বাতাবরণসম্ভূত শব্দরাশি তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত কতক-গুলি সমাসবদ্ধ পদও সম্পূর্ণ কথাস্রোত থেকে সংগ্রহ করা। যেমন—'হাড়পেকে', 'কোটরচোখ', 'মুখহলসা' 'ভেতরবুদে', 'কানতুলসে, 'দীঘলঘোমটা' প্রভৃতি শব্দগুলি প্রমাণ করে রামকৃষ্ণের লক্ষ্যভেদী ইমেজসৃষ্টির ক্ষমতা। তিনি বুঝেই নিয়েছিলেন যে, তিনি লিখে কিছু বলার জন্য আসেন নি। ব্রাহ্ম আচার্যদের বেদী থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা অনেক সময়ই কেতাবী ভাষার বক্তৃতা। সেখানে আচার্য এবং শ্রোতাদের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ব্যবধান সকল সময়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু 'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়' অথবা 'কোনো কোনো লোক আছে যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাতভ্যাত করছে', এ সমস্ত কথা বেদী থেকে বলার কথা নয়। এ হল সামনাসামনি বসে রামকৃষ্ণসম্মত আলাপচারণ— যেখানে সকলদের সহাস্য সমানাধিকার। কিন্তু যেখানে থেকেই বলা হোক কথাগুলির শক্ত মেরুদণ্ড লক্ষণীয়। 'উট কাঁটাঘাস বড়ো ভালোবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটাঘাসই খাবে, ছাড়বে না।' এই রূপকের নিজস্ব জোর যুক্ত হয়েছে বাক্যের কাঠামোর শক্তির সঙ্গে। সে কাঠামো একেবারে বহতা

লোকায়ত কথ্যরীতির শক্তিতে অসামান্য ভারসাম্য পেয়েছে। মৌলিক এ ভাষার আত্মস্থ শক্তি। মৌলিক এর আত্মপ্রত্যয়। কোনো প্রকার তুলনা করার অভিপ্রায় থেকে বলছি না— কিন্তু দেখাতে চাচ্ছি চলতি জীবন থেকে উপাদান নিয়ে চলতি বাক্যরীতির ভরসা পেয়ে কেমন প্রত্যয়ী বক্তব্য নির্মাণ করা যায়, 'অচলায়তনে'র দাদাঠাকুরের সংলাপ থেকে তার আরেক সাক্ষ্য মেলে। আমরা স্মরণ করতে পারি এই কথাগুলি—'যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা যদি জিজ্ঞাসা করে 'আলো চাই' ? ছেলে বলে, 'তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।' ঘরোয়া মেটাফোরে বক্তব্য এখানে প্রাণবন্ত। রামকৃষ্ণের ভাষায় এমন প্রাণবত্তারই দেখা মেলে। আমরা শুনেছি রামকৃষ্ণের কথা বলার ভঙ্গি ছিল অন্তর। 'অচলায়তনে'র দাদাঠাকুর বা 'পরিত্রাণে'র ধনঞ্জয়, বা 'রাজা'র ঠাকুরদার বাগ ভঙ্গি তাদের অন্তরতার জন্য বিশিষ্ট ছিল একথা বললে সবটা ঠিক বলা হল না। তবে এ ব্যাপারে কোনো ভুল নেই যে এদেরও বাণীবিন্যাসে ছিল লোকায়ত সহজ সরসতা, ছিল লোকভোগ্য এক প্রকারের 'উইট'— ছিল কথা বলতে বলতে গানের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ। এটাকেই বলা যায় রামকৃষ্ণ-সম্ভব বাচনিক প্রকৃতি। কিন্তু প্রভেদটিই কম নয়। রামকৃষ্ণের কথায় গতি কম। এগুলো যেহেতু লিখিত হবার পর পরিবেশিত হয়নি— তাৎক্ষণিক যে ভাবে এর উচ্চারণ সেভাবেই এগুলি অক্ষরবন্ধন পেয়েছে, সেই হেতু এইসব কথাগুলির স্বরবিন্যাসের মধ্যে সেই ব্যক্তির মানসিক মন্থরতার ছায়া কিছুটা পড়েছে। কথা বলার সময় তিনি সামান্য তোত্‌লাতেন। তাঁর বাগ্‌ভঙ্গির মন্থরতার কারণ এটাও হ'তে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয়, তিনি সেই মন্থরতার মধ্যেই একটা দ্রুত 'মুভ্‌মেন্ট' সৃষ্টি করতে পারতেন না। একটা উদাহরণ দিই :

শ্রীরামকৃষ্ণ—'জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। (সকলের হাস্য)। এক একটা গরু বেছে খায়; তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড় হুড় করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত— নিত্য, লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হুড় হুড় করে

দুধ দেয়।' (সকলের হাস্য)।

মহিমা —'তবে দুধে একটু গন্ধ হয়।' (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে নিতে হয়, তাহলে আর গন্ধটা থাকবে না।' (সকলের হাস্য)।

কথা মুস্কিলে পড়লে কীভাবে সে মুস্কিলের আসান করতে হয় তা উপস্থিত বুদ্ধিসাপেক্ষ তৎপরতার উপর নির্ভর করে। উদ্ধৃত অংশে দেখা যাবে রামকৃষ্ণ তাঁর কথার ছাদ একটুও না পাল্টে, বাগ্‌ভঙ্গির একটুও রদবদল না ঘটিয়ে কথাকে বিপদমুক্ত করলেন।

পাঁচ

যাঁদের কাছে তিনি নিজে যেতেন, যেমন বিদ্যাসাগর, তাঁদের কাছে ভাষার দ্যুতি রচনায় তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা প্রমাণ করে তাঁর সরল গভীরতা। সে গভীরতায় নাগরিক প্রকর্ষও ম্লান করে দিতে পারে। বিদ্যাসাগরের বিনয়ী লোনা জলকে তিনি লহমায় ক্ষীরসমুদ্রে পরিণত করেন। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নি— এ বিবৃতির শক্তিমত্তায় বিদ্যাসাগরও স্পৃষ্ট হন। কিন্তু যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন— রামকৃষ্ণের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি তাদের উদ্দেশ্যেই স্পন্দিত। শোকার্ত, সংসারে জীবনে স্পৃহাবিনষ্ট, অফিস আদালত যাদের ম্লান করে ফেলেছে— যারা সংসার ছাড়তে পারে না, থাকতেও যারা নারাজ, যারা ব্রাহ্মদের মতো কর্মধ্বজ নয়, রক্ষণশীল হিন্দুদের মতো ধর্মধ্বজ নয়, না গ্রহণ না বর্জনে যাদের পুরুষার্থ ইতঃনষ্ট ততঃভ্রষ্ট, যারা অনেকেই ছাপোষা গৃহস্থ— রামকৃষ্ণের গদ্য ও চিত্রকল্প মধ্যবিত্ত সমাজের সেই অংশের জন্য। তাই তিনি জেনেছিলেন— সমবেত সম্মুখস্থের অধিকাংশই অনর্জিত-অহমিকা নাগরিক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। যে তীব্র অস্মিতায় প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুষ্টি— তাঁর সম্মুখস্থ জনতার প্রধানাংশে নরেন্দ্র এবং আর এক আধজন ছাড়া কেউই সে অস্মিতায় চিহ্নিত ছিলেন না। রামকৃষ্ণের গদ্য এঁদের জীবনেরই দর্পণ। সে গদ্যেও কোনো শক্তিমান উত্তম পুরুষ নেই। অতি প্রয়োজনেও রামকৃষ্ণ 'আমি-কে সমূলে উচ্ছেদ করে দেন। এমন কি তিনি 'আমি' 'আমার' শব্দের বদলে 'এখানে' 'এখানকার' শব্দ ব্যবহার করতেন বলে আমরা জানি। বিজয়কৃষ্ণ যখন তাঁকে বলেছিলেন— 'বুঝেছি আপনি কে?' ভাবস্থ রামকৃষ্ণ

বলেছিলেন—'যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।' অস্পষ্টতাকে এমনভাবে সাবলিমেট করার ক্ষমতাই রামকৃষ্ণের দরকার ছিল— তার সম্মুখস্থ শ্রেণীর এটাই ছিল আত্মিক চাহিদা। বৌদ্ধিক চাহিদা ছিল বিবেকানন্দের। কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের বাক্য বিনিময় কম হয়েছে। ভাববিনিময় সেখানে ছিল আসল কথা। সে ভাষার বিবেকানন্দীয় ভাষার মতো বিস্ফোরক হবার ক্ষমতা ছিল না— থাকার কথাও নয়। কেননা বিদ্রোহ-প্রাণ বিবেকানন্দই চেয়েছিলেন সার্বিক 'স্টেটাস কো' ভাঙতে। পরিদৃশ্যমান রিয়্যালিটিতে যে ফ্রাসট্রেশনের স্বরাজ্য তার বিপরীতে বিকল্প কিছু গড়ার প্রস্তাব তাঁরই ছিল। রামকৃষ্ণের ব্যাপারটা তা ছিল না। তাঁর নিরন্তর স্ববিরোধ তাঁর ভাষাতেও ছায়া ফেলেছে। অনেকগুলি প্যারাবলেই দেখা যায় তাঁর বস্তুজ্ঞান শেষ পর্যন্ত নেতিয়ে পড়েছে। বিষয়কে তিনি ঘৃণা করেছেন— বিষয়ীকে নয়। এ নিয়ম সর্বসামান্য হলে যে স্ববিরোধের সৃষ্টি হয়, তাঁর ব্যবহৃত ইমেজ সে পরিমাণে দুর্বল হয়।

তবু আমরা ভুলতে পারি না বাংলা ভাষায় 'দয়ামায়া' এই নিত্যবন্ধ সমাসটির মধ্যে ভেদ তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার তফাত যে তিনি অনুভব করেননি যে, দয়া দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ হয় না। কিন্তু তাঁর অনুভূতির ভূমিকাটিও কম জোরালো ছিল না। এই উক্তিটি অসামান্য— 'আমার জিনিস আমার জিনিস, বলে — সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্ম সমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।' দয়া কথাটিকে সম্পূর্ণ নতুন অর্থে ব্যবহার করলেন রামকৃষ্ণ। এর নামান্তর সহানুভূতি। তাঁর ভাষাও সর্বক্ষনে সহানুভূতিশীল এক মরমী মানুষের ভাষা। যিনি পুরোহিতকল্প আচরণবিধি মানতেন না, অথচ মন্দির ছাড়েন নি, যিনি টাকায় পরম ঘৃণা করতেন কিন্তু টাকাওয়ালাদের ঠাঁই দিলেন, যিনি কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছেন, মাস্টারের হাতে লেমনেড খেয়েছেন, কিন্তু সকল বর্ণের পঙক্তিভোজন মানতে পারেন নি, যিনি ধর্মের ব্যাপারেও নতুন কালকে উপেক্ষা করেন নি আবার পরম্পরাকেও বর্জন করেন নি — তাঁর ভাষা আজও আমাদের টানে অকৃত্রিমতার জন্য। এর উৎস তাঁর হৃদয়। এই আলোকেই তাঁর ভাষাশৈলী বিচার্য।

সকল কথার অন্তে, আমাদের বিতার্কিকতার শেষে, আমরা ভুলতে পারি

না যে রামকৃষ্ণ যখন তাঁর অপরূপ কথাশৈলী বিকীরণ করছিলেন তখনকার সাহিত্যিক গদ্য চর্চিত এবং পরিশীলিত হতে হতে কথাস্রোতের সঙ্গে একটা বড়ো ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি করে ফেলছিল। কথ্যভাষা তখন শুধু মূল্য পাচ্ছিল নকশা লেখকের হাতে, প্রহসনের সংলাপ রচয়িতার হাতে। তা নইলে কাব্যে, মহাকাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ছিল বর্ণীয় আভিজাত্যের মতোই দূরত্ব-সঞ্চারী সাধুভাষার প্রাধান্য। রামকৃষ্ণের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি কথ্যভাষার ভূমিকাকে নৈতিক আভিজাত্য দিলেন। কথ্যভাষা যে শুধু প্রহসন বা নকশার ভাষাই নয়, তা যে গভীরের ভাষাও হতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক সাহিত্যের আসর জমে ওঠার প্রাক্কালে রামকৃষ্ণ সে কথা প্রমাণ করলেন। আমরা যতই রামকৃষ্ণের চারিদিকে সমবেত অনুরাগীদের কথা ভাবি ততই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারেও সচেতন হই। তাঁর নাগরিক মধ্যবিত্ত অনুরাগী দলের মনের চেহারাটাই রামকৃষ্ণের ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। আত্মিক, সামাজিক এবং সাম্পত্তিক দিক থেকে সেই মধ্যবিত্তেরা ছিলেন নানা অচারিতার্থতায় দিশাহারা। তাদের আশ্রয়প্রার্থী মনোভাবের শুশ্রূষা রামকৃষ্ণের একটি প্রধান কাজ ছিল। তাঁর ভাষাতেও সেই শুশ্রূষা এবং সান্ত্বনার একটা ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছে। অভিজাত ভাষা সেখানে একটা মধ্যবর্তী ব্যবধান সৃষ্টি করত। একথার উল্লেখ আগে করেছি যে, রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত সম্বোধনবাচক শব্দগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে গুরুশিষ্যের সম্পর্কগত অভিজ্ঞানসূচক হবার জন্য কোনো ব্যস্ততা তাদের নেই। বরং তা অধিকাংশ সময়েই সখাসন্মিত, সম আসন থেকে উচ্চারিত, কখনো তা জননীসম্মিত স্নিগ্ধতায় অন্তরঙ্গ। এটাই তাঁর সমস্ত ভাষাভঙ্গির মূল কথা। নাগরিক সৌজন্য এবং উচ্চবর্গীয় বাবুয়ানার সম্পূর্ণ বিপরীত এই অন্তরঙ্গতা। চর্যাপদ, বাউল গান বা সহজিয়া সাধকরা যখন কথ্যভাষায় তাঁদের বলবার কথা পরিবেষণ করেছেন তখন তাঁদের সামনে এরকম একটা শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ছিল না। এখানেই রামকৃষ্ণের পরিস্থিতিগত অনন্যতা যে, রামকৃষ্ণকে সে জায়গায় খুবই কঠিন এবং প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়ে তাঁর বলবার কথা শোনাতে হয়েছে। শোনাতে শোনাতেই নাগরিকতাকে ঘুম পাড়াতে হবে। সুতরাং সে ভাষাকে পৌঁছতে হবে বুদ্ধি নিরপেক্ষভাবে। তাই রামকৃষ্ণের ভাষা নাগরিক ভাষা নয়। কিন্তু গ্রামীণ অনড়তাও তাতে নেই। প্রশান্তির মধ্যে 'মুভ্‌মেন্ট' সে ভাষার প্রধান গুণ।

[সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন্ সোস্যাল সায়েন্স থেকে আমার ছাত্রী ঈপ্সিতা চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে দেখার সুযোগ ঘটেছে 'কথামৃত এ্যাজ এ টেক্স্ট—টুওয়ার্ডস্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং অফ রামকৃষ্ণ পরমহংস'— শ্রীসুমিত সরকারের এই পেপারটি। সুমিত সরকারের কাছে ও ক্রেসিডা গবেষণাকেন্দ্রের জন্য প্রস্তুত একটি রচনার জন্য পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি এই প্রবন্ধের ব্যাপারে বিশেষভাবে ঋণী। তাছাড়া ব্যবহার করেছি স্বামী সারদেশানন্দ লিখিত চৈতন্যজীবনী। রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ দুই খণ্ড, কথামৃত তো বটেই। প্রয়োজনীয় প্রধান গ্রন্থ— যা এ প্রসঙ্গে অবশ্য পাঠ্য তাদের কাছেও ঋণ পেয়েছি। তবে মতামতের দায়িত্ব সব আমার।]

পরিশিষ্ট

আলাপনী— হোসেন মিঞা প্রসঙ্গে

[ধরা যাক এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা একদিন অবসরে সাহিত্যালাপ করছেন। ধরা যাক যে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ পেরিয়ে মানিকবাবুতে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবং ধরা যাক, মানিকবাবু তাঁদের প্রিয় লেখক—]

অ॥ আপনারা, যারা মনে করেন যে আপনারা সব নিরপেক্ষ সমালোচক শেষ অবধি কিন্তু আমাদের শিরঃপীড়ারই কারণ হয়ে ওঠেন।

আ॥ অভিযোগটা জবরদস্ত, কাজেই একটু বিস্তারিত করে বলুন।

অ॥ এক নম্বর, আপনারা কেউ কারো সঙ্গে একমত নন। আর সকলে যা বলছে তার উল্টো কথা বলাকেই মনে করেন নিরপেক্ষতা।

আ॥ আপনি একটি খাঁটি ভদ্রমহিলা 'তা' না' হলে সকলের সঙ্গে একমত হবার জন্য এত ব্যস্ত কেন। তাছাড়া সাহিত্যতত্ত্ব কি বাজার-দর যে একবার বেঁধে দিলে আর তার খেলাপ চলবে না?

অ॥ বাজার-দর হিসাবেই আপনারা বেঁধে দিতে চান, শুধু—

আ॥ আপনারা জবরদস্ত ক্রেতা বলেই আপনাদের মনের চোরা-বাজারে বাঁধাদরের খেলাপ ঘটে।

অ॥ বটেই তো। নইলে দেখুন না কেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'কে মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা সত্ত্বেও আমাদের 'পদ্মানদীর মাঝি'কে অতখানি ভালো লাগে কেন?

আ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান, এমন একটা বিবৃতি দিলেন যার প্রতিটি অক্ষরই পরীক্ষণীয়! কে বলেছেন যে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' মানিক-বাবুর চমৎকার বই।

অ॥ বিষ্ণু দে বলেছেন। এমন কি মোহিতলালও বলেছেন।

আ॥ আর 'পদ্মানদীর মাঝি' যে আপনাদের ভালো লাগে তার প্রমাণ কি?

অ॥ গোটা বারো সংস্করণই তার প্রমাণ।

আ॥ তার কারণ অবশ্য এ নয় যে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের

ইতিকথা' অপেক্ষা সুলিখিত বই। বরঞ্চ কারণটা এই যে 'পদ্মানদীর মাঝি' অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং বই। এবং জানেন নিশ্চয় যে ইন্টারেস্টিং হওয়াটাই আর্টের মুখ্য মাপকাঠি নয়। পদ্মার মাঝিদের জীবন, পূর্ববঙ্গের ভাষা, কপিলার প্রেম, কুবেরের অদৃষ্ট সবই অজানিত— পূর্ব ব্যাপার। কাজেই যে লোভে বাঙালি ভদ্রলোক পূজায় কিংবা বড়দিনে দেশভ্রমণে যান সেই লোভেই পদ্মাপারের কাহিনীও জনপ্রিয় হয়। যা দেখি নি তা দেখব, যা জানি নি তা জানব।

অ॥ আপনার সমস্ত কথাটাই মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেননা পূজায় অথবা বড়দিনে যে বাঙালি ভদ্রলোক দেশভ্রমণে যান তিনি জীবনাগ্রহী নন, কিংবা তার অভিষ্ট জীবন নয়, একথা ধরে নেবার অর্থ কী? কলকাতার ওপর ভর করে এ যুগে কটা বড় উপন্যাস লিখিত হয়েছে, আর কলকাতা থেকে দূরের জীবনকে, বিষয়কে নিয়ে কটা উপন্যাস লেখা হয়েছে তার হিসেব করেছেন কখনো?

আ॥ আকবর বাদশা মূর্খ ছিলেন বলে সব মূর্খই আকবর বাদশা নয়। কলকাতা থেকে কতখানি দূরে, তার ওপরে বই কতখানি ভালো নির্ভর করে না।

অ॥ তাহলে কি আপনার তর্ক অনুসারে এই কথা মেনে নিতে হবে যে 'পদ্মানদীর মাঝি' উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি নয়— কেননা সেটা ইন্টারেস্টিং?

আ॥ উঁহু। বলা হচ্ছে যে ইন্টারেস্টিং বলেই 'পদ্মানদীর মাঝি' ভালো বই কথাটা ঠিক নয়। একটা বইকে ভালো বলতে পারেন, অথবা খারাপ বলতে পারেন, কিন্তু ঠিক ভাবে, ঠিক পদ্ধতিতে বলতে হবে।

অ॥ একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

আ॥ 'পদ্মানদীর মাঝি'র কথাই ধরা যাক। এটা ইন্টারেস্টিং বহু কারণে হতে পারে। সে বহুত্বটা আবার নানা জনার ওপর নানাভাবে নির্ভর করে। কারো কাছে বইটা মালাকে ফেলে কুবের পালালো এ-কারণেও চিত্তাকর্ষক বলে মনে হতে পারে; যেমন কারো-কারো কাছে মনে হয়েছে যে বইটা বোধহয় পদ্মাপারের ভাষার জন্যই জনপ্রিয়। অবশ্যই একটা উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি নানা ধরনের লোকের কাছে নানাভাবে মূল্যবান বলে মনে হবে— এটা তার উৎকর্ষেরই একটা লক্ষণ। কিন্তু সেটা কেন উৎকৃষ্ট এটা বলার সময় আমরা নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ কারণগুলোর কথাই বলব। 'গোরা' কেন ভালো উপন্যাস এটা বলার জন্য নিশ্চয় একথা বলে বসব না যে ব্রাহ্ম আর হিন্দুদের

মধ্যে দলাদলির ব্যাপারটা আসলে যে কিছু নয় এটা বোঝানোর জন্যই বইটা ভালো। সাময়িকতা অথবা আকস্মিকতাকে যেনতেন প্রকারে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব-নিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টার মধ্যে যে বড় সাহিত্যিক প্রয়াস নেই একথা বোঝার বয়স এতদিনে আমাদের হওয়া উচিত।

অ॥ সুতরাং ঠিকভাবে বলতে গেলে নিশ্চয় মানিকবাবুর অদৃষ্টবাদ, তাঁর মানুষের জীবনমরণ সম্বন্ধে নিরাসক্ত এবং নির্বিকার দৃষ্টির কথা গম্ভীরভাবে বলতে হবে।

আ॥ গম্ভীরভাবে নাও বলতে পারেন। কিন্তু বলতে হবে। এবং এই বলার সময় হোসেন মিয়ার কথা ভুললে চলবে না। যে-ভিত্তিভূমির উপর 'পদ্মানদীর মাঝি'র রসকল্পনা দাঁড়িয়ে আছে তা হল হোসেন মিয়া।

অ॥ অথচ আমার মনে হয় 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিয়া এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র যাদব— এদের সৃজনমূলের মনোলোল্য একই ধরনের।

আ॥ একজন আধুনিক সমালোচকও তাই বলেছেন অবশ্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে সেটা ঠিক বলে মনে হবে না।

অ॥ তাহলে আসুন একটু চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ভাবা যাক। যাদবকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আ॥ অত্যন্ত সরলভাবে। যাদব 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চরিত্র। সুতরাং সেও পুতুলদেরই একজন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কারো কোনও স্বাধীন ভূমিকা নেই। যাদবেরও নেই। 'রথের দিন দেহরক্ষা করব' মাত্র এই কথাকে সত্য করে তুলতে গিয়েই তার আত্মহত্যা। আসলে যাদব তার নিজ কর্মেরই শিকার। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় দেখা যায় যে প্রত্যেকেই নিজ বিড়ম্বনা, নিজ ভবিতব্য নিজে রচনা করেছে। একে এবং অপরে মিলে যে জাল রচনা করেছে তার হাত থেকে কারো মুক্তি নেই। যাদবেরও নেই যাদবের ভবিতব্যের হাত থেকে মুক্তি। আর আশ্চর্যের বিষয় আমরা শুধু যাদবের মৃত্যুটাই দেখি। যাদবের মৃত্যুটার তাৎপর্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। মানিকবাবু যাদবের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে— ছাত্রদের ভাষার মাধ্যমে— যা বোঝাতে চাইলেন, তা হল এই যে, যাদব লোকটা কত ভীতু। শশীকে সূর্যবিজ্ঞান মানানোর জন্য সে মরে যাবে। এবং চক্ষুলজ্জায় সে মরণটাকে এড়াতে পারবে না।

অ॥ আমার কিন্তু ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে ইচ্ছে করে না। মনে

হয়, অন্তত উপন্যাসের কাঠামোর দিকে এবং তার চরিত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়েই যাদবের ব্যাখ্যা করা উচিত। এবং তখনই যাদব এবং হোসেন মিয়ার ব্যাপারে মানিকবাবুর বক্তব্য বোঝা যাবে।

আ॥ সেটা কী বিষয়?

অ॥ যাদব প্রকৃতপক্ষে শশীর ব্যাখ্যাতা। হোসেন মিয়া যেন কুবেরের। আসলে যাদবের মৃত্যুটা মানিকবাবুর পয়েন্ট নয়। মানিকবাবুর পয়েন্ট এই যে শশী যাদবের মৃত্যুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও বিমূঢ়ের মতন সে মৃত্যুর রহস্যময় কিংবদন্তীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তাকে সে খণ্ডন করতে পারল না। শশী জানত যে যাদবদম্পতি আফিম খেয়েই মরেছে। কিন্তু এ-কথা সে কাউকে বলতে পারল না। আসলে সংস্কারকে সংস্কার বলে জেনেও সে তাতে আবদ্ধ। তাকে সে আঘাত করতে পারে না। শশীর সমস্ত অসহায়ত্বের চেয়ে এই বিশেষ অসহায়ত্ব বেশি তাৎপর্যময়। সুতরাং শশীর জন্যেই যাদব।

আ॥ বেশ কথা। এটা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। কেননা যাদব প্রসঙ্গে আমি যা বললাম তার সঙ্গেও আপনার কথা বলা চলে। এ দুটো কথা পরস্পর সম্পূরক, বিরোধী নয়। কিন্তু হোসেন মিয়া প্রসঙ্গে কী বলবেন? সেও তো আপনার মতে যাদবের পাশেই দাঁড়ায়।

অ॥ ঠিকভাবে দেখতে গেলে যে কারণে যাদব উপন্যাসের নির্মাণের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সেই কারণে হোসেন মিয়াও প্রয়োজনীয়। কুবের কত অকিঞ্চিৎকর, হোসেন মিয়াকে দিয়ে সেটাই প্রতিপন্ন করা হল। জীবন সম্বন্ধে মানিকবাবু কতখানি নির্বিকার— যাদব এবং হোসেন মিয়ার সাহায্যে তিনি সেকথা বলেছেন। সুতরাং উক্ত আধুনিক সমালোচকের কথা আপনি মেনে না নিলেও উনি ঠিকই বলেছেন।

আ॥ যদি ঐভাবে দেখেন তাহলে ঠিকই বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন এই যে শুধু ঐভাবেই দেখবেন কেন? বরং হোসেন মিয়াকে হোসেন মিয়া হিসাবেই দেখি না কেন। যদি একটা ছোট সূত্রেই দেখা যায়— দেখা যাবে যে এ-চরিত্রটি অন্তত মানিকবাবু সম্বন্ধে বহু উচ্চারিত একটা আপত্তির হাত থেকে মুক্ত। ধূর্জটিবাবুর সেই বিখ্যাত কথাটি স্মরণ করুন— মানিকবাবু মন্তব্যের ছুরি, তাও আবার ভোঁতা, বসিয়ে দেন বর্ণনার বুকে। হোসেন মিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এই উক্তি খাটে না।

অ॥ কিন্তু এই একটা পয়েন্ট জিতলেই হবে না। আমার প্রশ্ন অতি

সরল— হোসেন মিয়ার মতো চরিত্র বাংলাদেশে সম্ভব কিনা ?

আ॥ এটা একান্তই বেরসিক প্রশ্ন হয়ে গেল। হোসেন মিয়ার মতো চরিত্র বাংলাদেশে সম্ভব নয়, অতএব এ চরিত্র মানিকবাবুর রচনা করা উচিত হয় নি, আর গ্রীক পুরাণ এদেশের বাবুরা পড়েন না অতএব বিষ্ণু দে-র কাব্যেও সে অ্যালিউশন থাকা উচিত নয় এ কোন ধরনের রসগ্রাহিতা ?

অ॥ আপনি আমার কথায় রেগে যেতে পারেন কিন্তু আমি হোসেন মিয়াকে কুবের-চরিত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র— এর বেশি কিছু বলতে পারব না। আপনার শশী আর হোসেন মিয়ার উপর যে বিশ্বাস সেটা বোহেমীয় কল্পনাচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আ॥ যথেচ্ছ মন্তব্য প্রয়োগ বাদ দিয়ে সরাসরি জবাব দিন আপনি—

অ॥ সমালোচকের জেরা ? বেশ তাই হোক।

আ॥ হোসেন মিয়াকে আপনার কী বলে মনে হয় ? জীবন্ত না নিষ্প্রাণ ?

অ॥ রূপকথার দৈত্যকে আপনার কী মনে হয় ? হোসেন মিয়াও তাই। যে অবলীলায় সে সারা উপন্যাসে যথেচ্ছ পদক্ষেপ করে বেড়িয়েছে তাতে তাকে লোকোত্তর শক্তির তুলনা করেই দেখানো হয়েছে। যাদব ইচ্ছা-মৃত্যুর শক্তি রাখে, হোসেন ইচ্ছাময়ের।

আ॥ কম্পাসের সামনে স্থিরনেত্র হোসেন মিয়াকে দেখে, অথবা স্ত্রীমারের জন্য তার উদাসীন আক্ষেপোক্তি শুনেও তাকে তা মনে হওয়া উচিত নয়। হোসেন মিয়া 'পদ্মানদীর মাঝি' নয়, সে পদ্মানদীর নাবিক। সে কম্পাসের ব্যবহার জানে, অক্ষরেখার দুর্বোধ্য লিপি পড়তে জানে, সে বার-সমুদ্রেও ঘুরে এসেছে। একটা শক্তিমান নাবিককে আপনারা চিনতে পারেন নি।

অ॥ কিন্তু এগুলো সবই লেখকের দেওয়া খবর। এবং তার ফলে সে খুব ইন্টারেস্টিং হয়েছে। অথচ আপনিই একটু আগে বলেছেন যে মাত্র চিত্তাকর্ষক হলেই তা শিল্প হবে না।

আ॥ আমি এখনও তাই বলছি। এবং আরো বলছি যে যা শিল্প তা কিন্তু চিত্তাকর্ষক হবে এবং এখানে চিত্তাকর্ষক হওয়া মানেই চিন্তাকর্ষক হওয়া। হোসেন মিয়া সম্ভব চরিত্র কি না সে প্রশ্ন মুলতুবি রেখে সে সম্ভাব্য কিনা সেটাই বিচার করতে হবে। মানিকবাবু ডিফো নন কাজেই ক্যারেটিভ রিয়ালিজম তাঁর লক্ষ্য নয়। ঘটনাকে সত্য করে দেখানোর জন্য মানিকবাবুর মাথাব্যথা নেই।

অ॥ বাঃ, একটা সেট অব অবজেক্ট এবং চেন অব ইভেন্টস্ ছাড়া মানিকবাবু হোসেন মিয়াকে প্রতিপন্ন করবেন কি করে? যার অভাবে হোসেন মিয়াকে কল্পনাবিলাস বলে মনে হয়েছে। এটা তো মানেন?

আ॥ না। তার কল্পনাবিলাস আছে, একথা বলা যদি বা যায়, পুরো চরিত্রটাকেই কল্পনা-বিলাস বলে দেওয়া যায় না। অপু ভাবপ্রবণ মানে বিভূতিবাবু ভাবপ্রবণ নন। হোসেন মিয়া দ্বীপাধিপতি হতে চায়, একটা কুমারী দ্বীপকে সে সৃষ্টির ভূমিকায় নামাতে চায়। আমাদের ঔপনিবেশিক ভদ্রলোক-প্রধান সাহিত্যের দেশে এ চরিত্র স্বতই আমাদের আশ্চর্য করে। সেই জন্তেই নদী-সমুদ্রের বিজন অংশে, যেখানে আমাদের উপনিবেশের সভ্যতা এবং তার শাসনসূত্র দুই অনুপস্থিত, হোসেন মিয়ার কার্যকলাপের জন্ত সেই অংশকেই পটভূমি নির্বাচিত করা হয়েছে। অথচ এই রূপকল্পনায় ফাঁকি যে নেই তারও নিদর্শন উপস্থিত। তার জাহাজ জোটে নি, সে নৌকায় কম্পাস লাগিয়েছে, তার কলের জাহাজের লোভ আছে, কিন্তু ক্ষমতা নেই— এ সবের ভিতর দিয়ে সে অমিত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে উপনিবেশেরই সন্তান সেটা বোঝা যায়।

অ॥ এ কথা আংশিকভাবে মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পুরোটা মানতে পারি না। কেননা, উপন্যাসে ময়না দ্বীপের ব্যবহার বড়ই অস্পষ্ট। মানিকবাবু, অন্তত আপনারা যাই বলুন না কেন, এটাকে কুবেরের গল্প বলেই মনে করেছেন। তাই ময়না দ্বীপকে প্রায় নেপথে রেখেছেন। তার ফলে ময়না দ্বীপ একটা রহস্যের দেশ হয়েই থেকে গেল। হোসেনের অলৌকিকতার প্রমাণ হয়েই থাকল। যে দ্বীপের কথা আপনি এত বলছেন যে দ্বীপ সমেত হোসেন মিয়াকে হাজির করার ক্ষমতা মানিক-বাবুর ছিল না। আসল কথা হোসেন মিয়ার মতো কর্মিষ্ঠ দুরন্ত মানুষ মানিক-বাবু কখনো দেখেন নি বলেই এমনটা ঘটেছে। এ কারণেই বলছিলাম হোসেন মিয়াকে মানিকবাবু পেলেন কোথায়? সে চরিত্র এদেশে সম্ভব কিনা!

আ॥ আপনি একটু আগে বিষ্ণু দে মশায়ের উদ্ধৃতিটা যেখান থেকে দিলেন সেখানেই আর একটা কথা আছে সেটা এড়িয়ে গেছেন, লেখক কী দেখেছেন না দেখেছেন তার জন্তে সরকারি দপ্তরের বা গেজেটের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর রচনাই যথেষ্ট উপাদান বলে বিবেচিত হওয়া ভালো। তাছাড়া আপনি হোসেন মিয়ার অলৌকিকত্বের উপর বেশি জোর

দিচ্ছেন; সেটা কিন্তু অনাবশ্যক। কুবেরের কাছে অলৌকিক হোসেন মিয়া কেমন করে লৌকিক মানুষ হয়ে গেল 'পদ্মানদীর মাঝি'র গল্পের এটা একটা বড় ব্যাপার।

অ॥ সেটা কেমন?

আ॥ সেটা সোজা করে বলতে গেলে দাঁড়ায় এই যে উপন্যাসের আদ্যোপান্তে চরিত্রটির কোনো পরিবর্তনই দেখানো হয় নি। কিন্তু চরিত্রটি সম্বন্ধে কুবেরের চেতনার ক্রমপরিবর্তনকেই নানাভাবে দেখানো হয়েছে। কুবেরের কাছে হোসেন মিয়া প্রথমে বিস্ময় এবং ভয়, মধ্যে শুধুই বিস্ময়, অন্তে কিন্তু বিস্ময় এবং ভয় দুইই কেটে গেল, যা রইল তা হচ্ছে চরিত্রটির সম্বন্ধে কুবেরের সঠিক উপলব্ধি। কপিলার কথার জবাবে সে যখন বলল যে হোসেন মিয়া তাকে ছাড়বে না, একবার না হলে দুবার জেল খাটাবে এবং দ্বীপে তাকে নিয়ে যাবেই, তখনই বোঝা যায় যে সে হোসেন মিয়াকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছে। সুতরাং অলৌকিক হোসেন মিয়ার গল্প এটা নয়। যে হোসেন মিয়ার গান বাঁধতে পারা দেখে কুবের বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে এবং ময়না দ্বীপ রচনা দেখে হয়েছে স্তম্ভিত— সেই রাত্রের দৃশ্যটি স্মরণ করা যাক— সেখানে বন্দী এনায়েত বুড়ো বসিরের বৌয়ের হাত থেকে ভাত খাচ্ছে দেখে হোসেন মিয়া কুবেরকে বলছে যা দেখলে তা আর কাউকে বলে কাজ নেই— সেই হোসেন মিয়া যখন তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে ষড়যন্ত্র করে জেলে পাঠাতে চায়, যাকে এড়াতে গিয়ে তাকে ময়না দ্বীপে যেতেই হবে, তখন হোসেন মিয়া সম্বন্ধে তার প্রথম অনুভূতি ভেঙে গেছে। তখনও তার ভয় আছে হোসেন মিয়া সম্বন্ধে, কিন্তু সে অলৌকিকের ভয় নয়, কুটিল ষড়যন্ত্রকারীকে, ফেরেববাজকে মানুষ যেমন ভয় করে তেমন ভয়।

অ॥ অলৌকিকত্ব, লৌকিকত্ব প্রভৃতি বড়-বড় কথাগুলো ভাঙলে যে স্পষ্ট কথাটা বেরিয়ে আসে তা হল হোসেন মিয়া শেষ পর্যন্ত একটা ভিলেনে রূপান্তরিত হল। তাই নয়? কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত ভিলেন হয়ে গেলে আর তার কোনো দাম থাকে না।

আ॥ সেটা অবশ্য কিছুটা ঠিক। এবং এক্ষেত্রে মানিকবাবুর কল্পনার খানিকটা ত্রুটি না মেনে উপায় নেই। প্রচণ্ড শক্তিমান হোসেন মিয়ার কাছে কুবের অবশ্যই অতি অকিঞ্চিৎকর প্রাণী। অবলীলাক্রমে যদি হোসেন মিয়া সেই অতি তুচ্ছ প্রাণীটাকে দলিত করত তাহলেই মানাত। কারণ এটা নিশ্চয় জানেন যে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে অদৃষ্ট দুটো বাহুতে কাজ করছে। একটা

বাহু হল অন্ধ অচেতন প্রকৃতি আর একটা বাহু হল হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়াকে অচেতন প্রকৃতিরই কার্যকরী মাধ্যম বলে বর্ণনা করা চলত যদি হোসেন মিয়া পদ্মার অনুবর্তী শক্তি হতেন। কিন্তু হোসেন মিয়া তা নয়। পদ্মা যেখানে সমস্ত মানুষের ইচ্ছাকে ছেলের হাতের খেলনার মতো ইচ্ছে মাত্রই ভেঙে ফেলতে পারে, হোসেন মিয়াই সেখানে একমাত্র নিজ ইচ্ছার সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'খুশ হলে না পারি কী'— এই কথাটাই ঐ চরিত্রটির চাবিকাঠি। সে পদ্মাকে উপেক্ষা করে। কাজেই এত বড় শক্তি যার সে কুবেরের মতো তুচ্ছ মানুষের জন্য মিথ্যা চৌর্যের ফাঁদ পাতবে -- এই চাতুরিটাই তাকে মানাল না। আরো অপরিহার্য অনিবার্যতার ভিতর দিয়ে, আরো বিস্তৃত পটভূমিতে হোসেন মিয়াকে ব্যাখ্যাত করে এ পরিণতি আনলে এই অসঙ্গতিটা সৃষ্টি হত না। রাসু এবং আমিনুদ্দির বেলায় এমন ধরনের চাতুরীর দরকার হয় নি। পদ্মার বিমুখতায় তারা ময়না দ্বীপের উদ্দেশে ভেসে পড়েছে। এই বিমুখতা সেখানে স্পষ্ট করা হয় নি। কুবেরের প্রসঙ্গে এটা করার অবকাশ ছিল।

আ॥ এটার হয়তো একটা কারণ দেখানো চলে যে হোসেন মিয়ার সামাজিক বাস্তব চেহারা সম্বন্ধে শেষটা মানিকবাবু অতি সচেতন হয়ে পড়ার ফলেই এটা হয়েছে।

আ॥ তাহলেও সেটাকে সমর্থন করা যাবে না। হোসেন মিয়ার যে অবিস্মরণীয়তা গোটাকত বলিষ্ঠ আঁচড়ে মানিকবাবু সৃষ্টি করেছিলেন কোনো সমাজ-সচেতনার জন্যেই তাকে ভুলে যাওয়া তাঁর উচিত হয় নি। আর হোসেন মিয়ার বিপুল বলিষ্ঠতার পরিসরে এ ত্রুটি তবু অস্পষ্ট, মানিকবাবুর পরবর্তী রচনায় এটা তাঁর শিল্প-বিভ্রাট ঘটিয়েছিল।

আ॥ তাহলে কি একজন শিল্পী সমাজসচেতন হবেন না ?

আ॥ নিশ্চয় হবেন। কিন্তু তিনি শিল্পীর সমাজসচেতনতা আর সমাজতাত্ত্বিকের সমাজসচেতনতায় তফাত আছে এটা কিছুতেই ভুলে যাবেন না। একজন শিল্পী নিশ্চয় সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবল আগ্রহী ব্যক্তি হবেন, কিন্তু সেটা শিল্পী হিসাবেই হবেন। শিল্পীর সমাজের দিকে তাকিয়ে সমাজতাত্ত্বিক হতে যাওয়া, সমাজতাত্ত্বিকের সমাজের দিকে তাকিয়ে শিল্পী হতে চাওয়ার মতোই ভ্রান্তিপূর্ণ। মানিকবাবুর মার্কসবাদী পর্যায়ে সেটাই ঘটেছিল। সে কথা আর একদিন হবে।

উপন্যাসে মৃত্যু

বোধোদয়ের পূর্বে বাঙালি সন্তান প্রথম গল্প পড়ে দ্বিতীয় ভাগে। সে গল্প ভুবনের গল্প। দুই, তিন এবং চার বর্ণের ভয়াবহ জোটপাট পেরিয়ে ভুবনের ফাঁসির গল্পে বাঙালি বালক হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কারণ গল্পটি একেবারে গল্প। 'মাসি তুমিই আমার এ ফাঁসির কারণ'— ভুবনের এই অন্তিম উক্তি— আমাদের সাহিত্য পঠনের আদিম উক্তি। অনেক ছোট বেলায় আমরা রূপকথা শুনেছি। কিন্তু রূপকথার নায়কেরা কেউ মরে নি। তারা সবাই গল্পের শেষে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করেছে। রূপকথার বাইরে ভুবনের গল্প— আর এখানেই শিশু পাঠকেরা দেখল গল্পের নায়কের প্রথম মৃত্যু। গল্পের নায়ক চোর বটে, তবু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্থূলেসূক্ষ্মে তফাতের জন্যেই বোধ হয় আমাদের টান চলে যায় চোরের দিকেই— সে অন্যায়কারী হলেও মাসীর কান কামড়ে দিয়ে আমাদের সামনে একটা নতুন ন্যায়ের পত্তন করেছিল।

তাহলেও এই প্রথম মৃত্যু। বলে 'মড়ার বাড়া গাল নেই'। কিন্তু সে জীবনে। সাহিত্যে মরণের ধরন আছে। হঠাৎ শোনা যায় করোনারি থ্রম্বোসিসে অমুকের বড়ো জ্যাঠা মারা গেছে। কিন্তু অমুকের বড়ো জ্যাঠা উপন্যাসের নায়ক কি? না। তাই হঠাৎ মারা গেছেন। নভেলের নায়ক কখনো হঠাৎ মরে না। তাই বলছিলাম সেখানে মরণেরও ধরন আছে। আর সেই জন্যই বোধহয় রকমারি এবং বহুবিচিত্র মৃত্যুদৃশ্যে দুনিয়ার সেরা উপন্যাসেরা চিহ্নিত। ফর্স্টার সাহেব কি সেই কারণেই জীবনের পঞ্চভূত রচনায় প্রেম জন্ম প্রভৃতির সঙ্গে মৃত্যুকেও একাসনে বসিয়েছেন? বোধ হয়। তিনি তো বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন, মৃত্যু ও প্রেম দুই-ই ঔপন্যাসিকের সমান প্রিয়— Love like death is congenial to novelist। বড়ো ঔপন্যাসিক যে দরদে যে নিষ্ঠায় সার্থক প্রেমের দৃশ্য রচনা করেন ঠিক সেই প্রয়োজনের পাল্লায় পড়েই তিনি রচনা করেন মৃত্যুদৃশ্য; প্রেমের দৃশ্যেও যেমন পয়লা সারির লেখক প্যাঁচকের পর প্যাঁচক দিয়ে চলেন, চড়িয়ে চলেন

রঙের উপর রঙ, কিন্তু নিজে থাকেন অনাসক্ত দর্শকের বিচ্ছিন্ন আসনে— মৃত্যুদৃশ্যেও তেমনি ঔপন্যাসিক যতই বিষণ্ণ বেদনাবর্ত রচনা করেন, যতই দীপটি সলতে গুটিয়ে গুটিয়ে নিভিয়ে আনেন, তিনি নিজে থাকেন বিরক্ত সন্ন্যাসীর নিরাসক্তিতে স্থির। স্থির বলেই সুসার্থক উপন্যাসের মৃত্যুদৃশ্য নানান তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। নানান ব্যঞ্জনায় ভাবগর্ভ।

উপন্যাসে মৃত্যু যখন ঘটে তখন চরিত্রের ষোলকলা পূর্ণ করে তবে মানুষটির মৃত্যু ঘটানো হয়। কলা চলে মৃত্যুকে অবলম্বন করে মানুষটির সমাপ্তি আসে —কিন্তু চরিত্র লাভ করে আর এক গুণ বেশি জীবনীশক্তি। গান শেষ হয়ে যায়, জেগে থাকে সুরের রেশ, তার অনুরণন। সেই জন্য মৃত্যু শুধু লেখকের হাতে নভেল বা চরিত্র শেষ করার যন্ত্র নয়— অনেকক্ষণ ধরে তার বেঁধে বেঁধে শেষকালে বাজিয়ে তোলা এক যন্ত্রসংগীত। দেবদাস যখন মরল তখন দেবদাসকে দিয়ে লেখকের কাজ ফুরিয়েছে। মৃত্যু পরিকীর্ণ প্লেগের এলাকা থেকে অচলা যখন সুরেশকে কুড়িয়ে নিল তখন তারও কাজ ফুরিয়েছে। ছাই হল তাদের দেহ— চিতাগ্নিতে আর-একটু উজ্জ্বল হল তাদের স্বরূপ। সাহিত্যে অকালমৃত্যু নেই। কাজ ফুরোনোর আগে বিনা নোটিশে সরে পড়েছেন এ হল খবরের কাগজের ব্যাপার। By the time his characters die he understands them। এই understanding-এর আগে কাক কেটে পড়া নভেলে চলবে না। মৃত্যুদূতকে তখনই তলব করা হবে যখন নভেলিস্ট বুঝবেন it ends a novel neatly। মৃত্যুর সার্থকতা মৃত্যুতে নয়। কেন না মৃত্যু তো কারুণ্যের উৎস মাত্র নয়, নয় শুধু ট্র্যাজেডির অগ্রচারী। সে যে অন্যার্থবাচকও বটে। আমরা দেখেছি দেবদাস মরে বটে, কিন্তু ট্র্যাজেডি পার্বতীর। ভ্রমর মরে, কিন্তু ট্র্যাজেডি বহন করে গোবিন্দলাল। কুন্দনন্দিনী বিষপান করে— বেদনাসুদূর ব্যবধান জেগে থাকে সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথে। যে মরে যায় সে তো বেঁচে যায়। সে তো উপক্রমণিকা থেকে পৌঁছে গেল উপসংহারে। কিন্তু কথা উঠবে কেমন করে বাঁচে? না, যেমন করে লেখক মারেন তেমন করে সে বাঁচে। সেই আগেকার গল্পে রামায়ণে পড়েছি সৈনিকভক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুরূপী ভগবানকে দেখে গদগদ হয়ে উঠতেন আনন্দে, ভাবতেন আজই মৃত্যু, আর তা হলেই অমরত্ব। রোহিণীও বোধ করি যখন দেখেছিল যে গোবিন্দলালের হাতে বঙ্কিমচন্দ্র পিস্তল তুলে দিলেন তখন ভেবেছিল 'যাক আর আমার মার নেই'। পুনর্নবা রোহিণী তাই চিতাভস্ম ঝেড়ে ফেলে একবার হল বিনোদিনী একবার হল কিরণময়ী। তবু তার মার নেই। রোহিণী মল' বলেই সমাজ-

সংসারের' নায়িকাদের থেকে সে ঢের বেশি purpose serve করে গেল। রোহিণীর মৃত্যুর ধরন আছে বলেই তার মরণ মরণ নয়। তাই তার মৃত্যুর পরে সমালোচকেরা বঙ্কিমকে আসামী করে কোর্ট বসিয়ে সুবিধা করতে পারলেন না। ওটা শুধু হত্যাই নয়। নইলে ওরকম কেস আমাদের ব্যারাকপুর কোর্টে আগে সপ্তাহে একটা করে হত।

বরঞ্চ বলা চলে রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র নিছক সুবিচার করেছেন তার মৃত্যুদৃশ্যে। বস্তুত মৃত্যুমুহূর্তের আলোকেই আমরা দেখেছি রোহিণীর প্রকৃত তাৎপর্যকে। সেই বিদ্যুৎবহ্নির চকিত আলোতেই তাকে চিনেছি আমরা। কুন্দ আর রোহিণী এই দুজনার চরিত্রেরই অকস্মাৎ ঘোমটা খোলা রূপ দেখেছি মৃত্যুকে শিয়রে রেখে। যে রোহিণীকে আমরা কেউ কেউ বলেছি প্রগলভা ব্যাপিকা এবং আরো কত কিছু—পিস্তলের সম্মুখে সেই রোহিণীই কত স্থির-বুদ্ধি এবং অবিচল— 'মরিব কেন? দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব সেও তো এক সুখ'। এ আর সেই বিড়ালকে কটাক্ষকারিণী রোহিণী নয়। যে Grand passion-এর কথা রোহিণীর সম্বন্ধে বলা হয় মৃত্যুর পাথরে রোহিণীকে দিয়ে বঙ্কিম তাই একবার যাচাই করিয়ে নিয়েছেন। ঠিক এমনি বিপরীত আবর্তন ঘটেছে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুদৃশ্যে। কুন্দর মৃত্যুদৃশ্যের পরিচ্ছেদটির নাম রেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র 'এত দিনে মুখ ফুটিল'। চিরমৌন লজ্জাবনতা কুন্দনন্দিনী ঠিক রোহিণীর উল্টো। মৃত্যুমুহূর্তে সে সকল সংকোচ পরিহার করে বলে উঠল—'আমি তোমার হাসিমুখ দেখিয়া যদি না মরিলাম তবে আমার মরণেও সুখ নাই—তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না'। দুটি চরিত্রই দ্বিমুখী। কিন্তু মৃত্যুর আলোকে দুজনেই জীবনকে পাঠ করেছে একই ভাবে। পাঠ করেছে জীবনের অজেয় রহস্যকে একই অর্থে। বলেছে মৃত্যুর চেয়ে জীবনই সত্য। আর বলেছে নীতি বা দুর্নীতি কিছু কাজের কথা নয়, শিল্পরসিক বঙ্কিম মৃত্যুদৃশ্যে জীবনরসিক হয়েছেন বারে বারে— শুধু প্রতাপের মৃত্যুদৃশ্য বাদে।

বড়ো ঔপন্যাসিক মৃত্যুর ব্যবহার সব সময় ঐ অর্থেই করে থাকেন। কখনো কখনো মৃত্যু বড়ো ক্লেদাক্ত পথে আসে। তখনই সে সৃষ্টি করে এক morbid আবহাওয়ার। মানুষ মৃত্যুকে গ্রহণ করে না। মৃত্যু তাকে শিকার করে। কিন্তু মানুষ যুদ্ধ করে শেষ অবধি। যেখানে জীবনযুদ্ধ নেই, আছে শুধু মাত্র মৃত্যুবিলাস সেখানেই অসুস্থ মৃত্যু। শক্তিমান লেখকের হাতে পড়লে এ যে কতখানি সংক্রামক হতে পারে বুদ্ধদেব বসুর 'নির্জন স্বাক্ষরে'র

নায়কের মৃত্যু তার নিদর্শন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর নায়কের আত্মহত্যাও বুদ্ধদেবকেই অনুসরণ করেছে। পরাভূত জীবনের আশ্রয় যে মৃত্যু তা অসুন্দর এবং সে কারণেই মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা। হ্যামলেটীয় বিষাদ-খিন্নতা সকারণ, আর এরই অকারণ এক মায়াবী-অনুসরণ ঘটেছে এই দু-ক্ষেত্রে। এখানে জট পাকিয়ে তুলে— জট যে খোলা গেল না এটাও দেখানো হল না। জটবাঁধা সুতোটাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল। এখানে death does not end a novel neatly। সমাধান নয়, সমাধি। ধরুন 'প্যারির পতনে' দেসেরের আত্মহত্যার কথা। বিয়ারের বোতল মুখে তোলার মতন তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে রিভলবারের নলটা সে তুলে নিল। দেসেরের সমাপ্তি এল। কিন্তু লেখকের গুণে এ সমাপ্তি আপনাকে সংক্রামিত করবে না। সমগ্র ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকদের তৈরি অরাজকতার পটভূমিকায় দেসেরের ভবিতব্য নির্ধারিত হয়েছে। এই মৃত্যুর dramatic treatment-এ লেখক নাট্যকারের নিরাসক্তি নিয়ে কাজ করেছেন। ফলে দেসেরের আত্মহত্যা আদর্শায়িত হয়নি— কাব্য করাও হয়নি তাকে নিয়ে। বৈজান্টাইন সভ্যতার পতনের মতো দেসেরের মৃত্যু— গোলমালটা কোথায় সবাই জানত তবু অনিবার্যতাকে ঠেকানো গেল না। কিন্তু তাই বলে লেখক ফ্রান্সের অমর প্রাণশক্তির ওপর থেকে দৃষ্টিবিন্দু সরিয়ে দেসেরের মৃত্যুবর্ণনা করেননি।

আসল কথা নভেলের সঙ্গে ডিটেকটিভ নভেলের তফাত কোথায়? ডিটেকটিভ নভেলে মৃত্যু প্রথম পরিচ্ছেদে, পরে ঘটনাস্রোত। সাধারণ নভেলে আগে ঘটনাস্রোত, পরে মৃত্যু। তাই লেখকের mood, নভেলের mood এক হয় মৃত্যুর পরিচ্ছেদে। এক এক লেখকের হাতে মৃত্যু তাই অনন্ত। যেমন করে আনা কারেনিনা মরে, তেমন করে বাজারভ মরে না। যেমন করে বঙ্কিমচন্দ্র মারেন তেমন করে রবীন্দ্রনাথ মারেন না। নিহিলিস্ট বাজারভের দুর্বোধ্য উদাসীনতা মৃত্যুতে টলেনি। প্রেমিকার শেষ চুম্বন ললাটে টীকাঙ্কিত করে সে পাশ ফিরে শুল— Now the darkness। আনা কারেনিনা মাথাটা চাকার তলায় গুঁজে দিতে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়ায়, একবার স্নান করার আগের ছোট্ট মেয়ের মতো ঘাবড়ে যায়। কেননা বাজারভ চির-উদাসীন, আনা কারেনিনা চির-আসক্ত। তাই বাজারভ প্রকারান্তরে আত্মহত্যা করলেও সে আত্মহত্যার সম্মানও পৃথিবীকে দেবে না। সে মৃত্যু আইনসঙ্গত মৃত্যু। তবু যেন বাজারভের মৃত্যু বিলাস— আনা কারেনিনার মৃত্যু উপায়। বাজারভের নিরাসক্ত মৃত্যু পার্থিব প্রলেপ এবং

মানবিক স্পর্শ পেয়েছে বাজারভের বাবা-মা দুই বুড়োবুড়ির জন্য— our son is dying বলে তারা যখন পাশের ঘরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তখন একটা কথাই মনে হয়— নবীন রাশিয়ার সঙ্গে প্রাচীন স্থবির রাশিয়ার কী দুর্বোধ্য ব্যবধান। আর আনার মৃত্যুতে যা মনে হল তাও অতিক্লাপূর্ব নয়। জীবনে-মরণে আনা প্রতিবিম্বিত করে তুলল the clear manifestation of the social contradictions inherent in bourgeois love and marriag·। যা নিখিল বুর্জোয়া সমাজের বিবাহ-প্রেমের ট্রাজেডি আনার মরণ তাকেই তীব্র করে দেখিয়েছে। টলস্টয়ের সমস্ত ethical basis সত্ত্বেও এই সামাজিক তাৎপর্যই এখানে আভাসিত।

বড়ো ঔপন্যাসিক মরার আগে একবার মারেন। আসল মরণ সেইখানেই। তারপরে যে শারীরিক মৃত্যু সেটা প্রকৃত পক্ষে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। রোহিণীর পরিসমাপ্তির পূর্বে বঙ্কিম বর্ণনা করছেন প্রসাদপুরের বিলাস-কক্ষে রোহিণী গান শিখছে, ওস্তাদজী তানপুরা নিয়ে তান চড়াচ্ছেন, আর বিগতস্পৃহ গোবিন্দলাল পাশে বসে নভেল পড়ছেন। বুদ্ধিমান পাঠক বুঝে নেবেন রোহিণীর হয়ে গিয়েছে। টলস্টয়ও আনা কারেনিনার ভ্রনস্কি ও আনার কদিক্কু প্রেমের রূপ এঁকেছেন—She lifted her cup, with her little fingers held apart and put it to her lips. After drinking a few sips she glanced at him and by his expression she saw clearly that he was repelled by her hand and her gesture and the sound made by her lips. দুটো বর্ণনাই নাটারসাশ্রিত। এই খুচরো কাজ দুটিকে কেন্দ্র করেই পাঠকের মনের বৃত্ত ঘুরে গেল। এরপরে মৃত্যু আমাদের আর বিস্মিত হইনি। সেদিক দিয়ে কুন্দনন্দিনীর বিষপান— বিষ-সংগ্রহ, হীরার আচরণ সকল কিছু সমেত অঙ্কের মতো নির্ধারিত গতিতে অনিবার্য হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু রোহিণী কি আনার মতো dramatic হয়নি।

চরিত্রের মূল সূত্রকে মৃত্যু কখনো ক্ষুণ্ণ করে না। যদিও গৌণ লক্ষণের সহসা পরিবর্তন সাধন কখনো কখনো খুবই উপাদেয়। ভ্রমরের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হই। কিন্তু ভ্রমর যদি গোবিন্দলালকে দেখে হঠাৎ স্বামীর পদে আত্মসমর্পণ করত তাহলে আমরা ভ্রমরের জন্য যতটা না হোক বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্য সবিশেষ ব্যথিত হতাম। নীরেন রায় মশাই যে-ভ্রমরের কথা বলেছেন সে-ভ্রমরের প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠান তার মৃত্যুকালীন মোক্ষম উক্তিটিতে— —'আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই'। এইভাবে মরেই ভ্রমর নতুন

নারী হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের প্রেমের দৃশ্য ও মৃত্যুদৃশ্য দুয়েরই হতাশ করেছেন। প্রেমের দৃশ্য তাঁর উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো— তানে লয়ে সুরে গমকে সুনিপুণ পরিবেশ— কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রবেশ পত্র জোগাড় করা দুরূহ। তাঁর কোন নায়ক-নায়িকাই আমাদের আশ মিটিয়ে ভালোবাসেনি, আমাদের আশ মিটিয়ে মরেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পয়লা নম্বরের রচনাগুলিতে উপন্যাসের টাল সামলেছেন, চরিত্রের উপসংহার এনেছেন মৃত্যুর সাহায্যে। নবতর আলোকসম্পাত করেছেন চরিত্রের অন্ধকার দিকে, তাও এই মৃত্যুরশ্মির প্রতিফলনে। মৃত্যু বঙ্কিমের জীবনদেখা প্রদীপ— মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের গল্প শেষ করার শাঁখ। ঔপন্যাসিক যে বাস্তব দৃষ্টিতে মৃত্যুর আসা-যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করেন কবি রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। তাঁর মরণ বরের মতো সেজেগুজে আসে বাসরকক্ষে, বধূর কোমল করপল্লব আর তৃষিত অধরের সন্ধানে— আগমনও তার তেমনি— "যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।" বলাই বাহুল্য এ মরণে কাব্য যতটা নভেল ততটা নেই। মরতে চাই না, পাকেচক্রে অনিবার্য হয়ে উঠল মরণ, এ হল বঙ্কিমী কৌশল। রবীন্দ্রনাথে মৃত্যু যেন কবি-নায়কদের বিলাস— যদি নিন্দে করি; সেখানে মৃত্যু যেন ঋষি রবীন্দ্রের দর্শন— যদি প্রশংসা করি। ফটিকের ছুটির মৃত্যু বা যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যু কবির ভাবদৃষ্টিতে আশ্রিতবৎসল মৃত্যু। এখানে মৃত্যু কোন নবীন দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে আসেনি, শুধু neatly end করা ছাড়া আর অন্য ব্যঞ্জনা নেই—এলা মরল— 'শেষ চুম্বন অক্ষয় হোক'। এ হল সেই বাজারভের মতো Breathe on the dying lamp, let it go out। ফটিক মরল— আমার ছুটি হয়েছে। এ সেই ছুটির দর্শনের কথা— "বধূ" কবিতার শেষ স্তবক। মৃত্যু কখনো প্রেমিকার মতো প্রসন্নহাসিনী, যেমন "শেষরাত্রি" গল্প— নায়ক সেখানে অতি ভাবপ্রবণ। তবুও একথা বলতেই হবে কোন বলবার মতো মৃত্যুদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে আমরা পাই না। জীবনরসিক বলে এটা ঘটেছে একথা বললে যথার্থ বচন হবে না— বরং সংসার বর্ণনার সকল খুঁটিনাটির বেলায় এবং জীবন-মরণের বাস্তব চিত্র রূপায়ণে তিনি বিমুখ ছিলেন একথা বললেই ভালো হবে। নাটকের মৃত্যুর কথা এ প্রসঙ্গে না তোলাই ভালো— কেননা সে মৃত্যুর ব্যাখ্যা মৃত্যু দিয়ে হয় না, হয় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মবিশ্বাসের টীকাভাষ্য দিয়ে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে আমাদের মতন করে দেখেন নি, দেখান নি। মৃত্যুকে সত্য করে তোলেন নি। ভুলে গিয়েছিলেন যে Death

is an old story, yet always new to one to us। মৃত্যু আমাদের সংসারের সীমায় নিয়ে গিয়ে হঠাৎ ভাবোদ্বেল করে তোলে এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মরণ আর কোন কথা বলেনি। যেখানেই ভাবাতিশয্যতাকে হাতে ধরে কবিকল্পনার খেয়ানৌকায় পার করে নিতে হয়েছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মাঝিকে স্মরণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে দড় বটে একালের ঔপন্যাসিকেরা। তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস এবং চেতনা এই চূড়ান্ত মুহূর্তেও কাজে লাগাতে ছাড়েন না। এই চরম লহমাকেই তাঁরা মনে করেন পরম বিকাশের কাল। তাঁরা বলেন চেতন-লোকের রৌদ্র কেমন করে ছায়াম্লান হয়ে যায়, কেমন করে অবচেতনের আলো-আঁধারি অকস্মাৎ আলোকময় হয়ে ওঠে, কেমন করে বেদনা জমাট হয় ক্ষোভে, কী করে ক্ষোভ ইস্পাত হয় ক্রোধে। মরবার সময় বসনকে নিতাই বলেছিল 'কবি' উপন্যাসে— গোবিন্দের নাম কর বসন। বসন বলেছিল, কেন করব, কী দিয়েছে আমায় গোবিন্দ। শেষ নৈঃশব্দ্যের আগে মুখর বসন শেষবারের মতো সোচ্চার হয়েছে। এখানে মৃত্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনেরই প্রবক্তা হয়েছেন লেখক। মানুষ কতখানি জীবনপ্রেমিক এসব কথা তারাশঙ্করবাবু যখন বলতেন তখনকার দিনের আর একটি উদাহরণ পাষাণপুরীর সেই ফাঁসির আসামী। সে প্রেমিকার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ভালো আছিস বাসিনী'? আর কোন কথা নয়, শুধু এই। মৃত্যুর চেয়ে বড়ো করে দেখেছিল সেই নারীকে, সেই নারীর দেহমুকুরে মহাজীবনকে। তারপরে যখন তারাশঙ্করের প্রত্যয় ক্রমে ক্রমে ধোঁয়াটে আধ্যাত্মবাদকে সম্বল করল তখন থেকেই তাঁর মৃত্যুদৃশ্যের রঙ ফিকে হতে লাগল। এ ব্যাপারে সব থেকে জুতসই বই হওয়া উচিত ছিল আরোগ্যনিকেতন। এখানে তিনি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নবপুরাণকল্প রচনা করেছেন। তা অনবদ্য। কিন্তু মৃত্যু এবং জীবনের দ্বন্দ্বে মৃত্যুরূপাদেবী আসে আরোগ্যের মতো— এই সব রহস্যময় অন্ধকার মতামত এই বইয়ে মৃত্যুর প্রাধান্যকেই স্থায়ী করেছে। এমনকি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই, যিনি ভূতেও বিশ্বাস করতেন মানুষেও বিশ্বাস করতেন, তাঁর "অন্তর্জলী" গল্পের মরণ ঐ মৃত্যু থেকে আমাদের কাছে মনোজ্ঞ। সেখানে এক বিখ্যাত গ্রাম্য কবিয়ালকে অন্তর্বাসী করা হয়েছে— এবং তার মৃত্যুর আলোকে প্রেমঘন জীবনের কান্তকোমল রূপটি ধরা পড়েছে। আসল কথা শুধু তো মরলে চলবে না। মৃত্যু মানে যদি শুধু সুপ্তি হয় তাহলে শব সৎকার সমিতির আপিসে গিয়ে গল্প শুনব। কিন্তু মৃত্যুকে

যে বলতে হবে অন্য কথা, বলতে হবে জীবনের মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই অজস্র মৃত্যুর। বর্ষার জল পেয়ে সরস সতেজ পল্লবিত পুঁইমাচাটি দাঁড়িয়ে আছে। যে পুঁতেছিল সেই মেয়েটি মরে গেছে। পুঁইমাচাটি প্রবর্ধমান জীবনের প্রতীক— যার মৃত্যু নেই। বিভূতিবাবুর গল্পের প্রকৃতি-জড়ানো মানুষের মৃত্যুর ব্যঞ্জনা এই। মৃত্যু জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা— কিন্তু অতি আশ্চর্য তার দ্যোতনা। বিভূতিবাবুর অনাড়ম্বর কিন্তু সম্পন্ন গল্পগুলিতে মৃত্যু এসেছে বারংবার কিন্তু তাৎপর্য হারায়নি সে কখনো।

উপন্যাসের কবি তাঁর সৃজিত চরিত্রের চূড়ান্ত মুহূর্তে অন্তিম উক্তিটাকে করে তোলেন স্মরণীয়। শ্রীমতী কাফের ডজুলাট মরণকালে বলেছিল— 'আর আমার কোন ভয় নেই।' শেষচেতনার দীপ অন্ধকারে মিশে যাবার আগে ধুলোমাটির রতন বলেছিল— 'আমার সুটকেশটা'। এই দুটি মাত্র কথার পরিমিত পরিসরে লেখক প্রতিবিম্বিত করেছেন জীবনের অনন্তা। আর আমার কোন ভয় নেই— অর্থাৎ আমি জেনে গেলাম অফুরন্ত জীবনপ্রবাহিণী, আমি জেনে গেলাম, নিঃশেষে তুই ঝরে যাবি যবে ফাগুন তখন যাবে না। আমার সুটকেশটা — সুটকেশে কী আছে? নারীদেহের কতকগুলি অশ্লীল নগ্নভঙ্গিমা অপটু হাতে আঁকা। সুটকেশটা হয়ে উঠল— একটি ব্যর্থ কিশোরের অতৃপ্ত কামনার ধ্বংসস্তূপের প্রতীক। ঠিক এরই বিপরীত মেরুতে নরেনবাবু 'চেনা মহলে'র সেই আত্মহত্যা। যা জীবনকে ব্যাখ্যা করল না শুধু বিষণ্ণতা ছড়াল— তাও ব্যর্থ হাতে। তবু বলব বাংলা সাহিত্যে মৃত্যু এখনো কাব্যময় মাত্র। মৃত্যুর সেই grimness আমরা এখনো আঁকিনি। যা দেখেছি জ্যাক লণ্ডনের 'চিরন্তন' গল্পে— বরফের মতো জমাট মৃত্যুর দর্পণে যেখানে আমরা দেখেছি প্রদীপ্ত জীবন। দুর্ভিক্ষে রাশি রাশি মানুষ মেরেছি আমরা, কিন্তু সৃজন করিনি সেই মৃত্যু যা অশ্রুকে পরিণত করে স্ফুলিঙ্গে। সেই জীবনই কি এঁকেছি, যেখানে জীবনের পদতলে নতজানু মৃত্যু প্রণাম করবে, বলবে— তোমারই জয়? এমনি জীবন আর এমনি মরণ আছে Howard Fast-এর Freedom Road-এ। Klansmenদের অগ্নিবৃষ্টির সামনে Gideon Jackson অবিচলিত। মৃত্যু এসেছে। আসুক। জনতা তার অপরাহত জীবনকে প্রবহমান রেখে দেবে —ব্যক্তির মৃত্যু সত্ত্বেও।

Gideon Jackson's last memory as the shell struck, as the shell burst and caused his memory to cease being was of the strength of these people in his land, the black

and the white, the strength that had taken them through a long war, that had enabled them to built out of the ruin, a promise for the future ...Of that strength the strange yet simple ingredients were the people, his son Marcus, his son Jeff, his wife Rachel, his daughter Jenny...There were so many of them, so many shades and colours, some strong, some weak, some wise some foolish, yet together they made whole of the thing that was the last memory of Gideon Jackson, the thing indefinable and unconquerable.

এই মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করেই বোধ হয় আমরা বলতে পারি— হে মহাজীবন হে মহামরণ, লইনু শরণ লইনু শরণ।